নিঃসঙ্গ সৈনিক

নিঃসঙ্গ সৈনিক

শক্তিপদ রাজগুরু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৭২

প্রচ্ছদ ও নামপত্র : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণগোপাল মল্লিক
অধুনা
১৭/১ ডি, সূর্য সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নিঃসঙ্গ সৈনিক

রামরতনবাবু কি করে কলকাতায় এসে পৌঁছোলো তা নিজেই ভাবতে পারে না। বানে ভাসা খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে এসেছিল সে এদেশে স্ত্রী সাবিত্রী, ছেলে সুবীর, অধীরের হাত ধরে। ছোট ছেলে সমীর তখন কোলে।

পূর্ববঙ্গের কোন গ্রামে ছিল রামরতনের ঘরবাড়ি, সামান্য কিছু জমি-জিরাত। তাই দিয়ে কোন মতে দিন চলতো আর গ্রামেই তার বাইরের চালায় একটা পাঠশালা বসাতো। গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজটা সে ছেলেবেলাতেই ব্রত হিসাবে নিয়েছিল। তখন স্বদেশী আমল। রামরতনও সেদিন গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ওইভাবে।

খুবই সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসার, রামরতন সেদিন সব ছেড়ে ওই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। ঘরে স্ত্রী, বড় ছেলে সুবীর তখন ছোট্ট। সাবিত্রী স্বামীর এই কাজে বাধা দেয়নি।

রামরতন বলতো, দেখবে এই ভারতবর্ষ একদিন ইংরেজের শাসনমুক্ত হবেই, স্বাধীন হবে আমার দেশ। সেদিন মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারবে, কোন দুঃখকষ্টই থাকবে না।

সেই আশাতেই রামরতন স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে জেলবাসও করেছিল। স্ত্রী ছেলেদের অবস্থা কি হয়েছিল তখন সেটা ভাবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না রামরতনের। জেল থেকে ফিরে এসে দেখে সাবিত্রীকে। কোনমতে নিজে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, কারো বাড়িতে ধান সেদ্ধ করে, কোথায় রান্নার কাজ করে ও দিন চালিয়েছে। তখন বড়ছেলে সুবীরের পর মেজ ছেলে অধীর এসেছে।

রামরতন স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই ওই পাঠশালা খোলে। দেশের মানুষকে গড়তে হবে, শিক্ষার আলো দিতে হবে তাদের মনে।

দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াই করেছিল সেই স্বাধীনতার এত বড় মূল্য দিতে হবে ভাবেনি রামরতনবাবু।

শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাবার আগে এই দেশকেই দুটুকরো করে দিয়ে গেল। রামরতন আবিষ্কার করে, এদেশ যেখানে তার সাত পুরুষ মানুষ হয়েছে, যে মাটিতে সে জন্মেছে, যে দেশকে স্বাধীন করার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে সেই দেশ তার নয়, এ মাটিতে থাকারও তাদের কোন অধিকার নেই। তাই রাতের অন্ধকারে তাদের তাড়াবার জন্য অমানুষের দল আক্রমণ করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সামনে যাকে পায় তাকেই শেষ করে।

ভীতত্রস্ত মানুষগুলো ঘরবাড়ি ছেড়ে জলাজঙ্গলে পালায়। দূর থেকে দেখে রামরতন তার সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘর আর নাই। এদেশে থাকার অধিকারও তার নাই। সাবিত্রীর চোখে জল নামে। ছেলেদুটোও কি অজানা ভয়ে হতবাক হয়ে গেছে।

সেই রাতেই দুতিনখানা গাঁয়ের মানুষ ঠিক করে ওই জঙ্গলে বসেই—সবই তো গেল। এখানে থাকলে না খেয়ে মরবে, না হয় ওদের হাতেই প্রাণটাও যাবে। মান-ইজ্জৎও যেতে পারে যখন তখন।

তাই ওরা বলে—ইণ্ডিয়াতেই চলো ; অর্থাৎ তাদের কাছে এই দেশও পরদেশ হয়ে গেছে।

রামরতন ওই ঘরছাড়াদের ভিড়ে মিশে দিনরাত পায়ে হেঁটে বর্ডারের দিকে আসছে। খেয়া নৌকায় নদী পার হয়েছে ওদের কারো দয়ায়, কোনদিন দুমুঠো চাল মিলেছে, না হয় মুড়ি। তাই চিবিয়ে পথ হেঁটেছে রাতভোর, দিনে কোন বনে-বাদাড়ে লুকিয়ে থেকেছে কোথাও ভীত জানোয়ারের মত।

তিন-চার দিন রাত্রি হেঁটে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সর্বহারা মানুষগুলো এসে পৌঁছায় হরিদাসপুরের ওদিকে এসে ইণ্ডিয়ার মাটিতে। তখন শেষ রাত। তারপর ট্রেনে করে কলকাতা। কলকাতার নামই শুনেছিল, এই প্রথম দর্শন করলো সেই শহরকে। কাতারে কাতারে ছিন্নমূল মানুষের ঢল নেমেছে প্লাটফর্মে, বাইরে।

সাবিত্রী বলে—কি করবা ?

তা রামরতনও জানে না। কাউকে চেনেও না। তাদের পাশের গ্রামের ভূষণ-বাবু বড়বাজারে মশলাপট্টিতে কোন গদিতে কাজ করেন। মাঝে মাঝে ভূষণ মুখুয্যে গ্রামে যেত পুজোর সময়, রামরতনের স্কুলের বন্ধু ; ভূষণকে সে প্রায়ই বলতো—কলকাতা গে কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন করে আসবে। কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠেনি। আজ এসেছে। তবে বেড়াতে, দেবী দর্শন করতে নয়, স্রেফ বাঁচার তাগিদেই।

সাবিত্রীকে বলে রামরতন—তুমি এহানে থাকো, আমি একবার ভূষণের খপর কইরা দেহি।

সাবিত্রীর ভয় লাগে। এই জনসমুদ্রের একদিকে প্লাটফর্মের একপ্রান্তে ছেঁড়া মাদুরেই আজ তার আশ্রয়। ছেলে দুটোকে খেতে দিতেও পারেনি। একটা পাঁউরুটি কিনে ছিঁড়ে দিয়েছে দুজনকে।

সাবিত্রী বলে—একা থাকুম এহানে ?

রামরতন বলে—একা ক্যান। এত লোকজন রইছে। আমার দেরী হইব না। দেহি যদি কুন কিছু মেলে। এহানে এভাবে থাকা যাইব না।

এ যেন নরকের জীবন। আব্রু বলেও কিছু নাই। কোন একটা আশ্রয় তাদের চাই।

রামরতন প্রথম কলকাতা শহর দেখছে। বড়বাজার মশলাপট্টি বলতে অনেকেই দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এখানে এসে দিশাহারা হয়ে গেছে রামরতন। বড়বাজার এলাকা দেখেই মনে হয় এটা যেন এক বিচিত্র জগৎ। এত মালপত্র, এত এত কেনাবেচার হাট কোথাও দেখেনি। ট্রাক-ঠেলাগাড়িতে রাশি রাশি

মাল যাতায়াত করছে। লোকগুলো সবাই ব্যস্ত, কারো দাঁড়াবার সময় নাই। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত। তাদের গ্রামের জীবনে দেখেছে রামরতন সেখানে মানুষের অবকাশ ছিল। পরস্পরের কথা বলার সময় ছিল। এখানে কেউ কারো কথাও ভাবে না। নিজের ধান্ধার জন্য যতটুকু কথার দরকার তাইই বলে ; তার বেশী নয়।

মশলাপট্টিতে ঘুরছে রামরতন। কে হৈ হৈ করে—আরে বাবু সামালকে!

একটা ঠেলাই ঘাড়ে এসে পড়তো, কোনমতে সরে আসে সে। ওই জন-সমুদ্রে ভূষণ মুখুয্যের খোঁজ করা এ যেন খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই এক অসম্ভব ব্যাপার। এদিক ওদিক নানা গদিতে খোঁজ করে। সকলেই বলে—নেহি জানতা। কোন্ গদিমে কাম্ করে বাতাও।

গদির নাম ও জানে না। আর অলিগলিতে এত গদি, এত গুদামও ভাবেনি রামরতন। ঘণ্টা দুয়েক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সে পার্কের ধারে একটা গাছের নিচে বসে পড়েছে। চারিদিকে লোকজনের ভিড়।

হঠাৎ রামরতনের চোখ পড়ে—হ্যাঁ ভূষণবাবুই, দুতিনজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। রামরতন ওখান থেকেই চীৎকার করে ওঠে—ভূষণ, আরে ভূষণা—

ভূষণবাবুও খাঁটি দেশজ ভাষায় ওই ডাক শুনে এদিক ওদিকে চাইছে। ইতিমধ্যে রামরতনও ছুটে আসে। হাঁপাচ্ছে রামরতন। বলে—ভূষণ, তরে কত খুঁজছি দিন ভোর।

ভূষণও অবাক হয়—তুই, রামরতন! এখানে?

ভূষণ অনেকদিন থেকেই গ্রাম ছাড়া। কলকাতাতেই সে এখন বাসা করেছে। গাঁয়ের খবর ঠিক জানে না। কাগজেই সামান্য দেখেছে। সে শুধোয়—গ্রামের খবর কি? তোর? সব ভালো তো?

রামরতনের ঝড়োকাকের মত চেহারায় যেন সাংঘাতিক বিপদের কথাটাই ফুটে উঠেছে। রামরতন বলে—সব বলতেই এসেছি। খুবই খারাপ খবর হে।

রামরতনকে নিয়ে আসে ভূষণ তার গদিতে।

গলির মধ্যে সাবেক কালের একটা ঘর—আয়তনে দশ ফিট বাই পনেরো ফিট। একটা তক্তপোশ পাতা, তাতেই বসার জায়গা। আর ঘর জুড়ে ঠাসা বস্তা, তাতে লঙ্কা, ধনে, জিরে, হলুদ নানা কিছু। সব মিলিয়ে বাতাসে একটা বিচিত্র গন্ধ ছাড়ে।

এর মধ্যে ভাঁড়ে মালাই চাও এসেছে। এই অঞ্চলের চায়ের স্বাদও আলাদা। দুধে নানা মশলার সঙ্গে চা দিয়ে ফোটানো। এলাচ তেজপাতার গন্ধও ওঠে।

রামরতন বলে তাদের চরম সর্বনাশের কথা। আজ থাকার মত আশ্রয়ও নাই। কি খাবে—ছেলেদুটোর মুখে কি দেবে জানে না।

ভূষণ মুখুয্যে কি ভেবে বলে—বৌঠানকে ওখানে রেখে এসেছিস? ছেলেদেরও?

ওখানেই ওইভাবে তিনদিন পড়ে আছি।

রামরতনের কথায় ভূষণ একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিয়ে বলে—নিমতলা স্ট্রীট, ওই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে পড়বে। রিক্সাওয়ালা পেঁছে দেবে। তুই ফিরে গিয়ে বৌঠানদের ওখানে নিয়ে আয়। আমার বাসা—আপাততঃ ওখানেই ওঠ! তারপর দেখা যাক কি করা যায়।

ভূষণ ওর হাতে গোটা পঁচিশ টাকা দিয়ে বলে—রিক্সায় করে চলে আয়, নাহয় একটা ট্যাক্সি নিবি।

—হেঁটেই আসবো।

ভূষণ বলে—অনেকটা পথ, বাচ্চাদের নিয়ে পারবি না। ওখানে আয় সন্ধ্যার পরই। আমিও তাড়াতাড়ি ফিরবো। তখন কথা হবে।

সাবিত্রী জানে না কোথায় চলেছে সে। ট্যাক্সির ধারে কাছে যায় না রামরতন। গাড়ি বলে কথা, কে জানে অনেক দাম চাইবে আর কোথা নিয়ে যেতে কোথায় নিয়ে যাবে। তার চেয়ে রিক্সাই নিরাপদ।

রিক্সায় সাবিত্রী ও ছেলেদের তুলে দিয়েছে আর সামান্য মালপত্র যা ছিল তাও। নিজে রিক্সাতে না চেপে হেঁটেই যাবে।

সাবিত্রী বলে, এখান থেকে চলে যামু?

প্লাটফর্মের এই জায়গাটা ছাড়লে আর পাওয়া যাবে না, কারণ এখানেও পিলপিল করে লোকজন আসছে। অনেকের মাথার উপর ছাউনিও নাই, খোলা আকাশের নিচেই পড়ে আছে।

রামরতন বলে—একটা ব্যবস্থা হবে ঠাকুরের দয়ায়, চলো।

ওরা এসে হাজির হলো নিমতলার এদিকে। পুরোনো সাবেকী আমলের চুন-পলেস্তরা খসা বাড়ি। নিচের তলায় অন্ধকার। ওদিকে আশপাশে গুদাম মত। কাঠগোলা আর নানা মালপত্রের গুদাম। পাথরের ইঁট-বাঁধানো রাস্তা। ট্রাক-ঠেলার ভিড়। রাস্তার চাপা কলের ময়লা গঙ্গার জলেই ওরা স্নান করছে অনেকে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর গলির মধ্যে বেশ কিছুটা গিয়ে বাড়িটার সন্ধান মেলে। সরু গলি। একটা লোক যেতে পারে মাত্র। ওদিক থেকে কেউ এলে অন্যজনকে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়াতে হয়।

বাড়িটা দোতলা। একতলাটা পাকা। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। খান দুয়েক বড় ঘর, ওদিকে রান্নার জায়গা। কল পায়খানা উপরেও আছে। নিচেও একটা পায়খানা কল আছে উঠানের একদিকে।

একটা ঘরে কিছু মালপত্রের বস্তাও রয়েছে, তবে অনেকটাই খালি। দুতিনটে তক্তপোশও পড়ে আছে। আর জানলা তেমন নেই, দেওয়ালের উপর দিকে ঘুলঘুলি মত রয়েছে। ওই দিয়েই হয়তো দিনের আলো কিছু ঢোকে। একটা বাল্ব জ্বলছে ঘরের ভিতর।

ভূষণ আগেই বাড়ি ফিরছে। তার স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। ছেলে-

মেয়েরা পড়ছে। বড়টি রামরতনের বড় ছেলে সুবীরের বয়সীই। কলকাতায় মোটামুটি ভালোভাবে আছে। তাই এখন ক্লাশ নাইনে পড়ে। অধীর পড়াশোনায় খুবই ভালো ছিল, ক্লাশে ফার্স্ট হতো ওদেশে। এখন ক'মাস পড়ার মত অবস্থাও নাই তাদের।

ভূষণের স্ত্রী মল্লিকা এগিয়ে আসে।

সাবিত্রী দেখছে মল্লিকাকে। গ্রামেও দেখেছে। মল্লিকা গ্রামে সাবিত্রীকে দেখেছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে থেকেও রামরতনের ওই স্ত্রী লেখাপড়া জানে। রামায়ণ মহাভারত তার জানা। মেয়েমহলে অনেক দিন গ্রামে সেই রামায়ণ পাঠ করতো। মেয়েদের অনেকের সংসারের অনেক সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ নিতে আসতো তার কাছে। গ্রামে ছিল তার মহিমময়ী রূপ। মল্লিকাও সেই রূপে দেখছে তাকে। গ্রামে গেলে তার বাড়িও যেতো মল্লিকা। দেখেছে সাবিত্রীর সাজানো সংসার। প্রাচুর্য নেই, কিন্তু প্রশান্তি আছে। বাড়িতে রামরতনের অনেক অতিথিই আসতো।

সামান্য ডাল ভাত, ঘরের চালকুমড়ো, গাছের আমড়ার টক, তাই দিয়েই অতিথি সৎকার করে। কিন্তু অন্তরের স্নেহ প্রীতির স্পর্শে সব যেন অমৃতময় হয়ে ওঠে।

সেই সাবিত্রীকে আজ দেখছে মল্লিকা, ভূষণও। পরনে ময়লা কাপড়, মাথার চুলগুলো তেল অভাবে বিবর্ণ এলোমেলো। মুখ চোখে হতাশা, বিষাদের ছায়া। দেশবিভাগের যন্ত্রণা, সবহারানোর বেদনা সেই মহিমময়ী মূর্তিকে এক বিষাদ প্রতিমায় পরিণত করেছে।

মল্লিকার ছেলেমেয়েরাও দেখছে ওদের।

ভূষণ বলে তার ছেলেকে—প্রণাম করো মদন।

ওরা যেন ওই ভিখারীদের প্রণাম করতে ইতস্তত করে। বাবার কথায় কোনমতে মাথা নিচু করে মদন।

সাবিত্রী বলে—থাক-থাক!

সাবিত্রী এমনিতে স্কুলে লেখাপড়া বিশেষ করার সুযোগ পায়নি; অজ পল্লীগ্রামে সে সুযোগও ছিল না। কিন্তু জীবনের পাঠশালায় সে অনেক পাঠই নিয়েছে।

স্বামী রামরতনর ছিল পড়ার অভ্যাস। দেশবিদেশের বহু মনীষীর জীবনী সে সংগ্রহ করে পড়তো; রামায়ণ, মহাভারত, গীতাও পড়তো।

সাবিত্রীও সেসব বই পড়তো। রামায়ণের সীতা-সাবিত্রীর উপাখ্যান সে পড়েছে। পড়েছে মহাভারত। বাস্তব জীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় সে মানুষকে চিনেছে। স্বামী জেলে, ছেলেদের নিয়ে কায়ক্লেশে দিন কাটিয়েছে। জীবনে দুঃখকষ্টকে সে ভয় করে না। কিন্তু এখন স্বামী-ছেলেদের কথা ভাবতে হয়, ভাবতে হচ্ছে আর একজনের কথাও।

সে এই নিদারুণ দুরবস্থার মধ্যে আবার মা হতে চলেছে। তাই ভাবনা হয়, এই অতল অন্ধকার দিনগুলোর পর কি আলোর মুখ দেখতে পাবে না কোনদিনই।

ভূষণবাবুই বলে—নিচের ঘরেই এখন থাকো কিছুদিন। ওঘরটা খালি রয়েছে। থাকতে অসুবিধাই হবে বৌঠান্।

সাবিত্রীও দেখেছে ঘরখানা। অন্ধকূপই বলা যায়। তবে তক্তপোশগুলো রয়েছে। তাতেই শোবে। তবু একটু আশ্রয় তো পেয়েছে, স্টেশন প্লাটফর্মে হাজারো মানুষের ভিড় থেকে তবু এখানে কিছুটা নিরাপদ থাকবে। আর ভূষণবাবুর সামনে থাকলে ভূষণবাবুও তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করবে।

তাই সাবিত্রী বলে—না, না। যেখানে পড়েছিলাম তার তুলনায় এ ঢের ভালো দাদা। এখানেই কোনমতে থাকবো যতদিন অন্য ঘর না পাই।

ভূষণবাবু পরদিন থেকেই রামরতনকে নিয়ে বের হয় বাজারে। রামরতন এই সব কাজে অভ্যস্ত নয়। বিশাল বাজার, মণ মণ মশলা এখানে শুধু মুখের কথায় কেনাবেচা হয়, আর চিরকুটে লাখ টাকার লেনদেন হয়। টাকা এখানে হাওয়ায় ওড়ে।

ভূষণ গদিতে এসে দুতিনটে ফোন করে রামরতনকে অমনি চিরকুট দিয়ে পাঠায়, আর বলে—দুতিনটে দোকানে বিভিন্ন মশলার আজকের মণকরা দর জেনে নাও রামরতন, অন্য দোকানে গিয়ে ওদের বলো কত দরে মশলা কিনবে, মণ করা এক টাকা দুটাকা লাভ থাকলে ওদের বলো মশলা দেব। আমাকে এসে বলো—যে বেচবে আর যে দোকান কিনবে তাদের নাম আর ফোন নাম্বার, দেখি কি করা যায়।

রামরতন প্রথম দিনেই পাঁচ সাতটা দোকানে দর যাচাই করে জানতে পারে দরের মার্জিন মণকরা আড়াই টাকা পড়ছে। ও এসে সেইমত খবর দিতে ফোনেই সেই কেনাবেচা হয়ে যায়। বৈকালে ভূষণ দুটাকা নগদ চা খাবার জন্যও দেয়। জলপানি সকলেই দেয় আর রাতে হিসাব করে প্রায় বিয়াল্লিশ টাকা হাতে পায় রামরতন আজকের দালালী বাবদ।

ভূষণ বলে—যতদিন না অন্য কোন ব্যবস্থা হয় এই কাজই করো। চেনা জানা হলে দিনে এবাজারে শতখানেক টাকা রোজগারও হতে পারে।

রামরতন খুশীই হয়। কাল পায়ের তলে মাটি ছিল না, এখন একটা আশ্রয় তবু পেয়েছে আর কাজের ক্ষেত্রও পেয়েছে ভূষণের জন্য।

সাবিত্রী ওই অন্ধকার ঘরটাতেই সংসার পেতেছে। দিনভোর আলো জ্বালতে হয়। তবু রাতের বেলায় সেদিন ভয়ই পায়। যেন চোর ঢুকেছে। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। কি যেন দৌড়ে গেল। দেখে বিশাল ছোটখাটো বিড়ালের সাইজের ইঁদুরগুলোর এ যেন চারণক্ষেত্র। ঘরের ভাঙা মেঝেতে, বাইরে পথের ধারে ইয়া গর্ত। ইঁদুরগুলো ওখানেই বংশবৃদ্ধি করছে যুগ যুগ ধরে। আর তাদের রাজ্যে এদের অনুপ্রবেশ করতে দেখে ঠিক খুশী হয়নি। তাই ঘাড়ের উপর দিয়েই দৌড়াদৌড়ি করে তারা যেন নিজেদের দখল কায়েম করতে চায়।

সাবিত্রী দেখেছে স্বামী কোনমতে লড়াই করে রসদ যোগায় এই সংসারে। ইদানীং কোন্ গদিতে চাকরি পেয়েছে, আর এ ছাড়াও ওই দালালীর কাজও করে কিছু রোজগার করে রামরতন।

সাবিত্রীর সংসারে আর একজন অতিথি এসেছে। তাদের ছোট ছেলে। ওই অভাবের দিনেও রামরতন বড় ছেলে সুবীর আর অধীরকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে।

বইপত্র সব যোগাড় করতে পারেনি ওরা। অধীর তবু এর মধ্যে স্কুলে কিছু বন্ধুবান্ধব পেয়ে গেছে। আর পড়াশোনাতে সে ভালোই। এখানের স্কুলে এর মধ্যে সে অনেক শিক্ষকের নজরে পড়েছে। ইংরাজী অঙ্কতে সে ভালোই। তাই টিচাররা বলেন—স্কুলের লাইব্রেরী থেকেই বই নিয়ে চালাও অধীর। অঙ্কের স্যার একখানা পাটিগণিত তাকে দেন।

তার তুলনায় বড়দা সুবীর পড়াশোনায় তত ধারালো নয়। তার সামনে ক্লাশের ছেলেরা কেমন স্মার্ট হয়ে, দামী ব্যাগ কাঁধে নিয়ে আসে। দেখেছে সুবীর, শুধু ভাতে ভাত নাহয় ডাল আর সেদ্ধ খেয়ে স্কুলে আসতে হয় তাদের। মাছ রোজ আসে না। রবিবার বাবাও বাড়িতে থাকে। সেদিন ওদের চুনোচানা মাছ কিছু আসে মাত্র। আর টিফিনের সময় অন্য ছেলেরা টিফিনবক্স বের করে কত কি খায়। মায় ভূষণবাবুর ছেলে মদনও প্লাস্টিকের সুন্দর টিফিনবক্স আনে। তাতে টোস্ট, কলা, ডিমসেদ্ধ এসব থাকে।

ওরা ওদিকে গাছতলায় বাঁধানো বেদীতে বসে খায় আর সুবীররা চেয়ে চেয়ে দেখে। সুবীরও চায় ওদের মত পোশাক, জুতো পরতে, ভাল ব্যাগ নিয়ে স্কুলে আসতে, টিফিন বক্সভর্তি সুখাদ্য আনতে। কিন্তু মা একদিন ভাইয়ের জন্য আনা বার্লির কৌটোয় তাকে মুড়ি বাতাসা টিফিন দিতে চেয়েছিল, রেগে সেগুলো ছুড়ে ফেলে সুবীর বলে—ইস্কুলে এসব নিয়ে গেলে ওরা মাথায় চাঁটি মারবে।

সাবিত্রী অবাক হয়—এ তো ভালো খাবার!

—ছাই।

অবশ্য অধীর তার ভাগের ওই মুড়ি বাতাসা এনে এখনও টিফিনের সময় মাঠের ওদিকে বসে খেয়ে কলের জল খায়। অধীর বোঝে তাদের সংসারের অবস্থা। সে স্বপ্ন দেখে ফার্স্ট হবে। কিন্তু এবার ফার্স্ট হতে পারে না। কারণ সব পড়ার বইও তার নাই। আর যে ফার্স্ট হয় সমীরণ, তার বাবা বিরাট অফিসার, মাও নাকি প্রফেসর। তার জন্য বইয়ের অভাব নাই, মাস্টারমশায়েরও অভাব নাই তাই।

পড়ার ঘরও আলাদা সমীরণের। এর মধ্যে অধীর তাকে চিনেছে। অধীরের সব বই নাই, পড়ার জায়গাও নাই। ওদের ওই ঘরটাতে দিনের বেলাতেই আলো ঢোকে না। সে বাইরের চাতালে বসে পড়ে। আগে দোতলায় ভূষণ-

কাকার ছেলে মদনের ওখানে যেত। কিন্তু মদন এর মধ্যে সিগ্রেট ধরেছে। তাকেও সিগ্রেট খেতে বলে।

অধীর তাই যায় না। বরং মদনের বোন মায়া তবু ভালো। চাতালে বসে পড়ে। মায়া মাঝে মাঝে আসে। কোনদিন মাখন মাখানো পাঁউরুটি, কলা ও সন্দেশও ওর জন্য আনে।

—নাও।

অধীর জানে ওসব ওর ভাগেরই। মাকে লুকিয়ে এনেছে মায়া। কারণ দেখেছে অধীর ওরা কেউ ওপরে গেলে মল্লিকা কাকীমার মুখটা ভার হয়ে ওঠে। সব সময় চোখে চোখে রাখে। মদনের ঘড়ি দামী কলম যেখানে সেখানে ছড়ানো থাকে। কে জানে ওরাই না নেয়।

অবশ্য মল্লিকার দোষ এইটাই। সাবিত্রীও তা জানে। এখন রামরতন সেই গদিতে চাকরি করছে, তাছাড়া দালালী করেও কিছু পায়। তাতে সংসার চলে কোনমতে। সাবিত্রী এমনিতেই হিসাবী। অল্প নিয়েই সে খুশী। তার নিচের ঘরে কোনমতে থাকে।

এখন সুবীর, অধীর স্কুলে যায়। রামরতনও সকল নটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে দোকানে চলে যায়। একা সাবিত্রী ছোট ছেলে সমীরকে নিয়ে থাকে।

এই দুঃখের দিনে এসেছে ছেলেটা। সেদিন হাসপাতালে নিয়ে যাবার পয়সাও ছিল না। ওষুধপত্র কেনার টাকাও নাই। তখনও চাকরি পায়নি রামরতন। ভূষণই তার স্ত্রীকে না জানিয়ে টাকা দিয়েছিল। তাদের দয়াতেই যেন জন্ম নিয়েছিল ছেলেটা। আর সেইদিনই রামরতন দত্ত কোম্পানীর গদিতে গদি-সরকারের চাকরিটা পেয়েছিল আর হঠাৎ তখন লবঙ্গ-ছোট এলাচের বাজার চড়ে ওঠে মশলা বাজারে, কোন মহাজনের বেশকিছু মাল ওই চড়া দরে বেচে নগদ দুশো টাকা কমিশন পেয়ে যায়। হাসপাতালে সেদিন সাবিত্রীর জন্যে ফল, কৌটোর দুধ, ওষুধও নিয়ে যায় রামরতন।

সাবিত্রী জানে সংসারের অবস্থা। সেইই বলে,—এত সব আনলে কেন? নিজেদের খাবার টাকা আছে?

রামরতন ওই নবজাতকের দিকে চেয়ে থাকে। বেশ পুরুষ্টু চেহারা, চোখ দুটো ডাগর। মাথায় একরাশ কালো চুল।

রামরতন বলে—বড়বৌ, যে এসেছে তার অদৃষ্টেই বোধহয় আমাদের দিন বদলাবে।

চাইল সাবিত্রী। বলে রামরতন—আজ দত্ত কোম্পানীতে গদি-সরকারের চাকরি পেয়েছি। মাসে দুহাজায় টাকা মাইনে—জলপানি পাঁচ টাকা। আর ওরা বলেছে আমার দালালীর কাজও টুকটাক করতে পারবো। আজই দালালির কমিশন পেয়েছি দুশো টাকা। ফেরার পথে হোটেল থেকে রুটি তরকারী লই যামু।

সাবিত্রী খুশী হয়। মা হয়ে আজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়—ওকে বাঁচিয়ে রাখো ঠাকুর। বড় কষ্টে রয়েছি। ও যেন জীবনে সুখের মুখ দেখে।

সাবিত্রী তাই যেন ছোট ছেলে সমীরকে খুবই ভালোবাসে। রামরতন বলে—ওর নাম সমীর রেখেছি কেন জানো? সমীর মানে দখিনা বাতাস। অসহ্য গরমের মধ্যে ওই সমীর যখন বয় তখন সব গরম চলে যায়। দেখবে ওর জন্যই আমাদের সব দুঃখকষ্ট চলে যাবে।

সুবীর ক্লাশ টেনে উঠেছে। উপরের মদন তার খুবই বন্ধু। প্রায়ই উপরে যেত। কিন্তু মদন এবার ফেল করতে মল্লিকা শোনায়—ওসব বন্ধুদের মুখে ছাই, ওদের জন্যেই তোর পরকাল ঝরঝরে হবে। ওরা ঠিক নিজেদের কাজ করে তোকে বখাতে আসে; খবরদার মিশবি না ওই সুবীরের সঙ্গে। তোর পয়সাতেই খায় শুনি।

মদন চুপ করে থাকে। সাবিত্রী নিচে থেকেই শোনে ওই কথাগুলো। প্রায় বছরখানেক হলো এখানে রয়েছে। ভূষণবাবুর গদির খাতাপত্রও লেখে রামরতন। ওসব গোপন খাতাপত্র বাড়িতেই থাকে। ভূষণ ওকে বিশ্বাস করে। রামরতন টাকা নেয় না এর জন্য। বলে—বিপদের দিনে তুমি ঠাঁই দিয়েছিলে, নাহলে ভেসে যেতাম ভূষণ। তোমার সঙ্গে লেনদেনের সম্বন্ধ আমার নাই। তাছাড়া বাড়িভাড়াও লও না।

রামরতন এইভাবে সেটা শোধ দেয়। সাবিত্রী এ নিয়ে কোন কথাই বলেনি। কিন্তু মল্লিকা এখন তাদের অন্য চোখে দেখে। অধীর পরীক্ষার ভালো ফল করেছে। সুবীরও পাশ করেছে।

মল্লিকা বলে মদনকে—ওরা ওই অন্ধকার ঘরে থেকে আধপেটা খেয়ে এতসব করে আর তুই, দুখানা মাস্টার দিয়েও তোকে পাশ করাতে পারলাম না? কি হবে তোর? ওরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে! তুই! গর্দভ! ওরা কাজ গোছাবে আর তুই দেখবি চেয়ে চেয়ে!

রাগটা পড়ে এদের উপরই। মল্লিকার ওইসব কথা সাবিত্রী শোনে। তারও বিশ্রী লাগে। সেদিন সাবিত্রীর ঘরে চিনি নাই। সমীব এমনিতে দুধ খেতে চায় না। একটু চিনি দরকার। উঠে যায় সাবিত্রী মল্লিকার ঘরে।

মল্লিকা তখন আপন মনে গজগজ করছে। মদন নাকি সুবীরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। অর্থাৎ খরচা দেবে মদনই। সাবিত্রীকে দেখে চাইল।

সাবিত্রী বলে - এক কাপ চিনি দিবি মল্লিকা।

মল্লিকা ফুঁসে ওঠে—দিতেই আছি দিদি। ঘর দিয়েছি—কাজ জুটিয়ে দিয়েছি, ছেলেও বখাটে করে তুললো মদনকে, আর তোমাদের কত খাঁই মেটাবো নিজেদের সব্বোনাশ করে বলতে পারো?

মায়া পড়ছিল। সেইই বলে—কাকে কি বলছ মা? জেঠিমা কি করলো?

মল্লিকা ধমকে ওঠে—তোর এত কথায় কাজ কি লা? চুপ কর তো। অনেক সয়েছি, এবার বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো আর সইব না। এতদিন বলিনি, এবার বলতে হচ্ছে—পথ দ্যাখো। নিজেদের তো আখের বেশ গুছিয়ে

নিচ্ছ। ছেলেরাও মানুষ হলে তোমাদের আর ভাবনা কি। আমাদের কি হবে?

সাবিত্রী অবাক হয়। বলে সে—এসব কথা কোনদিন ভাবিস না মল্লিকা। তোদের ঋণ জীবনেও শুধতে পারবো না। যাদের নুন খেয়েছি তাদের কোন অনিষ্ট করার মত মহাপাপ কোনদিন যেন না করি। তাহলে ভগবান ক্ষমা করবে না। তোদের অনেক জ্বালিয়েছি আর জ্বালাবো নারে। আর সুবীরকেও বলে দেব ও যেন মদনের সঙ্গে না মেশে।

মল্লিকা বলে—তাই করো। আর তোমার দিগগজ ছেলে অধীরকেও বলো, সেও যেন এদিক না মাড়ায়। আমার বোকা ছেলের সঙ্গে মিশলে তারই ক্ষতি হবে।

চিনি আনাও হল না। সাবিত্রী শূন্য হাতে বিষণ্ণ মন নিয়ে ফিরে আসে।

সমীর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট ছেলেটার কোন ঝোঁক নাই, দাবীও নাই। যার তার কাছেই যায়।

সাবিত্রী সারাদিন ওই বদ্ধ গুদামে আটকে থাকে। তাই বৈকালে সুবীর ফিরে খেলতে যায়। এখন আর মদনের ওখানে যায় না। অধীরও দু'একজন বন্ধুর বাড়িতে যায়। সাবিত্রী খোকন অর্থাৎ সমীরকে নিয়ে আগে মল্লিকার খোলা ছাদে গিয়ে বসতো। ওই ঘটনার পর আর বিশেষ যায় না উপরে।

সাবিত্রী এমনিতে খুবই বুদ্ধিমতী, মল্লিকার মত মুখরা নয়। ক্যরও সঙ্গে জোরে কথাও বলে না। যার সঙ্গে পছন্দ হয় কথা বলে দুচারটে, নাহলে চুপচাপই থাকে। কেউ তাকে পছন্দ করছে না বুঝতে সে সহজেই পারে আর তার কাছেই যায় না। নীরবে সরে আসে।

কারোও কাছে তার কোন দাবী নাই। ভোরে গঙ্গাস্নান করতে যায়। ওই একটা অভ্যাস হয়ে গেছে সাবিত্রীর। এ পাড়ায় সবুজ কোথাও নাই। চারিদিকে সাবেকী আমলের বড়বড় বাড়ি, গুদাম। ওদিকে রেললাইনে মাঝে মাঝে ইঞ্জিনে মালগাড়ি টেনে নিয়ে যায়। তার ওদিকেই রাস্তা, তারপর গঙ্গার বিস্তার। সাবিত্রীর তাই এই জায়গাটা ভালো লাগে। ভোরে তখন সবে আলো ফুটছে। গঙ্গার বুকে আলোর আভাস জাগে। শান্ত নদীর প্রবাহের দিকে চেয়ে সাবিত্রীর ফেলে আসা সেই গ্রাম—মধুমতী নদীর কথা মনে পড়ে। গ্রামেও সে নদীতে স্নান করতো।

এখানে গঙ্গা—এ নদী নাকি সর্বপাপতাপহরা।

সাবিত্রী স্নান করে ফেরে। রামরতন বলে—তোমার ওই অভ্যাস এখানেও যায়নি দেখছি।

হাসে সাবিত্রী। বলে—মা এটুকু দয়া করেছেন গো।

বৈকালে গঙ্গাতীরে কোন মন্দিরে, ঘাটের চাতালে অনেকে গীতা ভাগবৎ পাঠ করে, না হয় নামকীর্তনের আসর বসে। সাবিত্রী তার খোকনকে নিয়ে এসময় গঙ্গার ধারে আসে।

শিশু সমীর অবাক চাহনি মেলে এই জগতকে দেখে। নদীতে স্টীমার-লঞ্চ চলে যায়, পাল তুলে চলেছে কোন মহাজনী মালগুজারি নৌকা, গাং চিল ওড়ে মাছের সন্ধানে, দূরে দেখা যায় নদীর উপর বিশাল কাঠামো নিয়ে যেন মালার মত ঝুলছে হাওড়া ব্রিজটা।

সমীর শুধোয়—ওটা কি মা ?

—হাওড়ার পুল। দেখছিস কত লোক, গাড়ি যাতায়াত করছে।

সমীর বলে—এক দিন নিয়ে যাবে ওখানে ?

সাবিত্রী বলে—তোর বাবাকে বলবো।

সাবিত্রী ছেলেকে নিয়ে ওই ফাঁকায় এই সময়টুকু কাটায়! ওই বাড়িতে তবু ফিরতে হয়। একখানা ঘর—বাতাসে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। এবার সমীরকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। সাবিত্রীই কথাটা ভেবেছে, এখানে থাকতে মন চায় না। মল্লিকাকে সে এড়িয়ে চলে। তবু উপর থেকে মল্লিকার বাক্যবাণ ঠিকই নিক্ষিপ্ত হয় তাদের উদ্দেশ্যে। মল্লিকা শোনায়—এখন আর চিনতেই পারে না। পারবে কেন ? কষ্টের দিন তো পার হয়েছে। ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, মেজছেলেও এবার জজ ম্যাজিস্টর হবে। আমরা কোথাকার কে ?

গেলেও জ্বলা—না গেলেও জ্বালা।

সুবীর বলে—কাকীমা এইসব বলবে ?

সুবীর এখন বাবার সঙ্গে বাজারে বের হচ্ছে। তার ইচ্ছা দালালী নয়, কোনমতে এখানের কোন মহাজনকে পটিয়ে যদি কোথাও দোকান একটা করতে পারে তাহলে ভালোই হয়। ব্যবসার হালচাল সে বুঝেছে এর মধ্যে বাজারে ঘুরে। রামরতনের বয়স হচ্ছে, সে চায় তার বড় ছেলেকেই দালালীর কাজে নামাতে।

অধীর এবার ম্যাট্রিক দেবে। ওই একখানা ঘরে আর থাকা যায় না। সুবীরও দুটো পয়সা আনছে।

সাবিত্রী বলে রামরতনকে—এ বাড়িতে আর নয়, এখানেই আশপাশে একটা বাসা দ্যাখো বাপু, যেন মা গঙ্গার ধারে কাছেই হয়।

—অর্থাৎ গঙ্গাস্নান যেন রোজ করা যায় ? তাই কইছ।

রামরতনের কথায় সাবিত্রী বলে—তোমার কাছে আর তো কিছুই চাইনি কোনদিন। এটুকুই চাইছি।

রামরতন বাসার খোঁজ করতে থাকে। প্রথম যখন এদিকে এসে ওই গুদামঘরে ঢুকেছিল তখন এই অঞ্চলে বাসা অমিল ছিল না। বরং অনেক বাড়িওলা তখন এখানে ওখানের দেওয়ালে নিজেরা হাতে লিখে কাগজ সেঁটে দিত—ভাড়াটে চাই। খালি বাড়িতেও বিবর্ণ টিনের পাতে লেখা ছোট বোর্ড ঝুলতো—বাটী ভাড়া। কিন্তু কবছরেই এদিকের চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে।

এখন আর বাড়িভাড়র বোর্ড ঝোলে না, মুখে মুখে খবর পেয়েই

ভাড়াটেরা এসে ভিড় করে। আর বাড়িওয়ালাও দর হাঁকে, সেলামীও চায়। তবু খুঁজতে খুঁজতে মশলাপট্টির কোন চেনা মহাজনের একটা বাড়ির সন্ধান পায় রামরতন আহিরীটোলার ওদিকে একটা গলির মধ্যে। পুরনো দোতলা ছোট বাড়িটা, নিচের তলটা ঘুপচি, ওপরের দুখানা ঘর, ছাদ রান্নাঘর আছে। ছাদটাই যেন মুক্তির অবকাশ আনে। পাশের বাড়ির একটা গাছের ডালও এদিকে এসেছে, তাতে গুলঞ্চ ফুলের রাশ। সাবিত্রীর পছন্দ হয় ওই ছাদটুকুর জন্যেই। ভাড়াও বেশী নয় আর গঙ্গাও গলি থেকে একটু এগিয়ে গেলেই রাস্তার ওপারে। তাই এই বাড়িটাই ভাড়া নেয় তারা।

ভূষণ সব শুনে বলে—চলে যাবে রামরতন।

মল্লিকাও ফোড়ন কাটে—এখন বাপ বেটায় রোজগার করছে। মেজছেলে তো ভালোভাবে পাশ করে কলেজে পড়ছে। জজ ম্যাজেস্টর হবে, এখানে আর থাকবে কেন ?

সাবিত্রী বলে—তা নয় রে মল্লিকা। তোদের ঋণ জীবনেও শোধ করতে পারবো না। এখানে অসুবিধা হচ্ছে, তাই চলে যাচ্ছি।

ভূষণ বলে—যেতে তো বলিনি বৌঠান। তবে ফেলে যাচ্ছো কেন আমাদের ?

—না! তবে ঠাকুরপো পাশেই থাকছি। নিমতলা আর আহিরীটোলা তো পাশাপাশিই।

চলে এলো সাবিত্রী নতুন বাসায়। এখন তার নিজের সংসার। এতদিন পরের আশ্রয়ে তাদের দয়ায় পড়েছিল বলেই মনে হতো। এখন সাবিত্রী এই পুরোনো বাড়িটাকেই চুনকাম করিয়ে নেয়, ছাদে একপাশে গঙ্গার মাটি এনে টবে তুলসীগাছ পোঁতে, ছাদের চিলে ঘরের একপাশে মাকালীর ছবি একটা বসায়। সমীর ওই ছবিকে প্রণাম করে। মা বলে—যখনই দুঃখকষ্টে পড়বি মাকে ডাকবি, দেখবি মা সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

—সত্যি! ছোট্ট সমীর শুধোয়।

সাবিত্রী বলে—সব হারিয়ে এদেশে এসে প্ল্যাটফর্মে পড়েছিলাম, কত ডেকেছি মাকে। আহার আশ্রয় কিছুই নাই। তোর বাবা পথে পথে ঘুরছে। মায়ের দয়াতেই আবার মাথা গোঁজার ঠাঁই, পায়ের তলে মাটি, এই আশ্রয় সব পেয়েছি রে। মাই দুঃখ দেন—আবার তার ওপর বিশ্বাস রেখে ডাকলে তিনিই সেই দুঃখ দূর করেন।

সমীর মায়ের কাছেই থাকে বেশীক্ষণ। মা-ই তার কাছে সব। মা বলেন—জীবনে অসৎ হতে নাই রে, যে সৎভাবে থাকে মা তাকেই দয়া করেন। মায়ের দয়ার যোগ্য হতে গেলে সৎ হতে হয়। জীবনে চুরি, মিথ্যাকথা বলা, অন্য লোককে ঠকানো, কাউকে কষ্ট দেওয়া—এসবই অসৎ কাজ। এগুলো করিস না। দেখবি তোর কষ্টও কোনদিন হবে না। হলেও তা হবে দুদিনের, তুই পরে সুখী হবি।

সমীর স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

বড়দাদা এখন বড়বাজারে তামাকের পাইকারী ব্যবসা শুরু করেছে। আর ওই লাইনের বড় ব্যবসাদার গতিবাবুও তাকে সাহায্য করেন।

গতিবাবু এই বাজারে বেশ কিছুদিন ধরে তামাকের ব্যবসা করে এখন বড়লোক হয়েছেন। বিহারের উত্তর অঞ্চল, মাদ্রাজ-অন্ধ্রের দিক থেকে, গুজরাত থেকে বিড়ির তামাক এনে এদিকের বাজারে যোগান দেন। মফঃস্বলে তার অনেক খরিদ্দার।

মানুষ ভাত খাক না খাক নেশার জিনিস ঠিকই ব্যবহার করবে। ফলে তামাকের ব্যবসা ভালোই চলে। সুবীরকে দেখে গতিবাবুর ভালো লাগে। ছেলেটি কর্মঠ-পরিশ্রমী আর সৎ। মাল প্রথমে তাকে অল্পই দেন, কিন্তু সুবীর সে সব মাল ঘুরে ঘুরে পাইকেরদের বিক্রী করে মহাজনের টাকা আগে মিটিয়ে দেয়। আর মালও বেশী বিক্রী করে। ফলে গতিবাবুও খুশী আর পাইকেরদের অনেকেই সুবীরের ব্যবহারে আর নিয়মিত মাল যোগান দেবার ফলে সবই বাঁধা খদ্দের হয়ে যায়। আরও খদ্দের বাড়তে থাকে। ফলে সে এখন টাকা জমা রেখেই মাল তোলে—বিক্রীও করে বেশী।

গতিবাবুই বলেন—একটা ছোট ঘর ভাড়া নাও হে, বড়বাজারের আশপাশে হলেও চলবে। মাল কিছু স্টক করো আর পাইকেররা জানবে তোমার নিজের দোকান আছে। তাতে ব্যবসায়ে সুনাম বাড়বে, সুবিধাই হবে কাজ-কারবারের।

—কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। মাল কেনার টাকা ভেঙে দোকান ঘর নেব ? বলে সুবীর।

গতিবাবু হিসাবী লোক। এর মধ্যে সেও খবর নিয়েছে সুবীরের সম্বন্ধে। রামরতনবাবুকেও চেনে সে।

গতিবাবু বলে—টাকার জন্য ভেব না। তুমি ঘরের সন্ধান করো।

এর মধ্যে গতিবাবুই সেদিন দত্ত কোম্পানীর গদিতে আসেন। রামরতনের শরীরটা ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। এমনিতেই তার হাঁপানির ধাত। শীতকালে সেটা বাড়ে, আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন সেটা বাড়ছে।

বুকেও ব্যথা করে। এসব কথা সাবিত্রীকে বলে না। সে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া খরচারও ব্যাপার আছে।

এখন শুনেছে সে সুবীর ভালো রোজগার করছে। কিন্তু রামরতন ছেলের কাছে টাকা চায় না। হয়তো মাকে কিছু দেয় সে। কিন্তু জেনেছে মাকেও কিছু দেয় না তেমন।

সুবীর বলে—ব্যবসাটা দাঁড়াক, তারপর দেখা যাবে। ফলে রামরতনের রোজগারেই সংসার চলে। কিন্তু এই ক'বছরে বাজার দর যেভাবে হু-হু করে বেড়েছে তার রোজগার তো তত বাড়েনি। ফলে অভাবও তেমনি রয়ে গেছে। তাই সেই দিন আনা দিন খাওয়ার ব্যাপারটা বদলায়নি রামরতনের।

অধীর এবার বি-এ দিচ্ছে। ভরসা এই অধীর। সে আরও পড়তে চায়, এম-এ করে তবে চাকরির সন্ধান করবে। ততদিন রামরতনকেই এই জীর্ণদেহে সংসারের বোঝা টানতেই হবে।

সমীর এখন প্রাইমারী স্কুলে পড়ছে, এবার ক্লাস ফাইভে উঠবে। তার বইপত্র পড়ার খরচও আছে।

রামরতনবাবু রাতে প্রায় জেগে থাকে হাঁপানির টান উঠলে, আর নানা ভাবনাই জাগে তার মনে। এত লড়াই করে ও জীবনের দিনগুলোকে বদলাতে পারেনি। অভাব তার যেন নিত্যসঙ্গী হয়েই রয়েছে।

রামরতন দোকানে খাতা লিখছে এমন সময় গতিবাবুকে আসতে দেখে চাইল। গতিবাবুকে চেনে সে।

গতিবাবু বলে—আপনার কাছেই এলাম রামবাবু।

—আমার কাছে? রামরতন বলে—খবর দিলে আমিই যেতাম?

গতিবাবু বলে—না, না। আমারই দায়! আমাকেই যেতে হবে আপনার বাসায়, ওখানেই কথা হবে। কাল রবিবার, সকালে যদি যাই আপনার বাসায় অসুবিধা হবে?

রামরতন অবাক! তার মত লোক রামরতনের বাড়ি আসবে এ তো তার ভাগ্যের কথা।

রামরতন বলে—আসুন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। বাসার ঠিকানাও দেয় তাকে।

সুবীর সেদিনই বৈকালে গতিবাবুর গদিতে গিয়েছে। জানায় সে—বিডন স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই একটা দোকানঘর পেতে পারি বড় রাস্তার উপর। কিন্তু সেলামী লাগবে হাজার দশেক টাকা, মাসিক ভাড়া দেড়শো টাকা।

গদিবাবু বলে—পরে এসো, দু' তিন দিন পরই। তখন কথা হবে। বাড়িওলাকে বলো যা বলার দু' তিন দিন পরেই বলবে।

সাবিত্রীও ভাবেনি যে এত বড় মানুষ আসবে তার এই ভাঙ্গা বাড়িতে। রামরতন বলে রেখেছিল তাকে।

সুবীর সকালেই তাগাদায় বের হয়েছে। গতিবাবু আসেন, গলির মুখে গাড়ি রেখে হেঁটেই আসেন এ বাড়িতে।

উপরের ছাদে সাবিত্রী এর মধ্যে টবে বেশ কিছু ফুলের গাছও লাগিয়েছে। সেখানেই বসেছে ওরা।

গতিবাবুর এক ভাইয়ের দুই মেয়ে তার কাছেই থাকে। গতিবাবুর নিজের মেয়ে নেই। ছেলে দুটি, তাই ভাইয়ের মেয়েদেরই তিনি মানুষ করেছেন।

ভাইয়ের বড় মেয়ে রীনার জন্যই সুবীরকে পছন্দ করেছেন তিনি।

রামরতন বলে—আপনার ভাইঝি এত আদরে এত ভালোভাবে মানুষ হয়েছে, সেকি আমাদের ঘরে এসে মানিয়ে নিতে পারবে?

গতিবাবু বলেন—মেয়েরা জলের মত, যখন যে পাত্রে রাখবেন তারই আকার নেবে! তাহলে রীনাই বা পারবে না কেন? আর ছেলে হিসাবে সুবীরকে চিনি। ব্যবসা ও বোঝে, ওর অবস্থা একদিন ও নিজেই বদলাবে। মেয়ের ভাগ্যে থাকলে এখানেই রাজত্ব করবে—আর বরাতে না থাকলে রাজার ঘর দেখে দিলেও ফকির হয়ে যাবে। এখন আপনার মতের আশাতেই এসেছি রামরতনবাবু। সুবীরের ব্যবসায় আমিও কিছু মদত দিতে পারবো।

সাবিত্রী ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে ঈষৎ ঘোমটা টেনে। সকলের সামনে সে বের হয় কম, আগেকার গ্রামীণ স্বভাব, সেই লজ্জাশীলতা তার রয়ে গেছে।

রামরতন স্ত্রীর দিকে চাইল। সংসারে এত বড় সিদ্ধান্তটা সে স্ত্রীকে না জিজ্ঞাসা করে নিতে পারে না।

সাবিত্রীই গলা নামিয়ে বলে স্বামীকে—মেয়েটিকে দেখে এসো, তারপর যা বলার বলবে। ওঁর মত মানুষ এসেছেন!

রামরতন ওই কথা বলতে গতিবাবু বলেন—খুব ভালো কথা। কালই আসুন।

সাবিত্রীর ছেলে অধীর, সমীরকেও দেখেন গতিবাবু! মিষ্টিমুখ করে চলে যান ওদের তার বাড়িতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে।

সাবিত্রীর সংসারে মেয়ে নেই, ছেলেদের নিয়েই তার সংসার। তারও এবার ইচ্ছা হয় সব মা বাবার মতই তার ঘরেও একটি বউ আসুক।

সাবিত্রীও অতীতে একদিন তার শ্বশুরবাড়িতে নববধূ হয়ে এসেছিল। শাশুড়ী তাকে বরণ করে নেয় মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজিয়ে।

ক্রমশঃ পরমাটি থেকে এসে একটি নতুন গাছ সেই মাটিকেই আপন করে নিয়েছিল। সংসার পেতেছিল।

আজ সাবিত্রীও চায় এই সংসার, তার ছেলেদের ভার নতুন বউয়ের হাতে তুলে দেবে, যে পরম স্নেহে মমতায় এই সংসারের পরম্পরাকে বজায় রাখবে। নতুন দেশে এসে এখানেই তারা ঘর পাতবে। মাটির গভীরে শিকড় বিস্তার করে ফুলে ফলে সেজে উঠবে তার সংসার আবার এই মাটিতেই।

তাই সাবিত্রী বলে স্বামীকে—তুমি মেয়ে পছন্দ হলে মত দিও বাপু। সুবীরও ঘর বাঁধুক।

অবশ্য সুবীরের ইচ্ছাটা প্রবলই এ বিয়েতে। সে জানে বাবার ক্ষমতা সীমিত। তারা দেশ ছেড়ে এসে এদেশে কি ভাবে লড়াই করেছে তা কিছুটা সে জানে। খাবার জন্য ভাবতে হয়েছে। আশ্রয় নাই, আজও ভাড়া বাড়িতে পড়ে আছে। সুবীর চায় নিজের ব্যবসা গড়ে তুলতে। সে চায় তার বাড়ি, গাড়ি ফোন এসব হবে। ব্যবসা আরও বাড়বে। নিজের দোকান, গুদাম করতে পারলে মাল সস্তায় কিনে স্টক করে চড়া দামে ছাড়তে পারবে বে-মরশুমে, তাতে ডবল লাভই হবে তার।

এসব কাজে ওই গতিবাবুর মদত তার চাই। বাবাকে নয় এখন তার বেশী দরকার গতিবাবুর মত ধর্মবাপকে। আজ দেখেছে সুবীর, গতিবাবু তাকে নগদ দশ হাজার টাকা দিয়ে বলে—দোকানটা নিয়ে নাও।

সুবীরও অবাক, বলে সে—কিন্তু এ টাকা শোধ দেব কি ভাবে?

গতিবাবু হাসেন, বলেন—দোকান নাও, ব্যবসা জমাও। পরে ওসব শোধ দেবে টাকা হলে! আর বড়বাজারের ওই কেনা বেচাটা ছেড়ো না। আমার গদিঘরের ওপাশে টেবিলেই বসে ওসব করবে।

গতিবাবুর এই ঋণ জীবনে ভুলবে না।—সুবীর তাই বাড়ি এসে মা বাবাকে বলে—একটা দোকান নিলাম মা!

রামরতনবাবু অবাক হয়। তার কাছে এসব স্বপ্নই। সুবীর তা সত্যে পরিণত করেছে। রামরতনবাবু বলে সে—তো অনেক টাকার ব্যাপার।

সুবীর বলে—তার ব্যবস্থা করেছি। দু এক দিনের মধ্যে পুজো করে দোকান চালু করবো!

সাবিত্রী সব শুনে স্বামীকে বলে—তুমি ওখানে বিয়েতে মত দাও বাপু!

—কেন?

রামরতনের কথায় সাবিত্রী বলে—মেয়েটির লক্ষণ খুবই ভালো, ও ঘরে আসতে না আসতে সুবীরের দোকান হলো। ব্যবসা বাড়লো। দেখছো না?

অধীরের বি-এ পরীক্ষা চুকে গেছে। রীতিমত ভালো ছেলে সে। মনে হয় ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স পাবে। আর সমীর তখন ক্লাশ সিক্স-এ উঠেছে।

অধীর স্কলারশিপের টাকাতেই বি-এ পড়েছে। সেও দেখেছে জীবনে চরম দুঃখকষ্টের দিনগুলোকে। দেখেছে টাকা পয়সার অভাব মানুষের জীবনে কত বড় বিপর্যয় আনে। আর তাকে এই জীবনে এগিয়ে আসতে কেউই সাহায্য করেনি। বাবা দিনরাত খেটে তাদের ফেলে রেখেছিল সেই অন্ধকার গুদাম ঘরে ইঁদুরের রাজ্যে, আর পেটপুরে দুবেলা খেতেও পায়নি। পড়ার বই ছিল না। মদনের, অন্য বন্ধুদের টিটকারী শুনেছে, তাদের বই নিয়ে পড়েছে।

জীবনে একমাত্র পণ ছিল তাকে নিজের ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। বাবাও তাকে এ পথে সাহায্য করেনি। নিজের চেষ্টাতেই সে বি-এ পাশ করেছে।

এম-এ টাও করবে। সংসারের কারোও কাছে তার কোন ঋণ নেই। তাই মনে মনে কোথায় তারা স্বার্থপর-আত্মকেন্দ্রিক জীবই হয়ে উঠেছে এই জীবনের লড়াই করতে করতে। নিজে লড়ে জেতো—নাহলে হেরে মুখ থুবড়ে পড়ে শেষই হতে হবে। কেউ তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না। এই কথাটাই বিশ্বাস করেছে সে।

অধীর তাই নিজের পথেই এগোতে চায়। সে ব্যবসা বোঝে না, সে পড়াশোনা করে, এই পথেই তাকে এগোতে হবে।

আর এর মধ্যে মায়াও এখন কলেজে পড়ে।

ওই মেয়েটা তাকে আজও ভোলেনি। মায়া অধীরকে ছোট থেকেই দেখেছে। ক্রমশঃ দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতাই গড়ে উঠেছে তাদের অজান্তে।

মায়াও স্বপ্ন দেখে।

এখন তারও নিজের একটা মানসিকতা গড়ে উঠেছে। দেখেছে তার দাদা মদন এখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

বাবাও এসব মেনে নিতে পারে না। দাদা ব্যবসাপত্রও দেখে না। বাবারও শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। দোকানেও বেশীক্ষণ থাকতে পারে না, ফলে কর্মচারীরাই লুঠপাট শুরু করেছে। ভূষণবাবু দেখে মাত্র। আর দাদা দোকানে গিয়ে রোজগারপত্রের দিকে না চেয়ে টাকা নিয়ে বের হয়ে যায়। মদ খেয়ে ফেরে অনেক রাত্রে। এ নিয়ে ছেলেকে কিছু বলতে গেলে মল্লিকাই রেগে ওঠে। বলে সে—একটা মাত্র ছেলে তাকেও দেখতে পারো না?

ভূষণবাবু বলে—মদোমাতালকে কে দেখবে বলো তো? ওর জ্ঞান আক্কেল হবে না? এসব ব্যবসা দেখভাল না করে তো পথে দাঁড়াতে হবে একদিন তোমাকে।

মায়াও বুঝেছে এই সংসারের পরিণতি অমনি কিছু না হয়। সে তাই চায় ভালোভাবে পড়াশোনা করতে।

অধীরই বলে—অনার্স ঠিকই পাবে।

মায়া বলে—যদি পাই তোমার জন্যই পাব অধীরদা। তুমিই আমার জন্য এত করছো।

অধীর বলে—নিজেও খেটেছো।

মায়ার দু' একজন চেনাজানা পরিবারেই ছাত্র পড়ায় অধীর। অধীর তাই মায়ার কাছে কৃতজ্ঞ আর মায়াও জানে অধীরও ভাবে তার জন্য।

তাই কলেজের পর দুজনেই মাঝে মাঝে ইডেন গার্ডেনের দিকে যায়। দুজনের বাড়িতে কেউ জানে না। অধীর জানে মায়ার মা চায় না যে মায়া অধীরের সঙ্গে মিশুক। কারণ মায়ার মায়ের কাছে ওরা এখনও সেই ছিন্নমূল বাস্তুহারা, 'রিফুজি' যেন বিচিত্র এক জীব, যাদের কোন বিশিষ্ট সত্তা নাই।

মায়াও তার এই ঘনিষ্ঠতাকে এবাড়িতে জানতে দিতে চায় না। অধীর আর মায়া তাই একান্তে মেশে। হয়তো তাদের ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখে দুজনে।

মায়া বলে—দাদা যেভাবে চলছে তাতে বিপদ না হয় সংসারের। মনে হয় আমার নিজের পথ নিজেকেই দেখতে হবে।

অধীর বলে—না। যদি আমি এম-এ তে ফার্স্টক্লাশ পাই একটা ভালো কলেজে প্রফেসারী পাবোই। তুমিও পড়াটা চালিয়ে যাবে মায়া।

সাবিত্রীও স্বপ্ন দেখছে এবাড়িতে নতুন বউ আসবে। তার মেয়ে নেই। মেয়ের মতই হয়ে থাকবে সে। তার ছেলেদের মধ্যে এখন সমীর ছোট, তার খুবই প্রিয়। সমীরের ভার নেবে সেই নতুন বউ

সুবীরের বিয়ে হয়ে গেল ওই গতিবাবুর ভাইঝি রীনার সঙ্গে। ভাইয়ের মেয়ে হলেও গতিবাবু তার বিয়েতে দানসামগ্রী আসবাবপত্র গহনা সবই দিয়েছেন। সাবিত্রী এতদিন পর গরদের লালপাড় শাড়ি পরে নতুন বউকে বরণ করে।

মল্লিকাও এসেছে। ভূষণবাবুর শরীর ভালো যাচ্ছে না, রামরতনও ভুগছে হাঁপানিতে, তবু তারাও রয়েছে। সুবীর বৌ নিয়ে ঘরে এলো।

সাবিত্রী আজ ওই মা কালীর ছবির সামনে প্রণাম করে।—মা, বানে ভাসা খড়কুটোর মত এদেশে এসে ঠেকেছিলাম ভিখারীর মত। তোমার দয়াতেই আজ সব কিছু পেয়েছি। সংসারে যেন শান্তি আসে মা। ওদের সুখী করো।

বিয়ের উৎসবে মায়াও আসে মল্লিকার সঙ্গে। মল্লিকা দেখে একদিন যারা ভিখারীর মত এসেছিল আজ তারাই পেয়েছে অনেক কিছু। ওই সুবীর ভালো ব্যবসা করছে, নিজে দোকান করেছে। রোজগারপাতি ভালোই করছে।

অধীরও ভালোভাবে বি-এ পাশ করে এম-এ পড়ছে স্কলারশিপ নিয়ে। আর তার ছেলে আজ বখাটে, মদ্যপ। শোনা যায় কোন বাজে মেয়েদের সঙ্গে ঘোরে। ব্যবসাও দেখে না মদন। কর্তার শরীর ভেঙে পড়ছে। এরপর তার সংসারের কি গতি হবে জানে না মল্লিকা।

অথচ এদের ছেলেরা দাঁড়াচ্ছে, সংসার ভরিয়ে তুলছে আর তার সামনে হতাশার ছায়াই নামছে। মনে মনে খুশী নয় মল্লিকা। স্বামীকে বলে মল্লিকা —চলো এবার।

মায়া তখন নতুন বৌ রীনা তার ছোট বোন এসেছে তার সঙ্গে গল্প করছে। মল্লিকা বলে—চল মায়া, রাত হয়েছে।

মায়া বলে—তোমরা যাও, আমি যাচ্ছি।

সাবিত্রী বলে—বেশি রাত হয়নি, ও থাক! অধীর, সমীর যে কেউ হোক পৌঁছে দেবে।

সমীরও চেনে মায়াদিকে। বলে—তাই দোব কাকীমা।

অধীর এই সুযোগের অপেক্ষাতে ছিল। সেইই রাতে পৌঁছে দিতে চলেছে মায়াকে। মায়া আজ সেজেছে। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরনে হলুদ রঙের শাড়িটা ওর নিটোল দেহে চেপে বসেছে।

চোখে হাসির আভা। অধীর বলে—এ যে বিয়ের কনের মতই সেজেছো?

মায়া হাসে। বলে—বর তো পেলাম না। সাজাই বৃথা হোল।

অধীর বলে—উমাকেও বরের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। তুমিও করো —সাধনার কাল পূর্ণ হলে বর ঠিকই আসবে।

মায়া বলে—একালের উমারা সাধনা করে না। তাদের এত সময় কই? শোনো—একটা স্কুলে টিচারের চাকরি পাচ্ছি।

—সেকি! চাকরি করবে?

মায়া বলে—নিজের স্বাবলম্বী হবার পথ পরিষ্কার করতে হবে অধীর। দাদার ভাবগতিক ভালো বুঝছি না। বাকী ভরসা তুমি! কিন্তু তোমাকে এম-এ করতেই হবে।

রীনা এবাড়িতে এসে ঠিক খুশী হয়নি। তার স্বপ্ন ছিল কোন বড়লোকের নিদেন দুমহলা বাড়িতে বিয়ে হবে, গাড়ি থাকবে। অন্ততঃ ভালো অফিসার বর হবে। তার বন্ধুদের অনেকের বিয়েতে গেছে। দেখেছে অনেক ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছে তাদের। তার কাকা যেন এভাবে বিয়ে দিয়ে দায় সেরেছেন মাত্র। পুরোনো বাড়িটার নিচের তলায় রোদ ঢোকে না। উপরে পাশাপাশি দুখানা ঘর—সামনে ওই ছাদটুকুই একটু দাঁড়াবার জায়গা মাত্র।

রীনাদের জন্য তবু সাবিত্রী দক্ষিণ দিকের ঘরটাই ছেড়ে দিয়ে তারা পাশের ঘরে এসেছে।

রীনা বলে—এত ফার্ণিচার কোথায় রাখি—খাট, সোফা সেট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারী। কাকাবাবুর খেয়েদেয়ে কাজ নাই, বিয়ে দিলেন ভাঙ্গা ঘরে আর এসব এখানে মানায়?

সাবিত্রী বলে—মা, বরাতে থাকলে নিজেদের বাড়িই করো। আমরা তো এখানে সব হারিয়ে এসেছিলাম, এবার তোমাদের বরাতে থাকে সব করবে আবার।

রীনা জবাব দেয় না। ওদিকে অধীরের কলেজের ভাত। সমীর স্কুলে যাবে। সাবিত্রীর সময় নেই। ক'দিন ঠিকে ঝিও আসছে না।

ওদিকে রীনার বেলায় ওঠা অভ্যাস। শীতের দিন। ভোর থেকে ওঠা সাবিত্রীর অভ্যাস। সেই উঠে কলতলায় ওই হিমে বসে বাসনপত্র মেজে নেয়। শীতে হাত কনকন করে। তারপর উনুন ধরিয়ে চা চাপায়। ওই আঁচে হাতও সেঁকে নেয় সাবিত্রী।

সমীর মায়ের কাছেই শোয়। সেও সকালে উঠে দুধ আনে। তখন বাবা জাগে। সারা রাত হাঁপানির টান চলে, ঘুমুতে পারে না। ভোরের দিকে চোখ লাগে তার।

ইদানীং রামরতনের শরীর ভেঙে পড়েছে। দোকানে তবু যেতে হয়। কারণ সংসার সম্বন্ধে সুবীর উদাসীনই। নতুন বউ আসার পর সংসারের খরচাও বেড়েছে। রোজ মাছ চাই বৌমার। আনাজপত্র, জলখাবারের বরাদ্দও বেড়েছে। সবই যোগাতে হয় রামরতনকেই এই সময়েও।

সাবিত্রীরও যেমন খাটুনি বেড়েছে তেমনি খাটুনি বেড়েছে রামরতনেরও। সুবীর অবশ্য বলে রীনাকে—মায়ের কাজে একটু হাত লাগাও।

রীনা সকালে বিছানায় বসে শাশুড়ির হাত থেকে বেডটি নেয়। তারপর বাথরুম সেরে এসে কাকার দেওয়া খাটে বসে থাকে—সেলাই না হয়, উলই বোনে।

সে বলে সুবীরের কথায়—রান্নাবান্না ওই কয়লার ধোঁয়ায়? ওরে বাবা, ওসব পারবো না।

ততক্ষণে সাবিত্রীই ছেলে বৌমার জন্য টোস্ট, মাখন, কলা, কোনদিন সন্দেশ এসব সাজিয়ে, না হয় ডিমের ওমলেট করে ব্রেকফাস্ট দেয়। সুবীর বের হয় কাজে।

রীনা আবার উল নিয়ে বসে। সেদিন আনাজ কুটতে গিয়ে বঁটিতে আঙ্গুল কেটেছিল রীনা।

সাবিত্রী বলে—থাক বাছা, আমিই আনাজ কুটে নেব।

রীনা উঠে পড়ে। সেই থেকে ওসবও করে না রীনা।

সমীর দেখে মা নিচের রান্নাঘরে ওই গরমে ঘামছে, বাবা উপরে হাঁপাচ্ছে। তাকে দেখারও কেউ নাই। বড়দা, মেজদাও বাইরে।

সমীর বলে—মা। ওসব থাক। তুমি উপরে যাও। বাবার শরীর খারাপ। বৌদিও তো দু'একদিন রান্নার কাজ করতে পারে। দিনরাত খাটে বসে থেকে সেবা নেবে?

রীনাও কথাগুলো শোনে।

সাবিত্রীই বলে—সমী, তুই বাবার কাছে থাক। আমার রান্না হলেই যাচ্ছি।

সমীর দেখে বাবাকে। লোকটা জীবনভোর শুধু লড়াই করেই এসেছে, বাঁচার লড়াই। আজও এই সংসারের অন্ন তাকেই জোটাতে হয় অথচ এত বড় পৃথিবী যেন তাকে নিঃশ্বাস নেবার মত হাওয়াও দেয়নি। কি প্রবল প্রাণপণ চেষ্টায় সে এতটুকু হাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। খাবি খাচ্ছে এতটুকু হাওয়ার জন্য। তার পয়সা নাই, যদি থাকতো সে মানুষটাকে বিশ্রাম দিত, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। আর মাকে ওই ভোর রাতে উঠে বাসন মাজতে দিত না এই ঠাণ্ডায়।

রাগ হয় বড়দা-বৌদির উপরই সমীরের! দাদা এখন নাকি ভালো রোজগার করে, মেজদা যা লেখাপড়া শিখেছে তাতে এখনই ভালো চাকরি পেতে পারে। মা বাবাকে একটু রেহাই দিতে পারে। কিন্তু তা করেনি সে। ওরা এই বুড়ো-বুড়িকে এখনও ঝি-চাকরের মত খাটিয়ে তাদের পরিশ্রমের অর্থে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা করে চলেছে পরম স্বার্থপরের মত।

সমীর দেখেছে বৌদিকেও। সারাদিন ওই ঘরেই বিয়ের কনের মত সেজে বসে থাকে। মাই ওর খাবার, জলখাবার সব যোগায়। বৈকালে ছাদে এসে বসে বৌদি সেজেগুজে।

মা এসময় ঘণ্টা কয়েকের জন্য ছুটি পেয়ে বের হয়ে আসে গঙ্গার ধারে। কোথাও ভাগবত পাঠের আসরে বসে। তাও ইদানীং পারে না।

বাবার শরীর আরও খারাপ হয়েছে। বুকেও ব্যথা। তাকে ছেড়ে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারে না মা।

সেদিন ভোর রাতে মায়ের আর্তকান্নায় সমীরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখে

বড়দা, মেজদাও এসে জুটেছে, বৌদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, সে এদের ঘরে বিশেষ আসে না। বাবা তক্তপোশে শুয়ে আছে, স্তব্ধ নিঃসাড় দেহ। যেন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে, এতদিন বেঁচে থাকার জন্য, দুমুঠো অন্ন,—দম নেবার মত একটু নিঃশ্বাস বায়ুর জন্য লড়াই করে এবার শান্তিতে বিশ্রাম করছে। মা কাঁদছে—একি সর্বনাশ হল রে।

বড়দা বলে—যা হবার তাতো হয়ে গেল, এখন কেঁদে লাভ কি মা।

মেজদার চোখে তবু দুফোঁটা জল টলটল করে। সমীরের মনে হয় তার জীবন থেকে যেন সব আশার আলোই নিভে গেল। মায়ের কান্নায় তার বুক ভেঙ্গে আসে। মাকে জড়িয়ে ধরে সমীরও অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বাবাকে একমাত্র সেইই কাছে থেকে দেখেছিল। দাদারা বড় হয়েছে, যে যার জগতের পথে ব্যস্ত। সমীরের কাছে বাবা ছিল আপনজন। ইদানীং অসুস্থ হতে সমীরই বাবার কাছে থাকতো। যতটুকু পারতো সেবাযত্ন করতো।

বড় হয়ে দেখেছে সমীর একটা মানুষ ওপার থেকে ভেসে এসে এখানে উপবাস-অর্ধাহারে থেকে লড়াই করেছে তার সংসার, ছেলেদের জন্য। নিজের সামান্য চাকরী—তার উপর দিনভোর ঘোরাঘুরি করেছে দালালির কাজে। সেই পয়সাতে নিজে খায়নি, ওই ছেলেদের খাইয়েছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে। এখন সমীর দেখে বাজার-দোকানে, নদীর ধারের গ্যারেজে, ছোট কারখানায় কত ছোট ছোট ছেলে কাজ করে নিজেদের, তাদের সংসারের অন্ন যোগায়।

বাবা অনায়াসে তার ছোট ছেলেদের সেই পথেই নামাতে পারতো, পোস্তায় কত ছেলে ঝাঁট দিয়ে মশলা কুড়িয়ে না হয় আরও অন্য কাজ করে রোজগার করে। তাতে বাবার শ্রম কিছু লাঘব হতো, কিন্তু ছেলেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেনি বাবা। ওদের পড়িয়েছে, একজনকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তবে নিজে হাতে ধরে ব্যবসার কাজে নামিয়েছে, বড়দা এখন ভালোই রোজগার করে।

মেজদাকেও এম-এ পড়াচ্ছে। তাকেও পড়াচ্ছিল। সেই ছেলেরা বাবাকে কিছুই দেয়নি।

বাবা মারা গেলেন লড়াইয়ের ময়দানেই। সমীরের মনে হয় তার পায়ের নিচে থেকে মাটিটুকুই সরে গেল।

ওদিকে শবযাত্রার আয়োজন হচ্ছে। মায়ের চোখে জল। জীবনের সবচেয়ে আপনজন যার হাত ধরে সে বিদেশে এসেছিল, দুজনের চেষ্টায় ঘর বেঁধেছিল সে আজ চলে গেল তাকে এইখানে ফেলে রেখে।

ওদিকে সুবীর তার দোকানের লোক—পাড়ার দুচারজন ছোটদার বন্ধুও জুটেছে। ভূষণবাবু শয্যাশায়ী—সে আসতে পারেনি। খবর পেয়ে এসেছে মায়া।

সুবীর রীনাকে বলে—তোমার কাছে যে টাকা আছে তার থেকে শ' পাঁচেক টাকা দাও। লাগবে।

রীনা গলা নামিয়ে বলে—মায়ের কাছে আছে, নাও। এ টাকা এখন থাক।

সুবীর বলে—এ সময় মাকে বলা যাবে না টাকার কথা।

রীনা শোনায়—বুড়ো হোঁপা রুগী গেছে, শান্তি পেয়েছে। এত কান্না কিসের? যাও, গিয়ে বলো তো! টাকা চাই—

সমীর কাছেই বসেছিল। ওদের কথাগুলো সে সবাই শোনে। বড়বৌদির ওই কথাতে সে অবাক হয়, আরও অবাক হয় বড়দার ব্যবহারে। এসব কথার এতটুকু প্রতিবাদ করার শক্তি সাহস তার নাই।

সুবীরও সেইমত মাকে গিয়ে বলে—মা, শ' পাচেক টাকা লাগবে। বাবার সৎকার করতে হবে।

সমীর দেখছে ব্যাপারটা। তার মনে হয় মা যদি টাকাটা দিতে না পারে তাহলে এরা বোধহয় বাবার সৎকারই করবে না।

সাবিত্রী ছেলের দিকে চাইল। মা সে। এই সংসারের সব দায় তারই। স্বামীর সংসারের দায়ও। ছেলেদের কোন দায়ই নেই।

সাবিত্রী চোখ মুছে উঠে গিয়ে আলমারি খোলে। সংসার খরচের কিছু টাকা থাকে, রামরতন কিছুদিন আগে দুটো বড় বড় বিক্রীর দালালি করে হাজার তিনেক টাকা রেখেছিল আর কিছু টাকা সাবিত্রীও বাঁচিয়ে রেখেছিল। সাবিত্রী এইভাবে দু'একটা জিনিসও করিয়েছিল। সমীরের জন্য একটা আংটিও করিয়েছিল।

সমীর সেটা বিশেষ পরে না। আংটিটা বাক্স সমেত আলমারিতেই রেখেছে। মাঝে মাঝে বের করে নেড়েচেড়ে দেখতো আংটিটা।

মা বলে—পরেই দ্যাখ না সমী।

সমীর বলে—না, মা। যদি খেলতে গিয়ে কোথাও হারিয়ে ফেলি, তার চেয়ে ওটা ওখানেই থাক। পুজোর সময় পরবো।

মা হাসে।—তুই খুব কিপটে, কালে মস্ত বড়লোক হবি।

সমীর হাসে। বলে—জীবনে যদি কোনদিন বড়লোক হই মা, কি করবো জানো?

—কি রে? সাবিত্রী শুধোয়।

—একটা চব্বিশ ঘণ্টা কাজের লোক রাখব। যে তোমাকে কোন কাজই করতে দেবে না। তুমি বসে থাকবে। তারাই তোমার সেবা করবে। আর ময়লা শাড়ি নয়—ভালো ভালো শাড়ি পরে ভাগবত শুনতে যাবে ওই দত্ত-গিন্নীর মত গাড়িতে চড়ে। বুঝলে?

মা বলে—ওরে বাবা, শরীরে যে বাত ধরে যাবে রে।

আজ মায়ের সেই শাড়িপরা কল্যাণী মূর্তিটাও বদলে যায় থানপরা সর্বহারা এক দুঃখিনী-মূর্তিতে।

বৈকাল নাগাদ বাবার চিতার আগুন নিভে গেল। সমীরের তাদের দেশ দেখা হয়নি। বাবা গল্প করতেন দেশের। বাগান—ধানক্ষেত, মধুমতী নদীর ধারের গ্রাম। সেই মাটির একজন জীবনের পথ পরিক্রমা করতে করতে

কোন দূরদেশে এসে সেখানের মাটিতেই মিশে গেল। সবাই ভুলে যাবে তার কথা।

মাকে দেখে চমকে ওঠে—সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে, হাতের শাঁখাও নাই, রিক্ত শূন্যতার প্রতীক, পরনে সাদা থান। চোখে জল।

সমীর দুহাতে মাকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে। মায়ের চোখের জলও বাধা মানে না।

অধীর বলে—বাড়ি চলো। ওরা সবাই চলে গেছে।

মা তখনও চিতার নিভন্ত ছাইয়ের দিকে চেয়ে যেন হারানো মানুষটাকে খুঁজছে।

সারা বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে সমীরের কাছে। ক'দিন নানা ঝামেলায় কেটে যায়। গতিবাবু—তার স্ত্রী আর ছেলে আসে। সঙ্গে বৌদির বোন বীণাও। বছর দুয়েকের মধ্যে বীণা এখন যেন অনেক বদলে গেছে। এমনিতে সুন্দরী সে। ক্লাশ সেভেনে পড়ে, সমীর এখন ক্লাশ এইটে পড়ছে।

ওরা মিষ্টি-ফল—নানা কিছু আনে। এখন মা আর কদিন সংসারের কাজই দেখেনি। রীনাই অর্থাৎ বড় বৌদি কেমন বদলে গেছে, সংসারের দায় ভার যেন তারই। সেই ওসব জিনিসগুলো ভাঁড়ারে তুলে চাবি দেয়।

রামরতনবাবু যে দোকানে কাজ করতো—তার মালিক দত্তবাবুও এসেছে নানা জিনিসপত্র নিয়ে। সে সব জিনিস, হবিষ্যির জন্য গোবিন্দভোগ চাল-ঘি সবকিছুই বড়বৌদিই ঘরে তোলে।

মেজদা বড়দাতে এখন প্রায়ই আলোচনা হয়। দত্তবাবুর ওখানে বাবার বেশ কিছু টাকা বোনাস, গ্রাচুয়িটি বাবদ পাওনা আছে। দত্তবাবুর ম্যানেজার মাকে বলে—এখন বাবু হাজার তিনেক টাকা শ্রাদ্ধ খরচ বাবদ দিয়েছেন, এটা বাবু এমনি দিয়েছেন। এসব চুকে যাক, তারপর একদিন এসে ওটার পেমেণ্ট করে যাবো।

রীনা শোনে কথাটা। মা ওই খামটাই বড়বৌমার হাতে দিয়ে বলে—এসব তুমি রাখো বৌমা। খরচের সময়। কোথায় ফেলে দেব।

সুবীর অধীর দুজনে আলোচনা করে।

অধীর বলে—দাদা, তুমিই বাবার শেষ কাজের টাকাটা দাও। আমি তো টুইশানি করে চালাই, তবু শ' পাঁচেক টাকা দেব।

সুবীর বুঝেছে তাকেও এবার হিসাব করেই চলতে হবে। রীনা বলে—টাকা! টাকা কোথায় পাবে এখন! দোকানে এত টাকা গেল, মহাজনের দেনা পড়ে আছে। কাকাবাবুর কাছে আর কত হাত পাতবো বাপু, এতদিন তো তার কাছে টাকা এনে সংসারে দিয়েছি। এবার চাইতে লজ্জা করে।

সুবীর বলে—টাকা না থাকে, গঙ্গার ঘাটেই কোনরকমে নমো নমো করে একজন বামুনকে দিয়ে কাজ করিয়ে আসবো। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধই হবে।

সাবিত্রীও শোনে কথাটা। বলে সে—বৌমা, দত্তবাবু তিন হাজার টাকা

দিয়েছেন ওতে আমার হাজার খানেক দিচ্ছি, ছেলেরা না পারে আমিই আমার স্বামীর শেষকাজটুকু এবাড়িতেই করবো।

সুবীর বলে—কিন্তু মা—

সাবিত্রী শোনায়—তোদের তো মানুষ করেছে, তোদের মুরোদ যদি না থাকে করিস না। আমাকে করতে দে!

রীনা ভেবেছিল এ টাকাটা ও হাত করবে। কিন্তু তা হয় না। সেটা বের করে দিতে হয়। রীনা বলে সুবীরকে—সংসারে তোমার কোন কথাই যখন থাকে না তখন কথা বলতে যাও কেন? এবার থেকে যে যার নিজের মতোই চলুক।

সুবীরও বলে—তাই দেখছি। মায়ের সঞ্চয় কিছু আছে।

শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল। কদিন এই বাড়িটা লোকজনের আসা যাওয়ায় ভরে ছিল। ক্রমশঃ শ্রাদ্ধ চুকতে রামরতনের স্মৃতিও যেন এদের মন থেকে মুছে যায়।

সুবীর ব্যবসার কাজে ব্যস্ত। রীনা এখন যেন অন্য মূর্তি ধরেছে। সমীর দেখে সেদিন মায়ের একাদশী। কাজের মেয়ে আসেনি আজও। মাই বাসন মাজছে। বড় বৌদি বের হয়ে বলে—এখনও হল না ওসব। ওদিকে আপনার ছেলে সকালেই দোকানে বের হবে মা।

অধীর বলে—আমাকেও বের হতে হবে মা।

মা কোনমতে উঠে আসে। সমীরই ততক্ষণে উনোনে ঘুঁটে কাঠ দিয়ে আঁচ দিয়েছে। সেইই বলে—মা, বাসনগুলো আমি ধুয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও, দাদাদের রুটি-তরকারি তো চাই।

এখন সুবীর নিজের খরচেই দুধ আনে, উপরে নিজের ঘরের পাশেই একটা ঘর মত তুলেছে। সেখানে ফ্রিজও এনেছে। মাছ ডিম তাতে থাকে, তাই সাবিত্রী ওসব ফ্রিজের জিনিস খায় না।

রীনা বলে—দুধটা গরম করে দিন।

অধীর এবার এম-এ পাশে করেছে। আর কোন কলেজে এখন লেকচারশিপ পেয়েছে—প্রফেসারিও পেয়ে যাবে।

তাই সমীর দেখে এখন বড়বৌদি মেজদার সঙ্গে হেসে কথা বলে। সন্ধ্যার পর ওঘরে বেশ আসরও বসে। তখন রীনার ফরমাইসও বাড়ে।

—মা, কটা পনীর পকৌড়া করে দিন। ফ্রিজ থেকে পনীর সস এসব বের হয়।

সমীর ক্লাশ নাইনে উঠবে। তার স্কুলের মাইনে বাকী, পরীক্ষাতে বসতেই দেবে না পুরো মাইনে-ফিজ সব না মেটালে।

সাবিত্রীও ভাবছে কথাটা। ক'মাসেই সাবিত্রীও দেখছে সংসারের অবস্থা কেমন বদলে গেছে।

রামরতনের শ্রাদ্ধশান্তির পর সাবিত্রীই বলে ছেলেদের—এবার সংসার চলবে কি করে ?

রীনা বলে—কেন ? বাবা তো বেশ কিছু টাকা রেখে গেছেন দত্তবাবুর ওখানে।

সাবিত্রীও জানে সেটা। সে বলে—সুবীর, অধীর তোদের বাবা তো তোদের মানুষ করে গেছেন। তোরাও রোজগার করছিস এখন।

অধীর বলে—সবে এম-এ পাশ করেছি। এখনও চাকরি পাইনি। টুইশানি করেই চালাই।

সাবিত্রী বলে—চাকরী তুই পাবি। সুবীরও রোজগার করছে, তোরাই সংসার চালা বাবা। ওই সামান্য টাকাটা সমীরের জন্যে থাক। ওর তো সারা জীবন পড়ে আছে, স্কুলের পড়াই ওর শেষ হলো না।

সুবীর বলে—ওর ভার নিশ্চয়ই আমরাই নেব মা।

রীনা বলে—ওকি আমাদের পর মা, ওকে কি ফেলে দেব।

সাবিত্রীও ছেলে বৌমার মহানুভবতায় গদগদ হয়ে ওঠে।

রীনা বলে—ওকে স্কুলে কেন কলেজেও পড়াব মা।

সমীর শোনে সব কথাই। ওর জন্য যে দাদা বৌদি, মেজদা এত ভাবে তা সেও জানতো না। কিন্তু মায়ের প্রতি ওদের হৃদয়হীন ব্যবহার দেখে সমীরের কেমন সন্দেহ জাগে।

সমীর ছেলেবেলা থেকেই স্পষ্টবাদী।

সে বলে—আমার জন্য এতো ভাবো জেনে খুবই খুশী হলাম। বৌদি মায়ের জন্যও একটু ভাবো।

—মানে ! রীনা চাইল।

সমীর বলে—একাদশীর দিন মা উপোস দেয়। সেদিনটা তাকে একটু দুধ দিও। তোমাদের দুধ, পনীর মাছ মাংস জোটে, মায়ের জন্য একটু দুধ তো দেবে। মুড়ি চিবিয়ে রাত কাটায়।

রীনা কঠিন চাহনিতে দেখছে ওকে।

সুবীর বলে—সে কি !

সাবিত্রীই পরিস্থিতি সামলে দেবার জন্য বলে—না-না। আমার কোন অসুবিধা হয় না বাছা। বেশ তো আছি। রাতে হাল্‌কা খেলে শরীর ভালোই থাকে।

সুবীর বলে—এবার থেকে দুধের ব্যবস্থা হবে।

সাবিত্রী ছেলেদের কথায় খুশী হয়। রাতে মা সমীর পাশের ঘরেই শোয় দোতলায়।

সাবিত্রী বলে সমীরকে—দাদাদের ওসব কথা বলতে নেই। ওরা এখন ওরাই তোর ভরসা, আমারও। আর কে দেখবে বল আমাদের ?

সমীর বলে—মা তুমিই বলো, মানুষ নয় মা কালীই সবাইকে দেখেন। তাঁকে ডাকলে সব দুঃখকষ্ট দূর হয়। তিনিই ভরসা, তাঁকেই ডাকো মা।

তোমার বড়বাবু মেজবাবুদের উপর ভরসা করা মানেই ফুটো নৌকায় ওঠা। যে কোন সময় অতলে তলিয়ে যাবে বলেই মনে হচ্ছে।

মা ধমক দেয় সমীরকে—থামবি তুই। খুব পাকা পাকা কথা শিখেছিস।

সমীর কেন জানি না এই মানুষগুলোকে ভরসা করতে পারে না।

ভূষণবাবুর শরীর খারাপই চলেছে। ওদিকে মদন ব্যবসা দেখার নামে ব্যবসা থেকে লুটপাট শুরু করেছে। এখন মদই নয়, রেসের নেশাও জুটেছে তার। মাঠেও যায় নিয়মিত। ফলে সংসারে অভাব অশান্তি বাড়ছে। মহাজন, পাওনাদারের লোক এবার দোকানে টাকা না পেয়ে ভূষণবাবুর কাছেই টাকার তাগিদ দিতে আসছে। মল্লিকাও বুঝেছে এবার তাদের হারাবার পালাই শুরু হয়েছে।

তাই বুঝেছে মায়ার বিয়ে দেবার মত অবস্থাও তাদের আর নেই। আর মল্লিকা আগে অধীরকে দেখতে পারত না। নিজের ছেলে গোল্লায় গেল অথচ ওই অধীররা ভিখারীর মত এসে এখন দাঁড়িয়ে গেছে। সুবীর ভালো ব্যবসা করছে—অধীর এম-এ পাশ করে ভালো কাজই পাবে।

মায়া ভুল করেনি। এখন অধীর এবাড়িতে আসে প্রায়ই।

মল্লিকাই খুশী হয়।

ওকে বলে—বসো বাবা, পকৌড়া করছি। মুড়ি পকৌড়া আর চা।

অধীর বলে—দারুণ হবে।

মল্লিকাই খাতির করে ওকে। খবর নেয়, প্রফেসারির মাইনে কত বাবা?

মায়া বলে—মা, মেয়েদের বয়স আর ছেলেদের মাইনে জিজ্ঞাসা করতে নাই।

মল্লিকা বলে—তোর যত বাজে কথা। মায়ের মত আমি—না বাবা?

অধীরও যেন নতুন মা-ই পায় এখানে।

মল্লিকাই আড়ালে মায়াকে বলে—বিয়ের কথাটথা কিছু বলে? পালটি ঘর—জানাশোনা। ছেলেও ভালো।

মায়া মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

মা বলে—সংসারের যা হাল তাতে তোকে নিজের ব্যবস্থাই করতে হবে মা। সবই তো বুঝছিস।

মায়া বলে—স্কুলে চাকরি তো করছি।

—বোকা মেয়ে। মেয়েদের চাকরি হয় হোক—না হয় তাও সই, তবু বিয়েটা হওয়া দরকার রে। ওটাই আসল পরিচয়।

…কথাটা এবার অধীরও ভাবছে।

সংসার চলছে কোনমতে। সাবিত্রীকে সেদিন সুবীরই বলে—দত্তবাবু এই কাগজগুলোয় সই করে দিতে বলেছে মা। কোম্পানীর ব্যাপার তো, হিসাব কিতাব করতে হবে। তোমার চিঠি পেলেই ওসব হবে।

সাবিত্রী ইংরাজী জানে না। বাংলা লিখতে পড়তে পারে। তাই ছেলেকে বলে—সব ঠিক আছে তো রে!

সুবীর বলে—হ্যাঁ মা। আমি দেখে নিয়েছি।

সই করে দেয় সাবিত্রী ছেলের কথায়।

সমীর স্কুল থেকে ফিরে আসে।

বাবা মারা যাবার পর থেকেই তার মনের অবস্থা ভালো নাই।

দেখেছে বড়দা-বড়বৌদি যেন তাকে দেখতে পারে না।

আড়ালে বলে—পাকা ছেলে।

রীনা বলে—দেখবে পয়লা নম্বর মস্তান হবে ও। কথা বলে কেমন চোখ পাকিয়ে। মাকে কেন খাটাই তার কৈফিয়ত দিতে হবে ওকে? ও বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে আর ওকেই পুষতে হবে আমাদের?

সুবীর বলে—ছোট ছেলে!

রীনা শোনায়—মা-ই আদর দিয়ে ওকে বাঁদর করেছে। দেখো এবার ছুরি বোমা না চালায়। দেখি পাড়ায় আজ বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে।

সমীর তার সম্বন্ধে এমন কথা দাদা বৌদির মুখে প্রায়ই শোনে। কিন্তু মা কষ্ট পাবে তাই মাকেও এসব কথা জানায় না সে।

সেদিন মাকে দাদার হাতে ওইসব কাগজও সই করে দিতে দেখে। মা-ই বলে—দত্তবাবুর কোম্পানীতে ওসব দিতে হবে হিসাবের জন্য, পরে টাকা দেবে।

কিন্তু দু'তিন মাস কেটে যায়। টাকা আর আসে না। সংসারে ক্রমশঃ মেজদা আর বড়দার বন্ধুত্বটা বেশীই চোখে ঠেকে। মেজদাও কোন কলেজে চাকরি পেয়েছে। মায়াও আসে প্রায় এখানে।

বড়বৌদির ঘরে হাসি হৈ চৈ-এর শব্দ ওঠে।

সমীরের ওদিকে যাতায়াত নেই। নিচের অন্ধকার রান্নাঘরে মা লুচি ভাজতে ব্যস্ত। বেগুন ভাজা হয়। বড় বৌদি নেমে এসে সব লুচিই নিয়ে চলে গেল উপরে।

সাবিত্রী ওদিকের একটা পাত্রে খান ছয়েক লুচি রেখেছিল সমীরের জন্য।

বড়বৌ বলে—ওগুলো ওখানে কেন?

সাবিত্রী যেন কি অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। বলে—সমীরের জন্য রেখেছিলাম।

রীনা বলে—ওদিকে মেজদা মায়া আপনার বড় ছেলে ওদের খাওয়া হয়নি সমীরের জন্য সরানো হয়েছে?

সেগুলো ও নিয়ে চলে যায়। রীনা মন্তব্য করে—আর লুচি খেতে হবে না!

সমীর মাকে পরে বলে—কেন ওসব করে অপমান সইতে যাও মা? আমার বাসি ভাত কলাই গুঁড়ো মাখা হলেই খাওয়া হবে, তোমার কথাও তো বলে না ওরা? তুমি কি খাবে শুধুলো?

মা চুপ করে থাকে।

ক্রমশঃ বড়বৌদিই কথাটা জানায় মাকে—মেজবাবু বিয়ে করছে।

সাবিত্রী চাইল আনাজ কুটতে কুটতে। তার ছেলেকে মানুষ করেছে, একই বাড়িতে আছে, অথচ মাকে বলেনি। মাকে দিচ্ছে ছেলের বিয়ের খবর অন্য কেউ। মা আজ দূরের মানুষ।

সাবিত্রী বলে—তাই নাকি!

রীনা বলে—মায়াকে বিয়ে করছে। শুনলাম রেজেস্ট্রি বিয়ে নাকি ওদের হয়ে গেছে।

সমীরও পড়ছিল, শোনে কথাটা মা চমকে ওঠে। তবু বিস্ময় চেপে হতাশাভরা কণ্ঠে বলে—ভালোই! সুখে থাক ওরা।

রীনা বলে—পরে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হবে। মাঝে পার্টি-টার্টি দেবে।

সাবিত্রী কিছু বলে না।

রীনাই বলে—তাই মেজবাবু বলছিল নতুন বউ এসে উপরের ঘরটাতেই থাকবে মা। ওদের পড়াশোনা করতে হয়, লোকজন আসে।

বড়বৌ আরও কিছু বলতো এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে নবীনমামাকে উঠে আসতে দেখে চুপ করে গেল সে।

বাবা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে মাঝে মাঝে নবীনমামা একটু বেশী যাতায়াত শুরু করেছে এ বাড়িতে।

আগেও আসতো নবীনমামা, মায়ের দূরসম্পর্কের ভাই। দইহাটার দিকে কোন লোহার দোকানে কি কাজ করে। নবীনমামা এসে বলতো।

—বুঝলি দিদি, এবার নিজেই একটা ঘর নে লোহার কারবার শুরু করবো। আর পরের গোলামী করব না।

রামরতন ওর কথায় কান দিত না।

মাঝে মাঝে এসে নবীনমামা বলতো, এ-কথা সেকথার পর—সাবিত্রী, পাঁচটা টাকা দেতো! ব্যাগটাই ফেলে এসেছি। কালই দিয়ে যাবো। রিক্সা ভাড়া লাগবে।

মা দিত, অবশ্য নবীনমামা আর বেশ কিছুদিন এমুখো হতো না।

বাবা বলতো—ওটাকে বেশী পাত্তা দিও না। তোমার ওই ভাইটি ষোল-আনা গুলবাজ।

এহেন নবীনমামা বাবাকে এড়িয়ে চলতো, বাবা মারা যাবার পর আবার আসা যাওয়া শুরু হলো। অবশ্য ওর আসা যাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ধূমকেতুর মত আসে আবার চলে যায়।

সেদিন বলে সাবিত্রীকে—দিদি, জামাইবাবুর টাকাকড়ি নিজের হাতে রাখবি। ছেলেপুলেদেরও ভরসা নাই। আজকালকার ছেলেরা তো পরের মেয়ের বশ। আমি ওসবেই নাই, বৌকে ধমকে ঠাণ্ডা করে রাখি। ট্যাঁ ফু করতে দিই না একদম।

সাবিত্রী শোনে ওর বকবকানি।

নবীন বলে—ইদানীং লোহার শেয়ার বাজার খুব চড়বে—যদি হাজার দুয়েক টাকার শেয়ার ধরতে পারিস, বছর ঘুরতে না ঘুরতে নগদ দশ হাজার হয়ে যাবে। লাগিয়ে দে কিছু।

সাবিত্রী বলে—টাকা কোথায় পাবো রে ?

—সেকি। দত্তবাবুদের ওখানে টাকা পাসনি ?

—না। সাবিত্রী ভুলেই গেছল কথাটা।

নবীন বলে—সেকি ! আমি খবর নিচ্ছি।

সাবিত্রী তার এসব ব্যাপারে নবীনকে মাথা গলাতে দিতে চায় না। বলে —সুবীকে বলছি ওই দেখবে।

অধীরের বিয়ে হয়ে যায়। মায়া এসেছে এ বাড়ির বৌ হয়ে। ওরাই দোতলার ঘরগুলো, ছাদ সব দখল করেছে। সুবীরের, অধীরের সঙ্গে দেখা করতে লোকজন আসে। মায়াও বাড়িতে কিছু মেয়েদের পড়ায়। তাই নিচের বড় ঘরটাকেও ওরা দখল করে সেখানে সোফা-চেয়ার-টেবিল, বইয়ের আলমারী রেখেছে। ঘরটাকে নতুন করে রং করিয়ে সেখানে বাহারের পর্দা টাঙিয়েছে দরজা জানলায়। ফুলদানীতে তাজা ফুলও রাখে। ওখানেই ওদের পড়ানো, আড্ডা—লোকজনের আনাগোনা চলে। সুবীরের ব্যবসার সুবাদেও পার্টিরা আসে।

ফলে এখন সাবিত্রী আর সমীরকে থাকতে হয় ঘর ছেড়ে ভিতরে ওই সিঁড়ির নিচের খুপরিটায়। একটা তক্তপোশ দিয়েছে ওরাই। মায়ের খাটও আর নাই। ওটাকে পুরোনো ফার্নিচারের দোকানে বিক্রী করে দিয়েছে। সাবিত্রী গুমোট গরমে ওই সিঁড়ির নিচেই নির্বাসিত হয়।

সমীরের মনে জ্বালা ওঠে। এক একটা ঘটনা তার কিশোর মনকে পীড়িত করে। মাকে ওইভাবে ঘর থেকে বের করে দেওয়াটা তার মোটেই ভালো লাগে না।

সে ক্ষেপে ওঠে—এসব কি মা ? তুমি এ বাড়ির মা—সকলের চেয়ে বড়। আর তোমাকেই কাজের মেয়ের মত বাসন মাজা—ঘর মোছা থেকে শুরু করে রান্না সব করতে হবে, আর ঘরের বাইরে ওই সিঁড়ির নিচে পড়ে থাকতে হবে ? ওরা কি ভেবেছে ?

সাবিত্রী সমীরকে থামায়—চুপ কর বাবা ! ওরা কিছু বলেনি। ওদেরই অসুবিধা হচ্ছে দেখে আমিই বললাম এইখানেই থাকবো। তুই গোলমাল করিস না, অশান্তি করিস না বাবা।

সমীর মায়ের কথা ফেলতে পারে না। মায়ের সারা জীবনই অশান্তিতে ভরা। বাবা মারা যাবার পর তার মাত্রা আরও বেড়েছে। সমীর মায়ের দুঃখটাকে আর বাড়াতে চায় না।

মা বলে—তুই মন দিয়ে পড় বাবা। পাশ করে কোন কাজকর্ম পেলে আবার আমার দুঃখের দিন শেষ হবে।

সমীর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—হ্যাঁ মা। আর বেশী পড়াশোনা করলে আবার যদি মেজদার মত হয়ে যাই।

—কেন রে ?

—ও তো তোমাকে যেন চেনেই না। আর মেজবৌদিকে দেখছো ? চোখে চশমা, দুনিয়াকে যেন ডোন্ট কেয়ার ভাব। যে লেখাপড়া মানুষকে অমানুষ করে দেয়, মাকেও ভুলিয়ে দেয়, সে লেখাপড়ায় দরকার নাই মা। খেটেখুটে দুজনে ভাল্লো ভাবেই থাকবো।

সাবিত্রীর চোখে জল আসে। ওই সমীরই তার এখন একমাত্র আশ্রয়।

রাতে সংসারের কাজ সেরে হেঁসেল তুলে সব ধুয়ে মুছে শুতে রাত হয়, তখন সমীর ওই সিঁড়ির নিচে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়েছে। প্রথম প্রথম অভ্যাসমত সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছে দুচার বার। কপাল আমড়ার আঁঠির মত ফুলে গেছে।

ওদের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার অধিকারও নাই, এই কথাটাই বার বার মনে হয়েছে সমীরের। মায়ের মাথাতেও লাগতো। এখন অভ্যাসমতই এই সিঁড়ির গহ্বরে শুয়ে পড়ে।

ওপরে বাবুদের ঘরে তখন বনবন করে পাখা ঘোরে, সুন্দর খাটে দামী বিছানা পাতা। ওদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না।

সিঁড়ির নিচে দুটি প্রাণী তখন জন্তুর মত গুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে। সাবিত্রীর ঘুম আসে না। হাতপাখা নাড়ছে—সমীর দিনভোর ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

কোনদিন সমীরের ঘুম ভেঙ্গে যায় চাপা কান্নার শব্দে।

—মা, কাঁদছো ?

সাবিত্রী যেন ধরা পড়ে গেছে। বলে সে—কই না তো !

কোন রাতে সাবিত্রী তাকে ফেলে আসা গ্রাম, সেখানের উৎসব—ধান কাটার পর পৌষ পরবের স্মৃতি বর্ণনা করতো। মধুমতীর বুকে নৌকায় তারা মেলা দেখতে যেতো, চাঁদনী রাতে নদীর বুকে সেই নৌকাযাত্রায় সমীরও যেন সঙ্গী হতো মায়ের মানসযাত্রায়।

মা ছেলেতে সেই বিচিত্র জগতের পথে হারিয়ে যেতো যেখানে কোন দুঃখের মালিন্য নেই, আছে একটি নিটোল সুখস্মৃতির ঔজ্জ্বল্য। মা ছেলের মধ্যে যেন দুজনের কল্পনা, আশার ভবিষ্যতের একটি সুন্দর জগত গড়ে ওঠে যেখানে আর কারোও প্রবেশাধিকার নাই।

বড় বৌ রীনার বোন বীণা মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে। বীণা দিদির বাড়ির ওই উপরের ঘর থেকে নিচে আসে। দেখে সমীর ওই সিঁড়ির তলে তক্তপোশে অল্প আলোয় বসে বসে পড়ছে।

বীণাই বলে—এ্যাই এত কি দিনরাত পড়ো ? চলো—গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।

সমীরেরও ভালো লাগে বীণার সঙ্গে নদীর ধারে যেতে। রোজই আসে সে এদিকে। স্কুল থেকে ফিরে ওই বাড়ির গুমোট হাওয়া তার ভালো লাগে না। গঙ্গার ধার ধরে হাঁটতে হাঁটতে পোস্তার ওদিকে চলে যায় সে।

সেখানে ফাঁকা জমিতে ট্রাক থেকে বস্তাবন্দী আলু নামানো হয়। বড় বড় ড্রামে জল আর মাঠের মাটিও রাখা থাকে গাদা করে, কত ছেলে মেয়ে সেই বিবর্ণ আলুগুলোকে মাটি মাখিয়ে একেবারে যেন সদ্য তোলা মাঠের আলুর মত চেহারায় এনে শুকিয়ে আবার বস্তায় ভরে, কতজন কত কাজ করছে।

সেখানেও দু'একজন ছেলে, ন্যাপা ওদের দলের সর্দারও তার চেনা জানা।

কখনও নদীর ধারে বটগাছের নিচে বসে থাকে বীণা আর সে। সমীরের কল্পনায় ভেসে ওঠে মায়ের বর্ণনার সেই স্বপ্নের মধুমতী নদী—ওপারের কলকারখানা নয়, ও যেন সবুজ গ্রামসীমা—চিমনিগুলোকে মনে হয় যেন নারকেল গাছ, হাওয়ায় মাথা নাড়ছে।

সমীর বলে—মনে হয় এই কলকাতার ইট কাঠ ছেড়ে যেন দূরে কোথাও চলে যাই।

বীণা বলে—আমারও কলকাতা ভালো লাগে না। কোন মহাজনী নৌকা পাল তুলে চলেছে। ওপারে সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার নামে নদীর বুকে।

বীণা সমীরের দিকে চেয়ে থাকে। সমীরও কিছুক্ষণের জন্য জীবনের সব যন্ত্রণা ভুলে যায়। কি এক আশার স্বপ্ন দেখে।

সমীর বলে—আমি যদি কোনদিন বড়লোক হই তখন অমনি নৌকায় করে দেশবিদেশে বেড়াতে যাবো।

বীণা বলে—ধ্যাৎ। মটর গাড়িই কিনবে। সেদিন আমাকে হয়তো পথে দেখে চিনতে পারবে না।

সমীর বলে—না বীণা—তোমাকে কোনদিনই ভুলবো না।

বীণার নরম হাতখানা সমীরের হাতে। বীণার দুচোখে কি যেন মায়া। বলে সে—সত্যি বলছ সমীর?

—সত্যি। সত্যি-সত্যি।

হঠাৎ বীণার কানে আসে পাশে কোথাও মন্দিরে আরতির শব্দ। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে। বীণা বলে—এ্যাই দেরী হয়ে গেছে। বাড়ি চলো। দিদি ভাববে।

রীনা বীণাকে এতক্ষণ বাইরে থাকতে দেখে একটু ভাবনায় পড়ে। সুবীরও নাই। সাবিত্রী বলে—আছে কাছেপিঠে। না হয় পার্কে, এখুনিই এসে পড়বে বীণা।

রীনা বলে—পথ-ঘাট চেনে না। কোথায় যে গেল।

এমন সময় সমীরের সঙ্গে ফিরতে দেখে চাইল রীনা।

বীণা খুশি ভরে বলে—দিদি ওদিকে গঙ্গার ঘাট—ওই মন্দিরে সব দেখে এলাম সমীরদার সঙ্গে। দারুণ জায়গা। নদীতে সানসেট দারুণ।

রীনা দেখছে বোনকে। মুখটা ওর গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—উপরে চল।

বোনকে নিয়ে উপরে চলে গেল রীনা। সে সমীরের সঙ্গে তার বোনের ঘোরা, ওর সাহচর্যে খুশীতে উপছে পড়া ব্যাপারটাকে আদৌ ভালো চোখে দেখেনি।

উপরে গিয়ে বোনকে খাটে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে, চাপা স্বরে বলে—ওই বখাটে ছেলেটার সঙ্গে তুই ঘুরতে গেছলি? অসভ্য—ইতর।

বীণা দিদির কথায় বলে—না দিদি, সমীর খুব ভালো ছেলে। মোটেই ইতর অসভ্য নয়।

—চুপ কর। বোনকে ধমকে থামিয়ে দেয় রীনা।

বীণা দেখেছে এবাড়ির ব্যাপারটা। ওই সমীর আর ওর মায়ের উপর দিদিরা যে ভালো ব্যবহার করে না তা সেও জানে। তাদের খাবারও এদের থেকে আলাদা। ভাল ভাল রান্না সব করিয়ে নিয়ে উপরে চলে যায় আর এদের জন্য থাকে শুধুমাত্র ডাল ভাত আর বাকী সব্জী মিলিয়ে একটা ঘ্যাঁট মত।

সমীরের জামা প্যাণ্টের অবস্থাও কাহিল। শীতে একটা ছেঁড়া হাফ সোয়েটার আর চাদরই জড়িয়ে শীত কাটায়।

দিদি তো কত উল বোনে, বীণাও শিখেছে। সে এবার নিজেই ওই সমীরের জন্য একটা সোয়েটার বুনছে। ওকে দিয়ে হঠাৎ চমকে দেবে।

দিদির কথায় বীণাও অনেক কিছুই বলতে পারতো, ওদের উপর অন্যায় অবিচারের কথা। হাজার হোক শাশুড়ি—তাকে কিভাবে রেখেছে। কিন্তু চুপ করেই থাকে বীণা। কিন্তু কথাগুলো তার ভালো লাগে না।

সমীরের পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। সে এবার ক্লাশ নাইন থেকে টেনে উঠবে। পড়াশোনায় ভালোই সে। অ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়ে হেডক্লার্কের সামনে বলে সে—ক্লাশের সবাই অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে গেছে, আমার কার্ড পাইনি স্যার।

হেডক্লার্ক শুধোয় গম্ভীরভাবে চোখের চশমাটার ফাঁক দিয়ে চাহনি মেলে—কি নাম? কোন ক্লাশ—কোন সেকশন?

ওসব খবর দিতে হেডক্লার্ক বড় খাতাটা উল্টে দেখে সশব্দে ধপাস্ করে খাতাটা বন্ধ করে বলে কঠিন স্বরে।—সারা বছরের ফিজ, সেশন ফি সব বাকী, তোমার নাম কাটাই উচিত ছিল। কাটিনি এই ঢের। কুল্যে সাড়ে তিনশো টাকা কাল জমা দিলে তবে কার্ড পাবে। নাহলে—

সমীর কাতর স্বরে শুধোয়—না হলে?

—পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। স্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে। ব্যস!

হেডক্লার্ক কথাটা বলে অন্য কাজে মন দেয়। তখনও দাঁড়িয়ে আছে সমীর। হেডক্লার্ক ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে—সং-এ মত দাঁড়িয়ে আছো

যে ? যাও—যা বললাম তাই করো। এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হবে না। সারাবছর সবকিছু বাকী—তার আবার পড়া। যাও—ধমকে তাড়িয়ে দিল তাকে।

সমীর ক্ষুণ্ণ মনে ফিরছে। আজ তার ওই টাকা চাইই. না হলে পরীক্ষায় বসা হবে না। স্কুল থেকেও তাড়িয়ে দেবে। বাড়িতে এসে মাকে কথাটা ঠিকমত বলতেও পারে না। জানে মায়ের সম্বল সঞ্চয় যেটুকু ছিল তা আগেই খরচা হয়ে গেছে। মায়ের তক্তপোষের নিচে টিনের বাক্সে কিছু বাজারফেরত খুচরো আর সামান্য কিছু আছে মাত্র দুদশ টাকা।

দাদাদের কাছেই হাত পাততে হবে। ওরা দিলে তার পড়া হবে। পরীক্ষার ও আবার নতুন বছরের ভর্তির টাকা, বইপত্র কেনার টাকা চাই. স্কুলের জামাকাপড়ও দরকার। বেশকিছু টাকা দরকার।

সাবিত্রী সব শুনে বলে—তোর বড়দা-মেজদাকে বলি।

সুবীরের ব্যবসা এখন ভালোই চলছে। তার দোকান, দালালি মিলে রোজগার মন্দ হচ্ছে না। আর অধীর মায়া দুজনেও ভালোই আছে।

সাবিত্রী দেখেছে অধীরকে। লেখাপড়া শিখে আর ওই মায়াকে ঘরে এনে দুজনেই বদলে গেছে। তাদের মানসিকতার রদবদল হয়ে গেছে।

অধীরের এই পরিবেশই ভালো লাগে না। সে এখন কোন কলেজে কাজ করছে। তার সহকর্মী বন্ধুদের বাড়িতে গেছে। দেখে তারা পিছনের সংসারের সব বোঝা, সব দায় দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেবা দেবীতে মিলে কেমন সুন্দর ভাবে ফ্ল্যাট সাজিয়েছে, নতুন সংসার গড়েছে।

ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দরজায় শান্তিনিকেতনী পর্দা, দামী ফ্লাওয়ার ভাসে ইকাবোনায় সাজানো ফুল পাতা। ঝকঝকে আলমারীতে বই-পত্র সাজানো। কালার টিভি, ফ্রিজ—ফোন—রান্নার গ্যাস, আধুনিক ঝকঝকে মোজাইক টালি বসানো ঘর, কিচেন। বাথরুমগুলোও কমোড বসানো, ঝকঝকে।

তাদের এই বাড়িটা একেবারে সেকেলে, তাকে মেজেঘষেও আধুনিক চেহারায় আনা যায়নি। সুবীর অবশ্য অধীরকে বলে—বাড়িওয়ালা এই বাড়ি বিক্রী করতে চায়। এটা কম দামেই পাওয়া যাবে। বল তো নিই দুজনে।

সুবীর এদিকেই থাকতে চায়। কারণ তার ব্যবসাপত্র, কাজকর্ম এদিকেই। এ বাড়িটা কিনলে সে নিচের তলাটাতে গুদামই করবে।

কিন্তু মায়া এখন অন্য স্বপ্ন দেখে। তার স্কুল বালিগঞ্জের দিকে। এখান থেকে যাতায়াতেরও হাঙ্গামা। তাই সে চায় ওদিকে যদি জমি মেলে, তার জন্য অধীর আর সে কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে। ভালো জায়গা মিলতে পারে বালিগঞ্জের আশপাশে। ওদিকেই এখন ভালো ভালো লোকেরা সব চলে যাচ্ছে উত্তর কলকাতা ছেড়ে। তারাও ওই নতুন পরিবেশে চলে যাবে। সেখানেই তারা আস্তানা গাড়বে।

সুবীর তাই নিজেই এবাড়ি কেনার কথা ভাবছে।

অধীর বলে—এই গলির মধ্যে এঁদো পাড়ায় মানুষ থাকে? মায়াও স্বপ্ন দেখে বালিগঞ্জের দিকে গিয়ে তার ঘর বাঁধবে, সেই ঘরকে সাজাবে! তাই এখানের কোন কিছুর উপরই তাদের মায়া আর নাই।

মা ছোট ভাই যে সিঁড়ির নিচে দুটি অবহেলিত জীব পড়ে আছে সে খেয়ালও নাই তাদেব।

সাবিত্রী এত সব ভিতবের খবর জানে না। দিনগত পাপক্ষয় আর দেহপাত করে সে এদের অন্ন যুগিয়ে চলেছে দাসী বাঁদীর মত খেটে, বিনিময়ে ওই ভাবেই পড়ে আছে তারা।

নবীনমামা হঠাৎ ধূমকেতুব মত উদয় হয় আজ। সেইই সাবিত্রীর টাকার খোঁজে দত্তবাবুর গদিতে গেছল। তার আশা সাবিত্রীদি যদি টাকাটা পায় হাজার কয়েক টাকাব শেয়ার কিনবে। তাব কিঞ্চিৎ কমিশনও মিলবে।

কিন্তু দত্তবাবুর গদিতে গিযে এসব খবব করতে ম্যানেজারই তখুনি সাবিত্রীদেবীর ফাইলটা আনিয়ে দেখেশুনে বলে—আপনি তাঁর কে হন?

নবীন বলে—উনি আমাব দিদি। উনিই পাঠালেন খবব নিতে। অনেক দিন হয়ে গেল টাকাটা পাননি, তাই জানতে এলাম ব্যাপারটা। যদি দয়া করে ব্যবস্থা কবে দেন ওটার খুব উপকার হয়।

ভদ্রলোক ফাইল দেখিয়ে দেন, ভাউচারে সই করেছে সুবীর তার মায়ের হয়ে। সই করে মায়েব প্রাপ্য সাত হাজার তিনশো বাইশ টাকা বুঝে নিয়ে এসেছে।

ভদ্রলোক বলেন—সব টাকা তাঁর ছেলেই নিয়ে গেছে সই করে প্রায় তিন মাস হয়ে গেল।

নবীনবাবু খবরটা নিয়ে বের হয়ে আসে।

সাবিত্রীর আজ টাকাটা খুবই দরকার।

নবীনের কথা শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। নবীন বলে—টাকাটা এমনি ফেলে রেখো না দিদি। এমন লাভজনক শেয়ারে নিদেন হাজার তিনেক টাকা খাটাও। তিন বছরে প্রায় দশ হাজার পাবে' টাকা তো পেয়ে গেছো, ফেলে রেখো না ঘরে।

সাবিত্রী নবীনের মুখে সুবীরের টাকাটা তুলে আনার খবর পেয়ে অবাক হয়। এতদিন হলো টাকাটা এনেছে তবু সুবীর তাকে একবার জানায়নি, টাকাও দেয়নি তাকে। আজ টাকার খুবই দরকার।

নবীন বলে—দিদি, কথাটা ভেবে দ্যাখো, আমি পরে কাল পরশু আসবো। শেয়ারটা কিনে ফ্যালো—

নবীন চলে যেতেই সাবিত্রী এবার ছেলেদের কাছে যাবার মনস্থ করে। বাড়িতে থাকলেও সাবিত্রী ছেলেদের সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা ছাড়া কথাই

বলে না। আর ছেলেরা তো মায়ের উপর ভাইয়ের উপর অবিচার করছে তারা তা জানে তাই তারাও সুবিধাটুকুই আদায় করে নেয় মায়ের কাছে, খবরাখবর নেবার দরকারও বোধ করে না।

সাবিত্রী সমীরাক নিয়েই যায় উপরে। তখন সুবীর অধীর বৌরা কিসের আলোচনায় মত্ত। মায়া এর মধ্যে কোথায় জায়গা দেখেছে তার বর্ণনাই দিচ্ছে। দক্ষিণে রাস্তা—পুবও খোলা।

হঠাৎ মূর্তিমান দুঃখিনীর মত সাবিত্রীদেবীকে ঢুকতে দেখে ওদের সেই আলোচনার ছন্দ কেটে যায়। সাবিত্রীও মলিন বেশে ওই পরিবেশে বেমানানই বোধ করে নিজেকে।

—কি ব্যাপার? রীনাই শুধোয়—এখানে?

অর্থাৎ ওদের যে এখানে আসারও অধিকার নাই সেই কথাটাই স্মরণ করাতে চায়। সমীর কি জবাব দিতে গিয়ে থামলো। মা ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে।

মা শোনায় সুবীরকে—সমীরের সারা বছরের স্কুলের মাইনে অন্য সব ফি বাকী, সাড়ে তিনশো টাকা কালই না দিলে ও পরীক্ষা দিতে পারবে না।

রীনাই হিসাবটা করে—শুধু ওই ফিজই নয়, তারপর ক্লাশে উঠলে তখন সেশন ফি, মাইনে, বইপত্র কেনার টাকা এসবও লাগবে।

সাবিত্রী বলে—তা তো লাগবেই বাছা। যদি টাকাটা তোরা দিস—ওর পড়াটা হয়।

সুবীর কিছু বলার আগেই রীনা বলে ওঠে—টাকা!

অর্থাৎ ওই আজব বস্তুটাকে যেন সে চেনেই না। শেষে দম নিয়ে বলে—টাকা কোথায় এখুনি পাবো মা? ওর ব্যবসাও খুব মন্দা চলেছে। মালপত্র কিনেছে পড়ে আছে। সব টাকা ওতেই আটকে গেছে, তার ওপর সংসারের খরচাও তো আছে। আজকালকার বাজারে শুধু খেতেই কত যায় বলুন? সব ওতেই চলে যায়।

সুবীর এবার ধুয়ো ধরে—সত্যি মা টাকা নাই। আগে বললে এখান ওখান থেকে চেষ্টা করতাম।

তারপরই সুবীর দায়টা অধীরের উপরই চালান করে—কিরে অধীর, তোর কাছে আছে? থাকলে দে, ওর পরীক্ষা আটকে যাবে। আমি তো নিঃস্ব।

অধীর কিছু বলার আগেই মায়া গেয়ে ওঠে—মা, একটা জায়গা কেনার জন্য বায়নাপত্র করেছি, এখন ওই সময়ের মধ্যে বাকী টাকা কি করে দেব তাই ভাবছি! এসময় আমাদের পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

অধীরও বলে—সত্যি মা, থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম।

সমীর শুনছে ওদের কথা। বেশ বুঝেছে সে টাকা দাদা বৌদিরা কেউ দেবে না। বরং ওরা বুঝিয়ে দিতে চায় মা আর সমীর দুজনকে থাকতে খেতে দিচ্ছে এই ঢের। এর বেশী কিছুর প্রত্যাশা যেন ওরা না করে।

থাকা বলতে ওই সিঁড়ির নিচে পড়ে থাকা—গাময় আরশোলা ছোটে, পিঁপড়ে লাগে। আর ভ্যাপসা গরম। খাওয়া বলতে ভাত, জলো ডাল সঙ্গে ঘ্যাট। ডাল সবদিন জোটে না।

সাবিত্রীও শুনেছে ওদের কথাগুলো। বলে সে—সুবী, অধীর। তোর বাবা ওই মাইনেতে তোদের দুজনকেও পড়িয়েছে, মায়া তুমি তো জানো?

সেই মায়া এখন বদলে গেছে। তাই মায়া বলে—তখন দিনকাল ছিল সস্তার। আর ওই অন্ধকার গুদাম ঘরে পড়ে থেকে কত কষ্টে যে ওরা পড়েছে তাও জানি।

সাবিত্রী বলে—তার চেয়ে আরামে আজ তোমরা আছ, থাকো। ঈশ্বর তোমাদের আরও আরামে রাখুন। কিন্তু বাছা, সমী কি সেদিনের ওদের চেয়ে আজ কিছু ভালো আছে?

ওরা কেউ জবাব দেয় না! মায়া চুপ করে থাকে। জানে তারা এই সংসারে ওই দুটি প্রাণী কি ভাবে আছে।

সাবিত্রী বলে—ও নিয়ে কোন কথাই বলছি না। ওর অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে ও একদিন আরামে থাকবে। এখন তোরা যদি এটুকু না দিস কি হবে ওর?

রীনা বলে—আমরা কি করবো মা? এখন টাকা নেই। আর বাবা তো টাকাও কিছু রেখে যাননি যে তার থেকে দেব।

এবার সাবিত্রী বলে—হ্যাঁ মা, উনি সাড়ে সাত হাজার টাকা রেখে গেছলেন কোম্পানীর ঘরে।

সুবীর বলে—সে তো অথৈ জলে—

সাবিত্রী বলে - না বাবা, আজ থেকে দুমাস আগেই সেই সব টাকা তুই কোম্পানীর ঘর থেকে সই করে এনেছিস। আমাকেও একবার জানাসনি সেই টাকার কথা, দিসও নি।

এবার চমকে ওঠে সুবীর।

—না, মানে—

সাবিত্রী বলে—নবীন নিজে কোম্পানীর ঘর থেকে দেখে এসেছে।

সমীর দেখছে বড়দা-বড়বৌদিকে। ক্ষণিকের জন্য ওদের মুখটা কেমন ধরাপড়া চোরের মত বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এবার মায়াই ফুঁসে ওঠে—বড়দি, পুরো টাকাটা একাই হজম করলে?

অধীরও ধুয়ো ধরে—এ তোমার খুবই অন্যায় বড়দা, আমাদের একবার জানালে না? ও টাকাটায় আমাদের কি দাবী নেই?

রীনা বলে—সংসারে কত দাও? দুজনে তো হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়াও, কি করে সংসার চলে জানো?

মায়ার কণ্ঠস্বরও চড়ে ওঠে—আমরাও টাকা দিই, মাগনা খাই না।

—কত দাও? রীনা গর্জে ওঠে।

সমীর দেখছে ওদের বাদানুবাদ।

সাবিত্রী অধীরকে বলে—অধীর, মিথ্যাই লেখাপড়া শিখলি ; ভেবেছিলাম এত পড়ে মান হুঁশ তোর হবে। একেবারে অমানুষ হয়ে গেলি। যার টাকার খুবই দরকার তাকে বঞ্চিত করে তুইও কেন পাসনি তাই নিয়ে ঝগড়া শুরু করলি ? সুবীর-বৌমা অনেক হয়েছে। এবার থামো বাছা।

বের হয়ে আসে সাবিত্রী।

সেই রাতে তখনও উপরের ঘরে উত্তপ্ত আলোচনা চলেছে। ওরা কেউ খেতেও আসে না। সাবিত্রী ডেকেও সাড়া পায় না। মায়া বলে—থাক। ওই ছাই আর খাবোই না।

সাবিত্রীরও খাওয়া হয় না। সমীর দুখানা রুটি নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ে। তখনও উপরের ঘরে ওদের বচসা চলেছে। ওই একটা বিষয় থেকে তখন অন্য বিষয়ের মতান্তরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

সাবিত্রী ভাবতে পারেনি যে সুবীর এভাবে তাদের ফিরিয়ে দেবে। সুবীরের ব্যবসা দাঁড় করাতে সাবিত্রীও তার গহনা যৎসামান্য যা ছিল তাও দিয়েছে। আজ সে নিঃস্ব।

সমীর রাতে ঘুমুতে পারে না। বার বার মনে হয় এবার কি করবে সে। স্কুলের পড়া আর হবে না। এবার তাকে যেভাবে হোক কিছু রোজগারই করতে হবে।

সকাল থেকেই সমীর বের হয়ে পড়ে আজ। আর স্কুলে যেতে হবে না। আনমনে চলেছে সে। গঙ্গার ধারে পোস্তার ঘাটে বসে আছে। হঠাৎ সেই পোস্তায় ন্যাপার সঙ্গে দেখা। ছেলেটা আলু পোস্তায় আলু রং করার কাজ করে। ন্যাপাই তাদের দলের সর্দার মত।

ন্যাপা বলে—কিরে এখন এখানে ? ইস্কুলে যাবি না ?

সমীরের দুচোখ ছলছল করে ওঠে। বলে সে—ইস্কুলের মাইনে দিতে পারিনি, তাই পরীক্ষায় বসতেও দেবে না। নাম কেটে দিয়েছে—পড়াও আর হবে না।

ন্যাপা অবাক হয়—তা বাড়ির লোক কি বলে বে ?

সমীর বলে—বাবা নাই, মা দাদাদের বললে, ওরা টাকা দিল না। বলে টাকাপয়সা নাই।

ন্যাপা বিজ্ঞের মত বলে—শালা দুনিয়াটা বেইমানের ভিড়ে ভরে গেছে। নিজেরা ষোল আনা নেবে আর তুই চাইলেই—নাই। এই দুনিয়ায় চাইতে নাই বে, লড়াই করে হক্ ছিনিয়ে নিতে হয়।

ন্যাপা পাশেই বসে সমীরের। ন্যাপা ওকে দেখে, সমীরের চোখে জল। ন্যাপা বলে—কাঁদিস না। চোখের জলের কোন দামই কোনও শালা দেয় না। ওসব ফালতু চীজ বে।

সমীর বলে—মায়ের জন্য কষ্ট হয় রে।

ন্যাপা চিনেবাদাম খাচ্ছিল, ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে বলে—নে। তোর এই

দুনিয়ায় তবু মা আছে। আমার—শালা কেউ নাই। একুল ওকুল দুকুলই সাফ। তা কি করবি এখন? পড়ার পাট তো চুকেই গেছে। কাজে নেমে পড়। মরদ ব্যাটা ছেলে বসে থাকবি কেন?

—কাজ! সমীরের কাজের খুবই দরকার।

ন্যাপা বলে—চলো মহাজনের কাছে। ন্যাপার দোস্ত তুই, তোর কাজ হবে না আলু পোস্তায়? আলবৎ হবে।

এতদিন সমীর বাইরে থেকেই ব্যাপারটা দেখেছিল। এখন কাছে গিয়ে দেখে। পোস্তার একটা বিরাট অংশ জুড়ে স্রেফ আলুর ব্যবসা চলে। ট্রাক বন্দী আলু আসছে বারোমাস। বাইরের হিমঘরে ওসব আলু রাখা হয়। দরকার মত মাল বের করে মহাজনরা আলু আনে বাজারে বিক্রীর জন্য।

সেগুলো বিবর্ণ, কালচে—তার মধ্যে পচাও কিছু থাকে। এখানে এক একটা উঠানে রাশ করে ওসব বিবর্ণ আলুর স্তূপ। বাজারে পাঠালে ওই আলু খরিদ্দার নেবে না। তাই ওগুলোকে এখানে আবার রং করা হয়। মেরামত করে বাজারে ছাড়া হয়। তার জন্য পল্লীগ্রামের বিশেষ অঞ্চল থেকে ট্রাক বোঝাই মাটি আসে। তাকে পেষাই করে ধুলো বানানো হয়। ওই সব আলুতে ওই মাটি মাখায় অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ঝড়তি পড়তি আলুও কিছু পায় তারা, এছাড়া মজুরী বস্তা পিছু তিন টাকা। মহাজনের সরকার দেখে নেয় ঠিক মত রং করা হচ্ছে কিনা, তবেই মজুরী মিলবে।

ন্যাপা ওকে সরকারের কাছে আনে। সরকারের চোখে নিকেলের চশমা, শীর্ণ চেহারা। নাকটা খাঁড়ার মত, আর চোখ দুটো যেন সব সময় বনবনিয়ে এদিক ওদিকে ঘুরছে।

ন্যাপা বলে—এও কাজ করবে এখানে সরকার মশাই।

সরকার চশমার ফাঁক দিয়ে সমীরকে আগাপাশতলা জরিপ করে শুধোয় —এ মালটাকে কোথায় পেলি রে? মনে হচ্ছে ভদ্দর ঘরের ছেলে? টিকবে তো?

ন্যাপা বলে—এককালে ছিল সবই, এখন ভোঁ কাট্টা ঘুড়ি। শালা যাবে কোথায়? গোঁৎ খেয়ে এখানেই লটকেছে গো!

—পারবে তো?

ন্যাপা বলে জামার কলার তুলে—আমি আছি না? ওর ঘাড় পারবে।

সরকার মশাই বলে—তাহলে লেগে পড়। অনেক মাল এসেছে গুদামে। ঝটপট কাজ করতে হবে।

সমীরও এবার কাজে নেমে পড়ে। ন্যাপাই ওকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে জলে চুবিয়ে তুলে নিয়ে ওই ধুলো আলুতে মাখাতে হবে। কাজটা কঠিন কিছুই নয়, তবে এক নাগাড়ে বসে থেকে মাজা কোমর টনটন করে ওঠে।

অন্য অনেকেই ওই কাজ করছে। সমীরও করতে থাকে। সকাল দশটা থেকে দুপুর অবধি আজ করার পর সকলের আধঘণ্টাটাক ছুটি। দেখে সমীর ওরা ঝুলির মধ্যে অনেকে কাগজে মুড়ে দু' চারখানা রুটি এনেছে, সঙ্গে তরকারী

কিছুই নাই, একটা কাঁচালংকা। তরকারী কেনার মত অবস্থা তাদের নয়। পোস্তার গাদা থেকে দু' চারটে আধপচা বাতিল পেঁয়াজ যোগাড় করে তারা। ওসব পেঁয়াজ মহাজনরা বাতিল করে দেয়। বাইরেটা পচা, খোলা ছাড়ালে ভিতরে কিছুটা ঠিকই থাকে। ওই পিঁয়াজ কামড়ে রুটিই তাদের আহার।

সমীরের তাও জোটে না।

সে খাবারও আনেনি, পয়সাও নাই। এতক্ষণ বসে বসে কাজ করে খিদেও পেয়েছে। খিদের জ্বালাটা যে কত তীব্র সেটা এবার বুঝতে পারে সমীর।

ওদিকে একটা লোক কাঠের ভাঙ্গাবাক্স তালপাতার বাতিল প্যাকেটের অংশ এসবে আগুন ধরিয়ে ভুট্টা সেঁকছে। ঠেলাওয়ালারা ওই আধপোড়া ভুট্টাতে নুন একটু লেবুর টুকরো, সেটাতে রস আর নাই, তাই ঘষে চিবুতে চিবুতে ঠ্যালায় মাল তুলছে।

অবশ্য ফুটপাথে ছাতুর দোকানও আছে। বেতের ধামায় ছাতু নিয়ে বসেছে ছাতুওয়ালা। তার নিজেরই কয়েকটা কানাউঁচু থালাও রয়েছে। খদ্দের এলে ওজন করে ছাতু দেয়, সঙ্গে কাঁচালংকা একটা, এক টুকরো আম বা তেঁতুলের খাট্টা। খরিদ্দার ওই থালায় ছাতু নিয়ে লোটার জল দিয়ে মেখে একটা তাল পাকিয়ে বসে গেল। ওই তাদের দুপুরের খাবার।

সমীরের তাও জোটে না। কলের জল খেয়ে এদিকে ওদিকে ঘুরছে। দেখে দালালদের ব্যস্ততা, এ গদি সে গদিতে ঘুরে মালের দর নিয়ে কেনা বেচার কাজ চলছে। ওরই মধ্যে দু' একটা গরু শুয়ে জাবর কাটছে নিশ্চিন্তে।

আবার কিছুক্ষণ পরে ওরা কাজে বসে।

দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামে। এবার ওরাও কাজ শেষ করে, প্রথমদিনই তার রোজগার হলো নগদ তিন টাকা। জীবনে এই প্রথম নিজের রোজগার।

টাকাটা হাতে নিয়ে কি আনন্দ! সে তার খিদে তেষ্টাও যেন ভুলে যায়।

ছেলেটা সারাদিন বাড়ি ফেরেনি। সাবিত্রী ভাবছে। অবশ্য এ বাড়িতে ওই সমীরের জন্য ভাবে, আর কেউ ভাবে না, ভাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। এ বাড়ির মানুষগুলোর কাছে সে একটা ফালতু জীবই। তার খবর রাখার দরকার অন্য কারো নেই।

বড়বাবু সুবীর সকালেই বের হয়ে যায় জলখাবার খেয়ে। রীনার উঠতে দেরী হয়। ভোর থেকে সাবিত্রী উঠে বাসন মেজে ঘর মুছে নেয়। তারপর চা করে ছেলেদের ঘরে ঘরে পেঁছে দেয়।

সেই রাতে রাবাব টাকা ওইভাবে আত্মসাৎ করার ব্যাপার নিয়ে অধীর সুবীরের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা, কথা কাটাকাটিই হয়। রীনাও চুপ করে থাকেনি, সেও বেশ বলিয়ে কহিয়ে মেয়ে। আর বেশ পাটোয়ারী বুদ্ধি ধরে। সেও অধীর-মায়াকে বেশ মিঠেকড়া ডোজ দিয়েছে। ফলে অধীর-মায়াও এবার দাদা বৌদির উপর চটে গেছে। তাদের আগেকার সেই গলাগলি ভাব আর নাই। এক দিনেই সব ভালোবাসা উবে গেছে তাদের।

অধীর যদিও দু' একটা কথা বলে দাদার সঙ্গে দায়সারা করে, মায়া রীনার সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

তাদের যেন এই বাড়ির উপর কোন দায়ই নাই। ওদের নিজেরা সংসারে টাকা দেয়—আর সেটা ষোল আনা তারা উশুল করে নেয়।

সাবিত্রী নিজের আর সমীরের কোনমতে বেঁচে থাকার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে। ভরপেট খাওয়াও তাদের জোটে না। চারখানার বেশী রুটিও পায় না সমীর, আর সাবিত্রীর জন্য রাতে বরাদ্দ চাট্টি মুড়ি ও দিনে এক মুঠো ভাত।

ওদের লুচি, পরোটা, ওমলেট, টোস্ট, কলা, ভাতের সঙ্গে ভাজা ডাল দুপদ তরকারী, মাছ সবই বড়বৌ, মেজবৌ মায়া যে যার ঘরে নিয়ে চলে যায়। এদের জন্য শেষ আঁচে চাপে মোটা রেশনের চালের অখাদ্য ভাত—তাতে দু' চারটে আলু ঢেঁড়স উচ্ছে সেদ্ধ, ডাল সবদিন জোটে না।

সাবিত্রী সংসারের পাট চুকিয়ে স্নান সেরে নেয়, পুজো—ওসব করার সময়ও জোটে না। ভোরে গঙ্গাস্নান করার সময় তখনই ঠাকুরকে ডাকে—তারপর আর সময় নাই তার।

দুপুরে খাবার আগে একবার স্নান করে।

ততক্ষণে সমীরও এসে পড়ে স্কুলে না গেলে। আজ এখনও ফেরেনি। ছেলেটার দেখা নাই, এত বেলা হয়ে গেল তার পাত্তাও নাই। খেতেও পারে না নিজে সাবিত্রী।

বেলা বাড়ছে, সাবিত্রীর ভাবনাও বাড়ে। কি হল ছেলেটার? কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো!

সুবীর দুপুরে খেতে আসে। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার বের হয় সে।

তখনও প্রায় তিনটে বাজে। সাবিত্রী তখনও খেতে পারেনি। রেশনের চালের আতপের ভাত আবার চালেই পরিণত হয়েছে। কড়কড় করে।

মা ঘর বার করছে ছেলের জন্য।

সুবীর বের হচ্ছে দেখে বলে সাবিত্রী—সমী তখন থেকে ফেরেনি। ওরে—একটু খবর নে বাবা!

সুবীর বলে—আছে কোথাও! আড্ডা মারছে। এসে পড়বে। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তোমার ছোটকুমার ঠিকই আসবে খিদে পেলে। যাবার তো আর কোনও চুলো নেই।

সুবীর মাকে জবাব দিয়ে রীনার উদ্দেশ্যে বলে—চলি। গটগট করে বের হয়ে যায়।

সাবিত্রী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কি হল ছেলেটার? গাড়িটাড়ি চাপা পড়েনি তো? নিজেই বাইরে এসে দাঁড়ায়, খিদে তেষ্টা ভুলে গেছে সাবিত্রী। তার ভয় হয়—ছেলেটার পড়ার পরীক্ষার টাকা দিতে পারেনি।

সমীকে চেনে সে। মুখ বুজে থাকে। কোন কথাই বিশেষ বলে না। তবে

ওর মনে একটা জেদ আছে। কঠিন জেদ।

সেই জেদের বশে কিছু করে বসেনি তো?

আজ তার জন্য ভাবারও কেউ নাই এক মা ছাড়া? সাবিত্রীও জানে ওই ছেলেটাই তার জন্য ভাবে। ওই সাবিত্রীর নিঃস্ব জীবনের একমাত্র সম্বল।

বৈকাল নামছে। পার্কে স্কুলফেরত ছেলের দল হৈ চৈ, খেলাধুলো করছে। পরনে ওদের ফর্সা জামা-প্যান্ট। মুখে চোখে স্বাচ্ছল্যের চিহ্ন। সমীকে ওদের মধ্যে পায় না।

সাবিত্রী বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ব্যাকুল চাহনি মেলে, হঠাৎ দেখে সমীর ফিরছে। পরণের প্যান্টে ধুলোর দাগ। মুখটা শুকনো। হাতে একটা ঠোঙ্গা।

সাবিত্রী এগিয়ে আসে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ হতভাগা ছেলে? ওরা তো যা করার করছে, তুইও কি আমার হাড়মাস জ্বালিয়ে খাবি?

সমীর চাইল মায়ের দিকে।

বলে সে—মা। আমার জন্য তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না কোনদিন।

—কোথায় ছিলি সারাদিন?

সমীর বলে—চলো, সব বলছি। এটা রাখো!

দেখে সাবিত্রী একটা ছোট প্যাকেটে চারটে মিষ্টি।

—কোথায় পেলি?

সমীর বলে—বলছি। খুব খিদে পেয়েছে। চান করে আসছি—ভাতটাত আছে?

মা বলে—আমিও খাইনি রে। ভাবছি তোর জন্যে—

সমীর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে—উঃ! তোমাকে বলে যাইনি। না খেয়ে আছো তুমিও? চান করে আসছি।

…তখন সন্ধ্যা নামছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সমীর স্নান করে খেতে বসে। কড়কড়ে আতপচালের ভাত আর আলুপটল সেদ্ধ। তাই যেন ক্ষুধার সময় অমৃত মনে হয়। এ যেন অন্নগত প্রাণ। চাট্টি অন্নের জন্যই তাই লড়াই করতে হয় মানুষকে আর এই সর্বহারা শিশুও জীবনের সব আশা স্বপ্ন ভবিষ্যৎকে বিসর্জন দিয়ে ওই অন্নসংগ্রহের লড়াই-এ সামিল হয়েছে।

সাবিত্রীও যা কিছু মুখে দিল।

রীনা নেমে আসছিল, ওদের অসময়ে খেতে দেখে এদের শুনিয়েই বলে—দিনে তিনবার করে ভাত খেলে যে ফতুর হতে হবে। দু'জনের তিনবার খেতে কত লাগে তার হিসাব আছে?

সাবিত্রী কথাটা শোনে। বলে সে—তোমাদের অন্ন একবেলাই খাই মা। আজ দুপুরে খেতে পারিনি—এই খাচ্ছি।

সমীর রাতে ওই সিঁড়ির তলায় শুয়ে মাকে বলে কথাটা—পড়াশোনা তো হলো না মা!

সাবিত্রীর চোখে জল আসে। সমীরের জন্য সে কিছুই করতে পারেনি।

সমীর বলে—ওর জন্য ভাবি না মা। একটা কাজ পেয়ে গেছি। সমীর আসল কাজের কথাটা বলতে পারে না। মাকে বলে—এখন জলপানি আর তিন টাকা রোজ দেবে। কাজ শিখলে মাইনে বাড়বে।

সাবিত্রী দেখছে সমীরকে। কি এমন বয়স ওর। এখন ওর স্কুলে যাবার, খেলাধুলো করার বয়স। সাবিত্রী আশা করেছিল সমীর অন্তত বি. এ.-টা পাশ করে কোন একটা কাজকর্ম করবে। মোটামুটি ভদ্রভাবে বাঁচতে পারবে। এ বাজারে ক্লাশ নাইন অবধি বিদ্যের কোন দামই নাই। কুলি মজুর ছাড়া ওই বিদ্যেতে কিছু করা যাবে না।

সাবিত্রী বলে—ওই বিদ্যে নিয়ে কি কাজ করবি তুই ?

সমীর বলে—মা! তোমার আশীর্বাদ থাকলে এই বিদ্যেতেই আমি অনেক কিছু করতে পারবো মা। তোমার অন্য ছেলেদের চেয়েও—অনেকের চেয়েও অনেক কিছু বেশী করতে পারবো।

সাবিত্রী ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বলে—আমার কি পুণ্যফল আছে জানিনা বাবা, যদি কণামাত্র পুণ্য থাকে তাই দিয়েই তোকে আশীর্বাদ করছি তুই জীবনে বড় হবি বাবা, অনেক বড় হবি।

সমীরের মনে হয় মায়ের এই আশীর্বাদ যেন তার মনের সব হতাশাকে ধুয়ে মুছে দেয়।

সকালে ভাতে ভাত খেয়ে সমীর বের হয়ে পড়ে কাজে। একটা আধছেঁড়া ময়লা প্যান্টও আনে, সেটা পরে ওই উঠানে ইটের উপর বসে আলু রং করে। দিন ভোর, মাঝখানে খাবার ছুটি।

এখানে দেখেছে রাস্তাতে কুলিরাই কেউ উনুন নিয়ে রুটি বানায়। তাদের উনুনে দুচারটে আলুও পোড়াতে দেয়। ওই আলুপোড়া-পিঁয়াজ-লঙ্কা দিয়ে দুআনায় চারটে রুটি দিয়ে টিফিনও হয়ে যায়। আর রোজ তিন টাকা।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরছে, হঠাৎ নিমতলা স্ট্রীটের ওদিকে কোন এক ডাক্তারের চেম্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি রাখা—ডাক্তারবাবুর গাড়ি। একজন লোক ওকে দেখে চাইল।

সমীরের পরনে ময়লা প্যাণ্ট-গেঞ্জি, খালি পা। দিনভোর আলুর ধুলোয় কাজ করে গায়ে মাথায় ধুলো। গঙ্গাস্নান করেই ভালো প্যাণ্ট জামা পরে বাড়ি যাবে।

লোকটা বলে—এ্যাই—গাড়ি ধুতে পারবি ?

সমীর দেখছে গাড়িটা। এর আগে এ কাজ নিজে কখনও করেনি। কিন্তু অন্যদের করতে দেখেছে। নতুন গাড়িটার চাকায় ময়লা—ধুলোও লেগেছে বডিতে।

লোকটা বলে—গাড়ি ধুয়ে দে, এক টাকা পাবি।

এক টাকার দাম সমীরের কাছে কম নয়। বলে সমীর—পারবো।

—তাহলে ওই বালতিতে জল ধরে এনে মোছ। ভালো করে মুছতে পারলে রোজ এইসময় এসে গাড়ি ধুয়ে যাবি, এক টাকা নগদ পাবি রোজ।

সমীর গাড়ি ধুতে শুরু করে। আর সে জানে একাজ ঠিকমত করতে পারলে এখানেও আধঘণ্টা খেটে এক টাকা পাবে। তাই নিখুঁত ভাবে ধুয়ে, সারা গাড়ি মুছে ঝকঝকে করে তুলতে এবার সেই ড্রাইভারসাহেব গাড়ি দেখে খুশী হয়ে বলে—না! বেশ ধুয়েছিস।

একটা টাকা পুরো দিয়ে বলে—কাল আসবি তো?

সমীর দেখেছে পনেরো বিশ মিনিট কাজ করে একটা টাকা পাওয়ার কাজটা তার কাছে লোভনীয়ই। সে বলে—রোজই আসবো।

—হ্যাঁ। ঠিক বৈকাল পাঁচটায় ডাক্তারবাবু এখানে আসেন গাড়ি নিয়ে, তুইও এসে গাড়ি ধুয়ে যাবি।

সমীর আজ দমকা রোজগারে খুশী হয়। তাকে রোজগারের একটা ভালো পথই বের করতে হবে।

কথাটা এবার গভীরভাবে ভাবছে ওই অধীর আর মায়া। অধীর প্রথম থেকেই আত্মকেন্দ্রিক। দেখেছে যা করেছে সে তা নিজের চেষ্টাতেই করেছে। বাবা মায়ের উপর তার অনেক আশা ছিল। কিন্তু তারা যে তার জন্য কিছু করেনি এটা সেও বুঝেছিল আর সেই ব্যাপারে ইন্ধন যুগিয়েছিল মল্লিকা—মায়া ওরা সবাই।

মায়াও এখন নিজে কোন ইস্কুলে শিক্ষিকা। মাসে ভালোই মাইনে পায়। অধীরও দক্ষিণের কোন কলেজে অধ্যাপনা করে। মায়াই বলে—এদিকে এলে ভালো টুইশানি মিলবে। স্কুলের ছাত্রীরা সেই স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছেই পড়তে চায়। তোমার কলেজও এদিকে। তুমিও কলেজের ছাত্রদের কোচিং করাতে পারবে ভালো টাকায়।

অধীরও ভেবেছে কথাটা। সেও দেখেছে তার সহকর্মীদের অনেকেই কোচিং করে কলেজের মাইনের দ্বিগুণ রোজগার করে। তাই তাদেরও দক্ষিণ কলকাতার দিকে আসা দরকার।

সেই ভাবনা নিয়েই বালিগঞ্জের লাগোয়া অঞ্চলে দুকাঠা জমিও কিনেছিল। এর মধ্যে তাদেরও হাতে কিছু জমেছে।

মল্লিকাও বলে—অধীর, ওই এঁদো পাড়ায় পুরোনো বাড়িতে পড়ে পড়ে সংসারের বোঝা বইছ কেন বাবা? নিজেরাই এবার যাহোক একটা ছোট বাড়ি করে চলে যাও। তবু নিজেদের মত করে থাকতে পারবে।

মায়া মায়ের কথায় বলে—ওকথা বার বার বলি মা। ও বলে—মা ভাইদের ফেলে এতদূরে চলে যাবো?

মল্লিকা বলে—বড়দাদা তো বাবার সবই নিয়েছে, আর মা ছোট ভাইয়ের বোঝা বইবে তুমি ওই ভাবে থেকে?

কথাটা এতদিন ভাবেনি তত গভীর ভাবে। এখন ভাবছে অধীর। কারণ বাবার ওই টাকাগুলো মেরে দিয়েও দাদা বৌদি তাদেরই উল্টে কথা শুনিয়েছে।

সেইই বলে—মা ভাইকে কে দেখে ?

রীনাও সায় দেয়—ওদের হ্যাপা কে সামলায় ? দুজনের খাওয়ার খরচা এই বাজারে কত তা বোঝো ? সবই আমাকে টানতে হয়। তাই ওই সামান্য টাকা রেখেছি কি দোষ করেছি ?

মায়া কি জবাব দিতে যায়, অধীরই থামায় ওকে—থামো মায়া। ওসব কথা থাক। যা হয় পরে করা যাবে।

মায়া চুপ করে গেলেও মনে মনে গজরাতে থাকে। আড়ালে স্বামীকে বলে—কি করবে তুমি ? তখন তো দাদা বৌদির সামনে খুব বললে ? কি করবে ?

অধীর যা করে ভেবে চিন্তেই করে।

অধীর বলে—ভাবছি এবাড়ি থেকে চলেই যাবো ?

—সত্যি ! মায়া যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

অধীর বলে—হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম এখানে এভাবে আর না থাকাই ভালো ! আমি ঢাকুরিয়ার ওদিকে একটা বাড়ি ভাড়া করছি—ওখান থেকেই নিজেদের বাড়ি করে নেব। তার জন্যই এখান থেকে যেতে হবে।

মায়াও খুশি হয়। বলে সে—তাই ভালো। এই নরক থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তোমার বড়ভাই-বড়গিন্নী ভাবে আমরাও যেন ওই মা ছোট ভাইয়ের মত ওর গলগ্রহ হয়ে আছি।

সাবিত্রীদেবী সেদিন ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়। কদিন ঘনঘন মল্লিকা এ বাড়িতে আসা যাওয়া করছে। ওই সিঁড়ির নিচের দরজা দিয়েও আসে না। ওদিকের বসার ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকে মল্লিকা। ও যেন আজকের থানপরা বাসন মাজা সাবিত্রীকে চেনেই না। ওর সঙ্গে যে তার কোন সম্পর্ক আছে, চেনাজানা আছে এটা স্বীকার করতেও লজ্জা পায় মল্লিকা।

সেদিন সমীরও দেখে এটা। বলে সে—মাউই মা তোমার সঙ্গে কথা বলে না মা ?

সাবিত্রী বাসন মাজতে মাজতে বলে—কথা বললে যদি মানসম্মান ক্ষয়ে যায় তাই কয় না হয়তো।

সমীর বলে—খুব বড়লোকের গিন্নী, বড়লোকের শাশুড়ি তো—কেন এত ঘনঘন আসছে বলো তো ? দেখি দরজা বন্ধ করে মিটিংও হয় ওদের। বড়-বৌদির সঙ্গেও তো কথা বন্ধ !

সাবিত্রী বলে—জানি না বাবা। একধারে এঁটো পাতার মত পড়ে আছি কে আর কি বলছে বাবা ? যা করছে করুক।

সমীর আজ কাজে যায়নি। গুদাম আজ বন্ধ। তবু বৈকালে বের হয় ওই গাড়ি ধোয়ার কাজে।

সাবিত্রী পরে সন্ধ্যায় কথাটা শোনে। অধীরই বলে—মা, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

সাবিত্রী চমকে ওঠে। সে এটা ভাবতেই পারেনি। সকলকে নিয়েই সে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। এতদিন এইভাবে ছিলও। আজ ছেলের চলে যাবার কথায় বলে—চলে যাবি এখান থেকে? কেন?

মায়া বলে—দাদা-বড়দির কথা শোনেননি তো? আপনাদের ঠকিয়ে টাকাটা নিজে মেরে দিলেন, বলতে গেলাম—তাই কত কথা শুনিয়ে দিল।

সাবিত্রী বলে—আমার টাকা নিয়েছে, তোমরা তাই চলে যাবে এখান থেকে? অধীর?

অধীর বলে—মা, ওরা ভাবে আমরা ওদের বোঝা হয়ে আছি। সংসারে আমরাও খরচা দিই। দিয়ে থুয়ে এসব সইব কেন? তাই চলে যাবো।

মায়া শোনায়—ও পি-এইচ-ডি করবে। এখানে পড়াশোনার তেমন জায়গা নাই। লোকজন আসতে চায় না এতদূরে। আর ওর কলেজ, আমার স্কুল যাতায়াতেরও অসুবিধা হচ্ছে এত দূর থেকে।

সাবিত্রী বলে—এতদিন হয়নি, আজ হলো অসুবিধাটা?

অধীর বলে—সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছি মা। কাল সকালেই ট্রাক আসবে, আমাদের মালপত্র তুলে নিয়ে যাবো।

সাবিত্রী বলে—সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছিস তাহলে? অবশ্যি আমি তোদের মা তো নই। এঁটো পাতা হয়ে এক কোণে পড়ে আছি। তার মতামতের দাম কি বাবা। যা ভালো বুঝিস কর।

সাবিত্রীর চোখে জল নামে। ওরা বুঝবে না মায়ের এই ব্যথাটা। সাবিত্রী বলে—একালের শিক্ষা তোদের দয়া মায়া কর্তব্য সব ভুলিয়ে এক নতুন জীব করে তুলেছে। তোদের কাছে মায়ের চোখের জলেরও কোন দাম নাই। যা—যেখানে সুখে থাকিস থাক গে বাবা। তাতেই আমার শান্তি।

সাবিত্রী নেমে আসে।

মায়া ফোড়ন কাটে—আদিখ্যেতা কতো! দরদ উথলে উঠছে।

রীনাও ব্যাপারটা দেখেছে। সুবীরকে বলে সে—মেজবাবুরা তো বালিগঞ্জে চললেন। শাশুড়িও নাকি মেয়ের সংসার গোছাতে সেখানে যাচ্ছে শুনলাম।

সুবীর শুধোয়—মা! মা যাচ্ছে তাহলে ওর সঙ্গে?

রীনা বলে—তোমার মা গেলে তো বুঝতাম ঘাড়ের বোঝা নামলো আমার। উনি নন—মায়ার মা গেছেন আগেই।

সুবীর হতাশ হয়—তাই নাকি।

রীনা বলে—ওরা তো চললো, ওদের শুধোও—ওর মা ভাইয়ের বোঝা কি একা আমাদের,বইতে হবে ?

সাবিত্রী চা নিয়ে উঠছিল। সে শোনে রীনার কথাগুলো। মাথা ঝিমঝিম করে তার। মনে হয় এতবড় দুনিয়ায় তার যদি যাবার কোন ঠাঁই থাকতো সে সমীরের হাত ধরেই চলে যেতো সেখানে। কিন্তু এতবড় দুনিয়ায় তার যাবার কোন ঠাঁই নাই। তাই পড়ে থাকতেই হবে এখানে।

সরে আসে সাবিত্রী।

সমীর পরদিন দেখে মেজদার মালপত্র ট্রাকে উঠছে। মেজদার শ্যালক মদনও এসেছে। মালপত্র তুলে ট্রাক চলে যেতে এবার মেজদা-মেজবৌদি সেজে-গুজে নেমে আসে।

বড়দা আগেই কাজে বের হয়ে গেছে। রীনাকেই ঘরের চাবিটা দিয়ে মেজবৌদি বলে—চলি দিদি। অনেকদিন আপনাদের জ্বালিয়ে গেলাম।

মেজদা মাকে একটা দায়সারা প্রণাম করে বলে—আসি মা।

সাবিত্রী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে পড়ে কবে কোন অতীতে সব হারিয়ে ওদের কোলে পিঠে নিয়ে এদেশে এসে বাঁচার লড়াই শুরু করেছিল। সে লড়াই জিতে ওদের মানুষ করেছে। আজ ছেলেদের ঘর সংসার হয়েছে। নিজেরা যেভাবে হোক দাঁড়িয়েছে। ওরা জিতেছে, কিন্তু সাবিত্রীর মনে হয় সে হেরে গেছে। ছেলেদের এত কষ্টে মানুষ করে সে নিজে কি পেয়েছে তাদের কাছে ? পেয়েছে অবজ্ঞা অবহেলা।

কিন্তু মা সে। সে মায়ের কর্তব্যই করেছে। আর কেউ কিছু করলো না করলো তাতে তার কিছু যায় আসে না। সবিত্রী দেখছে অধীরকে। এতদিন পর সে চলে গেল মাকে ছেড়ে নিজের সংসারে, সেই সংসারে মায়ের কোন ঠাঁই নাই। গাড়িটা চলে গেল। সাবিত্রী কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

রীনা দেখে বলে ঝাঁঝালো কণ্ঠে—দরদ কত।

সেও মা হয়েছে। তারও একটা ছেলে মেয়ে হয়েছে। তবু মায়ের দুঃখটা সে অনুভবও করে না তিলমাত্র।

সমীর বলে মাকে—চোখের জল ফেলছ কেন মা ? দাদা তো নিজের বাড়িতে গেল। এখন বড়লোক হয়েছে। এ তো সুখের কথা।

সমীর দেখেছে দাদা চলে যাবার সময় তার দিকে একবার চায়ওনি। মেজবৌদি তো পরের মেয়ে। নিজের দাদাও তাকে এইভাবে অবহেলা করে গেল। যাক্ তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু মাকে এভাবে ফেলে রেখে গেল তাই রাগ হয় সমীরের।

বলে সমীর—কাদের জন্য চোখের জল ফেলছ মা। তারা তো তোমার কথা ভাবে না এতটুকুও।

সমীর ভাবে উপরের ঘরটা খালি হয়েছে, এবার বোধহয় তাদের এই সিঁড়ির নিচেকার এই জায়গা থেকে একটু ভালো আশ্রয় মিলবে। আলো বাতাস পাবে।

দেখে বড়বৌদি ওই ঘরে একটা খাট আনিয়েছে। আর সুবীরের ছেলে প্রবীর আর মেয়ে রঞ্জুকে ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এর মধ্যেই।

রীনাই বলে—একটা ঘরে গুঁতোগুঁতি করে থাকতে কষ্ট হয়। আর ওরাও বড় হচ্ছে, পড়াশোনা করতে হবে। তাই ওরা ওঘরেই থাকবে এখন থেকে।

অর্থাৎ সমীর ও মায়ের জন্য এই সিঁড়ির নিচেতেই থাকার ব্যবস্থা বহাল রইল।

প্রবীর এখন কেজি স্কুলে পড়ে। রঞ্জনাও। ওরা ইউনিফর্ম পরে সেজে-গুজে স্কুলের গাড়িতে চড়ে স্কুলে যায়। ইংরাজীতে ছড়া বলে।

স্কুলের মাইনে নাকি মাসে পঞ্চাশ টাকা পড়ে। টিফিনবক্স, ওয়াটারবটল-ড্রেস-জুতো এসবের খরচা তো আছেই। সমীর দেখে। তার স্কুলের মাইনে এর থেকে অনেক কমই, তবু সেই টাকাও এরা দেয়নি। আর জামা প্যান্ট? পুজোর সময় দুটো জামা প্যান্ট দিয়েছিল. আগেরকার দু'একটা ছিল তাই দিয়েই চলছে কোনমতে সমীরের। ওদের সাজের বাহার আলাদা।

সমীর অমন ধোয়া জামাপ্যান্ট চকচকে জুতো কখন পরেছে কিনা তা মনে নাই। বাবাকে তার অল্প মনে পড়ে। বাবা মারা যাবার পর থেকেই শুরু হয়েছে তার দুঃখের দিন।

তবু থামবে না সমীর। ন্যাপার কথা মনে পড়ে। ন্যাপা বলে—বাঁচবি তো লড়ে বাঁচবি। কারো ঘাড়ে চড়ে আরামসে বাঁচার কোন আনন্দই নাই, বুঝলি।

তাই সমীর লড়াই শুরু করেছে এখন থেকেই। সকালে উঠে সে কাজে বের হয়, ফেরে সেই সন্ধ্যায় গাড়ি ধুয়ে। এর মধ্যে আরও দুটো গাড়ি ধোয়ার কাজও পেয়েছে। ফলে এখানে নগদ কামাই হয় ডেলি তিন টাকা পোস্তার মজুরী ছাড়া।

পোস্তাতে সেদিন আলু রং করছে সমীর।

ওদিকে মালের ট্রাক এসেছে দু' তিনটে। বস্তার ওজন দেখে খাতায় লিখে তবে বস্তা গুদামে পুরতে হবে। একা সরকার মশাই সামলাতে পারে না। গাড়ি বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে রাস্তায় পুলিস জরিমানা করে দেবে। মহাজনও বকাবকি করবে।

সরকার মশাই শীর্ণ দেহ নিয়ে তুড়িলাফ খাচ্ছে—ডোবাবে শালারা আমাকে। এত মাল কে দেখবে, কে লিখবে ওসবের ওজন।

সমীর বলে—আমি লিখবো সরকার মশাই?

সরকার খিঁচিয়ে ওঠে—চোপ! পেটে কালির দাগ নাই—আলু রাঙ্গাছিস রাঙ্গা। ওজন লিখবে?

ন্যাপাই বলে—ওকে হেঁটা করো না সরকার মাশায়—ও রীতিমত হাইস্কুলে পড়েছে। আমাদের মত ফেকলু মহম্মদ লয়।

সরকার চাইল সমীরের দিকে।

শুধোয় সে—আমি ওজন হেঁকে গেলে লিখতে পারবি?

সমীর বলে—হ্যাঁ। বলেন তো দেখি—

সরকার খাতা পেন্সিল দিয়ে হাঁক পাড়ে—আঠান্ন কেজি তিনশো—, সাড়ে বাষট্টি কেজি—, ষাট কেজি।

সমীর লিখে চলেছে তরতর করে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ অনেক এগিয়ে যায়। বাকী ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব মাল গুদামজাত করে মালের টোটাল দিয়ে চালান মিলিয়ে দেয় সমীর সরকার মশায়কে।

সরকার মশাই তো অবাক!

ন্যাপা বলে—কি বলিনি সরকার মশাই, ও আমাদের মত ফেকলু মহম্মদ লয়! কথাটা সত্যি কিনা দেখলে তো?

—তাই তো রে। তুই ইংরাজীও জানিস?

সরকার মশাই-এর কথায় সমীর বলে—এক আধটু জানি। ক্লাশ নাইন অবধি পড়েছি।

—বলিস কি রে? আর পড়লি না কেন?

ন্যাপা বলে—সে অনেক কিচাইন কেস গো।

সরকার মশাই সেদিন ওকে নগদ পাঁচ টাকা বকশিসও দেয়। বলে—তুই আয় আড়তে, দেখি ঘোষমশায়কে বলে তোকে যদি তাগাদার কাজে, খাতা লেখার কাজে লাগাতে পারি।

সমীর যেন আশার আলো দ্যাখে, নগদ আট টাকা এখানে আর গাড়ি ধুয়ে তিন টাকা—কুল্যে এগারো টাকা ওর রোজগার। এই রোজগারের টাকাটা সে মায়ের হাতেই দেয়।

সাবিত্রী বলে—আমার টাকায় কি হবে রে?

সমীর বলে—রাতে এক পো করে দুধ খাও মা। কিছুই তো খাও না। শরীর কত খারাপ হয়েছে তোমার জানো?

—না রে! আমি তো ভালোই আছি। তোর জামা প্যান্ট জুতো কিছুই নাই। কাজ করতে যাস পাঁচজনের সঙ্গে, জামা প্যান্টই কেন বাবা দু' একটা।

সমীর বলতে পারে না মাকে যে ওখানে যাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের অবস্থা কত সঙ্গিন। পরনে প্যান্ট জামার অবস্থাও তার থেকে শোচনীয়। নিজের জীবনের সেই চরম লড়াই-এর কথা সে মাকেও জানাতে পারে না।

বলে সমীর—ওটা রাখো তো, বাবুগিরিতে কাজ নাই। এই বেশ আছি। দরকার হলে তখন কিনবো।

সমীরের মনে হয় কিছু টাকা জমাতে পারলে সে কোন ব্যবসা করবে। তাই মূলধন সংগ্রহ করার জন্য এই কাজই করতে হবে।

সুবীর এখন দুটো দোকান নিয়ে ব্যস্ত। কর্মচারীও রাখতে হয়েছে। আর ছেলেমেয়েদের জন্যও খরচ বাড়ছে। এর মধ্যে রীনার বোন বীণা মাঝে মাঝে আসে।

সমীরের সঙ্গে দেখা তার বিশেষ হয় না। সমীর এখন আলুর গুদামে আলু রং করা ছেড়ে সরকারের সহকারীর কাজই করে। ভোরেই বের হতে হয় তাকে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে, সেখানে অনেক মহাজন এদের আড়ত থেকে আলু নিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকে বিলটি দিয়ে টাকা আনতে হয় সমীরকে।

কাল বাজারে বাজারে ঘুরে বেলা বারোটা অবধি কেটে যায়। সেই টাকা এনে ফর্দমত সরকার মশাইকে বুঝিয়ে দিয়ে পরের দিনের তাগাদার ফর্দ, বিল নিয়ে বাড়ি ফিরতে বৈকাল গড়িয়ে যায়।

তারপর ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। দুপুরের খাওয়া জোটে তার বাড়িতে, মায়েরও করার কিছুই না। ভাত ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে যায়। মা বলে—কি এমন চাকরি রে? খেতেও পাস না সময়ে। হাসে সমীর।

সন্ধ্যার পর সে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে। তার স্কুলের বন্ধুবান্ধবরা এখন পাশ করে কলেজে পড়ছে। দু' একজনের সঙ্গে পথেঘাটে দেখাও হয়। তারাও কেমন দূরে সরে গেছে। সমীর যেন জীবনের পথে এক নিঃসঙ্গ পদাতিক। একাই লড়তে হবে তাকে এই বাঁচার লড়াই—এখানে তার সঙ্গী কেউ নাই।

সমীর সেদিন গঙ্গার ধারে বসে আছে। রাস্তার একফালি আলো এসে পড়েছে। ইদানীং ভাবছে সে নিজের কথা। এই দিনভোর পরের জন্য দৌড়াদৌড়ি না করে সে নিজেই কিছু যদি করতে পারতো ভালো হতো।

মাঝে মাঝে দমদম—বারাকপুর—বেলঘরিয়ার বাজারে সে তাগাদা করতে যায়। তার সঙ্গে ট্রেনে অন্য অনেক লাইনের সরকাররা তাগাদায় যায়। ট্রেনেই আলাপ হয় তার ভবদেববাবুর সঙ্গে।

লোকটা ফুকফুক করে বিড়ি খায়, আর বকবক করে বকে চলে। কোন বড় গেঞ্জি কারখানার সরকার। ওইসব জায়গার দোকানদারদের কাছে তাগাদায় যায়। ভবদেবই বলে—আলু বেচে কি হবে বাপ? এক কেজি বেচলে মহাজন লাভ করে চার পয়সা। আমাদের লাইনে এক পিস মাল বেচলে তোর লাভ থাকবে নিদেন একটা টাকা। গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া এসবের বাজার সব সময়েই। ভদ্রলোকের ব্যবসা। তা না তুই কিনা আলুওয়ালার ঘরে ঘুরে মরছিস পচা আলু ঘেঁটে।

কথাটা ভেবেছে সমীর। সেও ওর সঙ্গে নিজের কাজ সেরে গেঞ্জির বাজার দেখেছে। মালের চাহিদা আছে। আর আলুর মত পচে যায় না। দুচার-মাস পড়ে থাকলেও ক্ষতি হয় না মালের।

সমীর বলে—মাল কে দেবে আমাকে? মূলধন নাই—

—কিছু লাগাতে পারবি না? শ পাঁচেক টাকা—? দু'এক ক্ষেপ বিক্রী করে কোম্পানীকে টাকা ঠিক দিলে কোম্পানী বেশী মাল দেবে।

ভাবছে কথাটা সমীর। পাঁচশো টাকা সে পাবে কোথায়। গঙ্গার ধারে বসে আছে। রাস্তার এক ফালি আলো পড়েছে ওর মুখে। গঙ্গার বুকে চাঁদের আলোর বিস্তার।

এ যেন এক অন্য জগৎ। গঙ্গার হাওয়ায় শরীর জুড়োয়। তাদের সিঁড়ির নিচের খুপরিতে যদি এর কিছুটা হাওয়া ঢুকতো!

—সমীরদা না?

হঠাৎ কার ডাকে চাইল সমীর। সামনে বীণা। অবাক হয় সে।

—তুমি!

বীণা বলে—দুদিন দিদির কাছে এসেছি, তোমার দেখা নাই। আজ দেখি এখানে। বাড়িতে কখন থাকো?

সমীর বলে—পরের চাকরি করি, সময় পাই কই। তার পর নিজের একটা ছোটখাটো ব্যবসার চেষ্টাও করছি।

বীণা ওর পাশেই সহজভাবে বসে পড়ে গাছতলায় মাটির বেদীর ওপর। সমীর বলে—দামী শাড়িটায় ময়লা লাগবে যে।

—তুমি তো বসেছো।

সমীর বলে—আমার অভ্যাস আছে।

—ওটা রপ্ত করে নিই।

বীণা সহজভাবেই ওর পাশে বসেছে। এখন বীণার দেহে যেন ভরা গঙ্গার মত উছল যৌবনের ঢেউ। এলোমেলো বাতাসে ওর শাড়ির আঁচল, অবাধ্য চুলের কিছু উড়ছে।

বীণা বলে—কিসের ব্যবসা? জামাইবাবুর মত তামাকের ব্যবসা-ফ্যাবসা করবে না। গায়ে তামাকের বোটকা গন্ধ ছাড়ে।

হাসে সমীর—টাকা তো কম আসে না।

—আসুক। বুঝলে টাকাটাই দুনিয়ায় সব নয়। আরে বাবা, স্রেফ বাঁচার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু জুটলেই খুশী।

সমীর বলে—বাঁচার রকমের উপর সেটা নির্ভর করে।

বীণা—লোভ বেশী না করাই ভালো। মানুষের চাওয়ার তো শেষ নাই। তাতে দুঃখই বাড়ে। কম চাওয়াই ভালো, তাতে শান্তি মেলে।

—তোমার দিদিকে ওই কথা বলতে পারো?

বীণা বলে—তাই তো দিদির সঙ্গে আমার মেলে না। বুঝলে? দিদিটা খুব লোভী। জামাইবাবুকেও টাকা রোজগারের মেসিন বলেই মনে করে। খরচা হবে তাই বাড়িতে একটা কাজের লোকও রাখে না, সব ওই মাউই মাকেই করতে হয়। ওঁরও তো বয়স হয়েছে—একটু বিশ্রামের দরকার।

সমীর দেখছে বীণাকে। দুই বোন যেন দুই মেরুর ব্যবধান। বীণা তাদের কেউ নয়, অথচ তার চোখেও পড়েছে তার দিদির—সমীরের মায়ের উপর নীরব অত্যাচারের মাত্রাটার দিকে।

সমীর বলে—এসব কথা তোমার দিদিকে বলো না।

—কেন?

—কোনমতে ওদের দয়ায় টিকে আছি। তুমি এসব কথা বললে বৌদি ভাববে আমরাই তোমার কানে তুলেছি। এ নিয়ে অশান্তি হবে বীণা!

বীণা বলে—আমারও চোখ কান আছে সমীদা। সবই বুঝি। যাক্‌গে—কি ব্যবসা করছো বললে না ?

সমীর কি ভাবছে। বীণা শুধোয়—কি হলো ? বলবে না ?

ওই মেয়েটিকে যেন মন খুলে সব কথাই বলতে পারে সমীর। এই রাতের স্তব্ধতার মাঝে সমীরের নিঃসঙ্গ মন যেন মুখর হয়ে উঠতে চায় ওর সান্নিধ্যে। সমীর বলে—ভাবছি গেঞ্জির লাইনেই কাজ করবো। মহাজনের কাছে কিছু টাকা রাখতে পারলে ওরা আমায় মাল দেবে, বিক্রী হলে আসল তার—লাভ আমার। কিন্তু মূলধন কে দেবে ? নিদেন পক্ষে শ' পাঁচেক টাকা জমা রাখতে হবে।

বীণা কি ভাবছে।

সমীর বলে—চলো, রাত হয়েছে। ওঠো।

বেশী রাতে ওদিকে নৌকার মাঝি আর স্থানীয় কিছু সমাজবিরোধীদের মদ জুয়ার আসর বসে। এখন কলকাতার এই অঞ্চলেও সেই সব জীবদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে নৌকায় কিছু চোরাচালানের আনা-গোনাও হয়। তাই বেশী রাতে ওদিকে বড় একটা কেউ থাকে না সেইসব জীবরা ছাড়া।

ওরা ফিরছে। বীণা বলে—কালপরশুই ফিরে যাবো বাড়িতে। আমাদের বাড়ি তো চেনো। একদিন এসো না ?

সমীর দেখছে ওকে। বীণা এখন কোন কলেজে পড়ছে। ওর বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালোই। বাবা মারা যাবার পর দাদারাই ব্যবসাপত্র দেখে।

তারা বোনকে শান্তিতেই রেখেছে। কলেজে পড়াচ্ছে। সমীর বড়লোক আত্মীয়দের এড়িয়ে চলে। সে মল্লিকা-মদনদের ওখানেও যায় না। কারণ দেখেছে ওরা তাকে চিনতেই চায় না, সেখানে গেলে অখুশীই হয়। অবশ্য ওদের বাড়ি বিশেষ যায়নি সমীর।

বীণাকে দেখছে সমীর। বলল—দেখি, সময় পেলে যাবো একদিন।

বীণা বলে—ওসব বাজে কথা আমি পছন্দ করি না। তোমাকে যেতে বলা হয়েছে, তুমি যাবে ব্যস। সকালের দিকে বাড়িতে থাকি। এসো—বুঝলে।

কথাগুলো বলে বীণা এগিয়ে যায়। বলে—আমি আগে বাড়ি যাই, তারপর তুমি আসবে।

—কেন ?

বীণা হেসে বলে—নাহলে দিদিকে চেন না ? হাঁদারাম—

কথাগুলো বলে একটু হেসে এগিয়ে গেল বীণা। সমীর চমকে ওঠে। ওই কথাগুলো সে ভাবেনি। বীণা ভেবেছে। আর তাই তাদের এই মেলামেশার কথাটা কাউকে জানাতে চায় না। এ যেন একান্ত এক গোপন অনুভূতি যা তাদের দুজনেরই একান্ত আপন। এর মধ্যে কারো প্রবেশাধিকার নাই।

সমীরের সারা মনে যেন কি এক বিচিত্র সুর বেজে ওঠে। মনে হয় এই

দুনিয়া এত নিষ্ঠুর নয়। এখনও এখানে সুর আছে, ভালোবাসা আছে, বাঁচার আশ্বাস আছে।

পথ জনহীন হয়ে আসে। মন্দিরে পাঠ চুকে গেছে। বাড়ি ফিরছে ভক্তবৃন্দের দল। সমীরও বাড়ির পথ ধরে।

সাবিত্রীও দেখেছে বীণাকে। ওই মেয়েটি এ বাড়িতে এলে সাবিত্রীর কাছে আসে। বসে আনাজ কাটে। সাবিত্রী বলে—কলেজে পড়ো, এসব করার অভ্যাস নাই, হাত কাটবে।

বীণা বলে—অভ্যাস করা দরকার মাউই মা। মেয়েদের ঘরের সব কাজই শেখা দরকার।

সাবিত্রী দেখছে বীণাকে। ওই মেয়েটি যেন বোনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। কথাবার্তা ব্যবহার সবই আলাদা। নিজেই ও এসে রান্নাঘরে হাত লাগায়। চা জলখাবারে পরোটা করে সেই পরোটাও এনে দেয় সমীরকে।

সমীর অবাক—একি!

বীণা বলে—নিজে করলাম, দ্যাখো কেমন হয়েছে।

সমীর বলে—এসব তো আমার জন্য নয়, তোমার দিদি জানলে যে মুস্কিল হবে।

বীণা বলে—থাম তো, নাও খেয়ে নাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সাবিত্রীও দেখে ব্যাপারটা। আর দেখে রীনার ছেলে প্রবীরও। ছোট মেয়ে রঞ্জনা মাঝে মাঝে কাকার কাছে আসে। তবে রীনা ওদের এখানে আসতে দিতে চায় না। সে ওদের উপরেই রাখে। তবু রঞ্জনা ঠাক্‌মার কাছে চলে আসে। বলে—গপ্পো শোনাও না ঠাক্‌মা।

সন্ধ্যার পর রঞ্জনাকে কোনদিন সাবিত্রী গল্প শোনাতে বসে। কোন রাজপুত্তুর, তেপান্তরের মাঠ—নীল ঘোড়া আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

রঞ্জনার শিশুমনও যেন এক বিচিত্র জগতের সন্ধান পায়। রীনার কঠিন কণ্ঠস্বর ফুটে ওঠে উপরে।

—কি করছিস রঞ্জু? পড়াশোনা নাই? স্কুলের টাস্ক কখন হবে?

রঞ্জু কিছু বলার আগেই সাবিত্রী বলে—যা রঞ্জু!

রঞ্জু মাঝে মাঝে তবু নিচে আসে। কাকাকেও তার ভালো লাগে। সমীর ওর জন্য চকেলেট আনে—রঞ্জু সেটা এখানে বসেই খায়। মা জানলে খেতে দেবে না।

প্রবীর অনেকটা বাবার ধাতের। সে এই পরিবেশে আসে না। কাকাকে এড়িয়ে চলে। এখানের ময়লা পরিবেশ তার বিশ্রী লাগে।

কিন্তু দেখেছে সে মাসীমণি ছোটকাকে গরম পরোটা সন্দেশ দিচ্ছে। এমন খবরটা সে তার মাকে দিতে ভোলে না।

রীনার নজর চারিদিকে। তার কথাবার্তাও যেমন চাঁছা ছোলা, নজরও তেমনি সাফ। সে দেখেছে বীণা ইদানীং ঘনঘন আসছে এখানে। তার বোন

অবশ্য আসতেই পারে। কিন্তু এসে নিচে ওই বুড়ির কাছেই বেশী সময় কাটায়। সমীরের সঙ্গে গল্প করে। হাসির শব্দও শোনে রীনা। এগুলো ওর ভালো লাগে না।

বীণা নিজেই চা-জলখাবার করে, তার কারণটা আজ বুঝতে পারে রীনা। সমীরকেও খাওয়ানো হচ্ছে পাশে বসে।

রীনা উপর থেকে ডাক দেয়—বীণা, স্নান করবি না? বেলা হয়ে গেছে।

সমীর বলে—ওই যে শ্যামের বাঁশী বেজেছে, যাও উপরে, তোমার হবে।

বীণা বলে—আমি কাউকে ভয় করি না, বুঝলে? শোনো, আজ বৈকালেই চলে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু ও বাড়িতে যাবে। জরুরী কথা আছে। ব্যবসাপত্রের কাজে মন দাও, একদিন বড় কিছু হবে সমীর।

সমীর দেখছে ওকে। বীণা বলে—তোমাকে বড় হতে দেখলে আমিই খুশী হবো সমীর, খুউব খুশী হবো।

সমীরের মনেও নতুন উদ্যম জাগে। তাকে জীবনে কিছু করতেই হবে। আলুর গুদামের চাকরি থেকে এবার গেঞ্জির ব্যবসাতেই নামবে। সেই দালাল ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে—এক পিস বেচলে এক টাকা। হাতে করেই মাল নিয়ে যেতে পারবে দুশো টাকার। ষাট টাকার একবস্তা আলু বেচে লাভ তিন টাকা বড় জোর। তাও পচে যাবে।

কাজের ফাঁকে সেদিন সমীর গেঞ্জি কলের সেই ভবদেববাবুর ওখানে যায়। ভবদেববাবু দীর্ঘদিন এই লাইনে থেকে গেঞ্জি ব্যবসা—গেঞ্জি তৈরির নাড়ি নক্ষত্র জেনেছে।

ট্রেনে দেখা সমীরকে শেষ অবধি এখানে আসতে দেখে সেও অবাক হয়। ট্রেনে, লাইনে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। অনেকেই অনেক কথা বলে। ব্যবসার কথাও হয়, কিন্তু ট্রেনের কথা ট্রেনেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ ছেলেটি এতদূর এসেছে খোঁজখবর নিয়ে।

ভবদেববাবু ঘনঘন বিড়ি টানে। সমীরকে দেখে চোখ তুলে অবাক হয়।

—আরে তুমি?

সমীর বলে—এলাম। গেঞ্জির ব্যবসা করবো ভাবছিলাম।

এর মধ্যে ভাঁড়ে চাও এসে গেছে। ওদিকে একটা বড় শেডে বেশ কয়েকটা মেশিনে গেঞ্জি বোনা হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের। মেশিনের খট্‌খট্‌ খচ্‌খচ্‌ শব্দের মধ্যেই থাকতে ওরা অভ্যস্ত।

ভবদেব বলে—চা খাও। চলো, কেমন মালপত্র তৈরী হচ্ছে দ্যাখ। তারপর কথা হবে।

ভবদেবই ওকে কারখানা ঘুরিয়ে দেখায়। কয়েকটা মেশিনে গেঞ্জির থান পরানো আছে, তার থেকে সাইজমত মাল সেলাই হচ্ছে।

ভবদেব বলে—থানগুলোর রং এত সাদা থাকে না। এবেবারে

হালকা হলুদ রংয়ের হয়, তাকে আমরা ব্লিচ করিয়ে সাদা করে তবে গেঞ্জি বুনি।

ওদিকে সাইজমত গেঞ্জি চৌকা বাক্সে ডজন দরুণে প্যাকিং হচ্ছে। ওসব মালই দোকানে দোকানে সাপ্লাই করা হয় বিক্রীর জন্য।

ভবদেব বলে—আজ মালিক আসেননি। বাইরে কি কাজে গেছেন। তুমি দু তিন দিন পর এসো। আমি কথা বলে রাখবো। তোমাকে ভরসা হয়। তুমি পারবে। যত ঘুরতে পারবে দোকানে দোকানে—যত মাল বেচতে পারবে তত কমিশন পাবে। শ' পাঁচেক টাকা ডিপোজিট রাখতে হবে—সেইমত মাল দেব প্রথমে। ব্যবসা ভালো করতে পারলে বেশী টাকার মাল দেব তখন।

দেখে সমীর ওদিকের কাউণ্টার থেকে তার মত অনেক ছেলে মাল নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা গাঁট দরুণে মালও নেয়। দু চার গ্রোস মাল ওরা অনায়াসেই কাটায়। এই কোম্পানীর গেঞ্জির চাহিদাও আছে বাজারে।

মাসে খাটতে পারলে তিনচারশো টাকা লাভ থাকবে অনায়াসে। আলুর পোস্তায় তাগাদাদারের চাকরি করতে গিয়ে কম ঘুরতে হয় না। এত ঘুরেও পায় মাত্র পাঁচ টাকা আর দৈনিক আট আনা জলপান; এই ব্যবসাতে লাভ অনেক।

মাকে সমীর তার চাকরি বা ব্যবসা এসব বিষয়ে কিছুই বলে না। তার এতদিনের এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে রোজগার করা টাকায় মা হাত দেয়নি। সমীরই দিয়েছে দু'চার আনা—তাও মা দিয়েছে ভাগবৎ পাঠের পণ্ডিতকে প্রণামী হিসেবে। সাবিত্রীর পান-জর্দা খাওয়ার নেশাও নাই, খরচাও তার নাই।

মায়ের তোরঙ্গের মধ্যে একটা কৌটায় সব টাকাই সে রাখে। সব মিলিয়ে মোট তিনশো টাকার মত হয়, এখনও দুশো টাকা। এছাড়া এক মাসে তার নিজের যাতায়াত গাড়ি ভাড়া জলপানি বাবদ কমপক্ষে পঞ্চাশ টাকার দরকার। অর্থাৎ এখনও প্রায় শ'তিনেক টাকা তার লাগবে, তবে এই ব্যবসায়ে নামতে পারবে সমীর!

এত টাকা কোথায় পাবে। হঠাৎ হাতড়াতে হাতড়াতে সেই আংটিটা আঙ্গুলে ঠেকে। রঙীন কাগজে মোড়া সোনার আংটি। ওটা তার বাবার স্মৃতি। বাবা তাকে দিয়েছিলেন।

এটার কথা সে তখন ভুলেই গেছলো। নাহলে বাবার অসুখের সময় এটা বিক্রি করেও ওষুধপত্র আনতো। কিন্তু সেই খেয়াল হয়নি। আজ যেন ভাগ্যক্রমেই এটা তার হাতে ঠেকেছে।

সমীরের মনে আশার আলো জাগে। এটা বন্ধকই দেবে সে—কোনদিন টাকা হলে সুদ দিয়েও ছাড়াবে এটাকে। এবার আলুওয়ালা থেকে গেঞ্জি-ওয়ালাই হবে।

সোনার দোকানদার আংটিটা দেখে কষ্টিপাথরে ঘষে বলে—বিক্রি করবে।

এবার সমীরকে ওই ফাঁকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে সে। সোনা যাচাই করার পর সোনার জিনিস-বিক্রেতাকেও তারা এভাবে যাচাই করে।

সমীরকে দেখে ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। সমীর বলে—না। ওটা বাবার দেওয়া। তাঁর স্মৃতিই বলতে পারেন। ওটা বিক্রী করবো না, বন্ধক রাখবো। পরে ছাড়িয়ে নেব।

দোকানদার বলে—শ তিনেক বড় জোর দিতে পারি। তবে শয়ে পাঁচ টাকা মাসে।

সমীরের টাকার দরকার। বেশ জানে সে ওই টাকা একমাসেই তুলে নেবে। বলে—ঠিক আছে তাই দিন।

এবার দোকানদার লাল খেরো খাতা বের করে বলে—নাম, পিতার নাম? ঠিকানা?

সমীরের নাম পরিচয় লিখতে থাকে সে।

সুবীর নিজের ব্যবসাপত্র নিয়েই ব্যস্ত। ইদানীং তার ব্যবসাপত্র বেশ বেড়ে গেছে, সব জায়গায় নিজে যেতেও পারে না। ফলে দোকানের কর্মচারীও কিছু মাল এদিক ওদিক করছে।

সেটা বুঝতে পারলেও ধরতে ঠিক পারছে না, তাই বোকার মত লোকসান দিতে হচ্ছে। সে তার দোকানের মালের কোয়ালিটি ভালোই রাখতো। অন্য দোকানের তুলনায় লাভ কম হলেও খরিদ্দাররা তার তামাকই পছন্দ করতো। বেশ একটা সংখ্যায় বাঁধা খরিদ্দারও হয়েছে তার।

কিন্তু এবার তারাই কমপ্লেন করে—মালের কোয়ালিটি পড়ে যাচ্ছে বাবু। খদ্দেররা মাল সম্বন্ধে নানা কথা বলছে।

সুবীরও চটে ওঠে। বেশ বুঝেছে এসব করছে তারই কর্মচারীদের কেউ। ঠিক ভাগে মাল মেশাচ্ছে না। না হয় ভালো তামাক সরিয়ে ফেলে সেটা অন্য কোথাও বিক্রী করে দিচ্ছে আর দু নম্বর-তিন নম্বর মাল মেশাচ্ছে দোকানের মালে। সুবীরের মেজাজ বিগড়ে ওঠে এসব কথা ভেবে।

এদিকে বাড়িতে রীনাও ক্রমশঃ দেখছে সাবিত্রীর বয়স হচ্ছে। চোখেও কম দেখছে, ছানি পড়ছে। এমনিতে এখন শরীরও ভালো যাচ্ছে না। ওই বাসনপত্র নিয়ে সেদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হাত ফসকে বাসনগুলোই পড়ে যায় সশব্দে।

রীনা ঘুমুচ্ছিল, ওই শব্দে তার ঘুমও ভেঙ্গে যায়। সে বের হয়ে এসে দেখে একটা সৌখীন চিনা মাটির প্লেটই ভেঙ্গে গেছে।

সাবিত্রীও অপ্রস্তুত। বলে সে—পা পিছলে পড়তে পড়তে কোন রকমে বেঁচে গেছি মা।

রীনাও দেখছে ব্যাপারটা। বলে সে—তবু যদি দামী প্লেটটা বাঁচতো। শখ করে কিনেছিলাম সেটটা। একেবারে হাতে পায়ে লক্ষ্মী।

সাবিত্রী দেখছে ওকে। সে পড়লে হাত-পা ভাঙ্গতো নির্ঘাৎ, কোন মতে

সামলে নিয়েছে। সে বেঁচে গেছে তাতে রীনা খুশী নয়, তার যা হবার হোক —প্লেটটা বাঁচলে সে বেশী খুশী হতো।

রীনা বলে—আর আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না বুঝেছি। সেদিনও বাসন ভাঙ্গলো—রান্নায় নুনের বদলে চিনি পড়ছে, আজ জ্বর—কাল সর্দি-কাশি।

সাবিত্রী অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে। সে বৌয়ের অভিযোগ শুনছে নীরবে। আজ সাবিত্রীও ভাবে কথাটা। নিজেও ভেবেছে সে। কত কষ্টে সে দেশ ছেড়ে এসেছিল—প্লাটফর্মের দিন—তারপর প্রত্যহের লড়াই আজও চলেছে। একটা জীবনের উপর কত ঝড় বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

সাবিত্রী বলে—সারাজীবন খেটে আর লড়াই করেই কাটালাম মা। শরীর এতদিন সয়েছে, এবার জবাব দিতে চাইছে। আমি কি করবো মা?

রীনা মুখঝামটা দিয়ে ওঠে—অর্থাৎ পাকাপাকি এবার বোঝা হয়েই ঘাড়ে চাপার মতলব। কেন আপনার অন্য ছেলেদের বলুন? মেজছেলে মেজবৌমা তো শুনি এখন নিজেরা বাংলো বানিয়ে আছে, মাকে দেখুক এবার। একা সব দায়ই কি আমার? চিরকালই কি আমাকেই বোঝা বইতে হবে?

সাবিত্রী জবাব দিল না। বাসনপত্র কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়, মাজতে বসে। শীতের দিন। আগে এত শীত করত না। এখন হাড়-কাঁপানো শীত বোধ হয়। বয়স হচ্ছে। এবার খাটতে পারবে না আর। বসে বসে খেতে দেবে না ওরা দুজনকে। সমীরের আর তার মায়ের বোঝা ওরা বইতে রাজী নয়, তা হাবভাবেই জানিয়ে দেয় প্রায়ই রীনা।

সাবিত্রীর মনে হয় অধীর মায়ারা নিজের বাড়ি করেছে, তাকে একবার নিয়েও যায়নি। খুব কাজে ব্যস্ত তারা। তবু সাবিত্রীর মন কেমন করে মেজছেলের জন্য। গোপন আশাও করে সে যদি তাদের সংসারের এক-কোণে একটু ঠাঁই পায় তাহলে সমীরকে অর্থাৎ একজনকে এরা খেতে দিতে পারে। তবু মা-সমীর আলাদা থেকেও কলকাতায় থাকার মত আশ্রয় পাবে দুজনে দুদিকে।

সেদিন সন্ধ্যায় সাবিত্রী বলে সমীরকে—অধীরকে অনেকদিন দেখিনি রে, ছেলেটার জন্য মন কেমন করে। নিয়ে চল না? কাল তো রবিবার ছুটি।

সমীরের বালিগঞ্জের দিকে কাজও আছে। কয়েকটা দোকানে মাল সাপ্লাই দেবার কথা বলতে হবে। যাবে সে ওদিকে। তবু মায়ের কথায় বলে—আচ্ছা মা যাহোক, ছেলে তো খবরই নেয় না। এখন শুনি নিজের বাড়ি করেছে। মাকে গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নও করেনি। সেখানে যেচে যাবে মা?

সাবিত্রী বলে—হয়তো আসতে সময় পায়নি। তবু নিজের বাড়ি। কিছুই ছিল না, বাড়ি করেছে দেখতে যাবো না? নে চল বাবা?

সমীর বলে—ঠিক আছে। চল, কাল ঘুরে আসবে।

ইদানীং রীনাকে একটা ঠিকে ঝিও রাখতে হয়েছে। সাবিত্রী আর ঠাণ্ডায়

এত বাসন মাজতে পারে না। ঘর মুছতেও কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে জ্বরও হর। কাউকে বলে না সাবিত্রী। রীনা সময়ে কাজ পায় না। তাই মাসে তিরিশ-টাকা দিয়ে ওই কাজের মেয়েকে রেখেছে। দুবেলা এসে বাসন মেজে দেয়।

সকালে সাবিত্রী গঙ্গাস্নান করে রান্নাঘরে ঢোকে। কোনমতে রান্নাটুকু করে, তাও শরীর বয় না সবদিন।

রীনা বলে—বসে বসে খাওয়াবার সামর্থ্য আমার নাই দু-দুটো প্রাণীকে।

সেদিন সকালে সুবীর, রীনা চা খাচ্ছে। প্রবীর-রঞ্জনাও রয়েছে। ছুটির দিন। সাবিত্রী বলে—আজ একবার অধীরের ওখানে যাবো বাবা। কতদিন দেখিনি ওকে।

রীনা বলে—ঠিক আছে। তাই যান—যদি বলে দিনকতক ওখানেও থেকে আসুন। তবু হাওয়া বদল হবে।

রীনা যে চায়, মা সরে থাকুক এখান থেকে সেটা তার কথাতেই জানাতে চায়, সাবিত্রীও এখান থেকে মুক্তি পেতে চায়। নিষ্কৃতি দিতে চায় এদের তার দায় থেকে।

সাবিত্রীও স্বপ্ন দেখে ওই অন্ধকার সিঁড়ির তলায় থাকতে হবে না দিনভোর ওই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। অধীর যদি বলে থেকেই যাবে এখানে। এর থেকে ভালোই থাকবে।

এতদিন কলকাতায় এসেছে বাইরে বের হয়নি অনেকদিন। স্বামী থাকতে দু'একবার কালীঘাটে একবার চিড়িয়াখানায় এসেছিল সাবিত্রী।

আজ অনেক দিন পর বের হয়েছে সমীরের সঙ্গে বাসে! বড় বড় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, রাস্তায় গাড়ির ভিড় দেখে সে। শহরটা যেন বিরাট বিশাল। তাদের ওই আহিরীটোলার গলিতেই সীমাবদ্ধ নয়।

বলে সাবিত্রী—অনেক দূরে বাড়ি করেছে অধীর?

সমীর বলে—শহরটাই তো বড়, তাই মনে হচ্ছে।

বাস থেকে নেমে অন্য বাসে উঠে ওরা নেমেছে। এদিকটা বেশ ছিমছাম। নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে, সাজানো রাস্তা। আহিরীটোলার মত গিঞ্জি নয়। সমীর ঠিকানাটা খুঁজছে।

অধীররা এখন নিজেদের বাড়িতে এসে উঠেছে। মায়াও তার নিজের মত করে ঘর সাজিয়েছে। ড্রইংরুমে কার্পেট পাতা, কাঁচের আলমারীতে কিছু কিওরিও। বাড়ির দেওয়ালেও নকল টেরাইকোটার ইট বসানো।

সোফা সেট, সেণ্টার টেবিল, ফুলদানী, দরজা-জানলায় রঙ্গীন পর্দাতে রুচির আভাস ফুটে ওঠে।

ওদিকে একটা বড় ঘরে সতরঞ্চি পাতা। ওখানে সকাল বিকাল প্রাইভেট কোচিং করে ওরা দুজনে পালা করে। ইংরাজী আর বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা আসে সপ্তাহে দুদিন করে এক ব্যাচ, এইভাবে তিনটে সকালে আর সন্ধ্যায় তিন ব্যাচ। এর থেকে ওদের যা আয় হয় তাতে সংসারে ঠাট-বাট চালিয়েও

কিছু বাঁচে আর দুজনের মাইনেটা পুরো ব্যাঙ্কেই চলে যায়। বাড়ি তৈরী করতে কিছু দেনা হয়েছে তা শোধ দিয়ে দেবে তারা।

আজ ছুটির দিন। সকালেই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। জমাটি চায়ের আসর বসেছে। মল্লিকাও এখন এখানেই প্রায় থাকে।

স্বামী মারা যাবার পর তার ছেলে মদনই এখন ব্যবসা দেখছে, ঘরে বৌ নাতিও আছে। মদনের বৌ প্রমীলার সঙ্গে শাশুড়ি মল্লিকার ঠিক মেলে না। কথা কাটাকাটি প্রায়ই হয়। মল্লিকা তাই মায়ার এখানেই থাকে।

মায়াও দেখেছে বাড়িতে একজনের থাকা দরকার। ঝি চাকরদের হাতে বাড়ি ছেড়ে দুজনে বের হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। ওরা তাদের কাজ টাকা রোজগারের ধান্দাতেই ব্যস্ত। সংসারের চাকাটা যাতে মসৃণ ভাবে চলে তার জন্য দেখভাল করতে হয় একজনকে। সেই কাজটা তার মাই করছে এ সংসারে, তাই মল্লিকা এখানে থাকাতে সুবিধাই হয়েছে মায়াদের।

মল্লিকাও এবাড়ির কর্ত্রী সেজে বেশ মেজাজের সঙ্গে চলাফেরা করে। পরণে সরু ইঞ্চি পাড় ফরসা শাড়ি, স্বামী গত হবার পর থেকে তার সাজগোজ কিছুটা বদলালেও বেশ ছিমছামই থাকে সব সময় মল্লিকা, বালিগঞ্জে এসে সাজগোজটাও বজায় রাখতে শিখেছে সে। মল্লিকাই কাজের মেয়েকে দিয়ে বসার ঘরে ওদের জন্য চা-খাবার এনেছে। আজকাল স্কুল কলেজের শিক্ষকদের অবশ্যকর্তব্য নিয়ে ওই সমবেত শিক্ষক অধ্যাপকদের মধ্যে গভীর আলোচনা চলছে।

টুইশানি থেকে কে কত টাকা বেশী রোজগার করবে তার অদৃশ্য পাল্লাও চলে। তারা এখন ভবিষ্যৎ ছাত্রদের সম্বন্ধে হতাশই। যদিও এদের অনেকেই স্কুল কলেজের ক্লাশও ঠিক মত নেয় না। অথচ মাইনের চেকটা ঠিক মত পেতে খুবই আগ্রহী।

অধীর বলে—কলেজের অধ্যাপকদের নতুন মাইনের স্কেল করা উচিত। তাদের যোগ্য সম্মান দেওয়া কর্তব্য।

এমন সময় কলিং বেলটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে।

মায়া বলে শিখাদি এল বোধ হয়। দেখছি—

ওদের স্কুলের হেডমিসট্রেস, তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উঠে গিয়ে দরজা খুলে সামনে বৃদ্ধা আধময়লা কাপড় পরা সাবিত্রী আর সমীরকে দেখে চুপসে যায় মায়া। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—আপনারা এখানে?

অর্থাৎ ওদের যেন এখানে আসাটা সে পছন্দই করেনি।

অধীরও এসে পড়ে। ড্রইং রুমের ওদিকে একটা গলিপথ আছে বাড়ির ভিতরে যাবার। সাধারণতঃ এরা কেউ সেই পথটা ব্যবহার করে না। সুইপাররাই যাতায়াত করে বাড়ি পরিষ্কার করার সময়।

অধীরও বের হয়ে এসে ওদের দেখে অবাক হয়।

সাবিত্রী অপরাধীর মত বলে—কত দিন দেখিনি, শুনলাম নতুন বাড়ি করেছিস। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

সমীর চুপ করে দেখছে মেজদা-মেজবৌদিকে। সে এর মধ্যেই জীবনকে কিছু কিছু দেখেছে। মানুষজনকে চিনতে পারে। দাদা বৌদিকেও সে চেনার চেষ্টা করছে।

অধীরই বলে নেহাৎ বাধ্য হয়েই—চলো, ভিতরে চলো।

ওরা ড্রইংরুমে ঢুকতে যাবে। মায়া ওদের বলে—এদিকে নয়, বরং ওই গলি দিয়ে আসুন ভিতরে।

মল্লিকাও অবাক হয় ওদের দেখে।

পিছনে বারান্দা মত—ওদের ডাইনিং টেবিলটা ওখানেই পাতা, সামনে একটু উঠান। সেখানে কিছু ফুলের টব—পাতাবাহারের গাছও রয়েছে।

সাবিত্রীকে বসিয়েছে ওই বাইরেই।

সমীর দেখছে মাউইমাকে এখানে কর্তৃত্ব করতে। সাবিত্রী চুপচাপ বসে আছে।

মল্লিকা বলে—নতুন ঘর সংসার পাতছে, কিছুই তো জানে না, তাই দুদিন এসে ওদের সব ঠিকঠাক করে দিয়ে যাচ্ছি। বসুন বেন ঠাকরুণ। সরবৎ দিই। মল্লিকাই সরবৎ দেয় সাবিত্রীকে।

মায়া ভিতরে গিয়ে তখন আলোচনায় যোগ দিয়েছে।

অধীর এক ফাঁকে বের হয়ে আসে। শুধোয়—কেমন আছো মা?

সাবিত্রী দেখছে অধীরকে। সেই ছোট ছেলেটা আজ কত বড় হয়েছে। নিজের বাড়ি করেছে। সাজানো ছিমছাম বাড়ি। ওদিকে দুটো ঘর খালিই পড়ে আছে। কত আলো হাওয়া, খাট—খালিই থাকে। পাখাও রয়েছে। ওদিকে খাবার টেবিলে কলা-আপেল-লেবু সাজানো। ফ্রিজে কত খাবার।

তার মা সিঁড়ির তলে অন্ধকারে গরমে পড়ে থাকে, একবেলা ভাত আর সামান্য তরকারি, রাতে একমুঠো মুড়ি তাও কত পরিশ্রম করে গঞ্জনা সহ্য করে খেতে হয়—ছেলে কি এসব জানে না?

সাবিত্রী বলে অধীরের কথায় অভিমান ভরে—ভালো, খুব ভালো আছি বাবা। তোরা?

অধীর বলে—চলে যাচ্ছে কোন মতে। বাড়ি করতে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেল। তাই শোধ দিতে জান বেরুচ্ছে। দাদারা কেমন আছে?

—ভালোই। সাবিত্রী বলে।

মল্লিকা শোনায়—যা দিন কাল পড়েছে তাতে টিকে থাকাই দায় দিদি। তাই বলি অধীরকে, কোন মতে খেয়ে না খেয়ে দেনা শোধ করো বাবা।

অধীরের আর বলার করারও যেন কিছুই নাই। সে ভিতরে গিয়ে আবার সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে দেশের ছাত্রসমাজের সব সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সাবিত্রী সমীর বসে আছে বাইরের বারান্দায়।

মল্লিকা ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেনি। হঠাৎ বুড়িকে ছেলের কাছে এসে উঠতে দেখে তার সাবধানী মন এবার কিসের গন্ধ পায়। মল্লিকা জানে ও বাড়িতে সাবিত্রী কিভাবে পড়ে আছে, তাই মায়াকে ইশারায় ও ঘরে ডেকে চাপা স্বরে বলে—তোর শাশুড়ি বুড়ি এখানে ঠেলে এসেছে কেন রে?

মায়া মায়ের কথায় বলে—ঠিক বুঝছি না।

মল্লিকা বলে—ওখানে তো সিঁড়ির তলে পড়ে ঝি-গিরি করছে। এখানে আবার তোর ঘাড়ে চাপতে এসেছে নাকি ওই দামড়া ছেলেটাকে নিয়ে? এই বাজারে দুজনের বোঝা পড়বে তোদের ঘাড়ে?

মায়া চমকে ওঠে—সেকি মা! ওসব পারবো না। নিজেদের নিয়েই অস্থির হচ্ছি, আবার ওইসব ঝামেলা?

ওদের যেতে বলো এবার! ছেলের জন্য কত দরদ বোঝা গেছে—আসাই বা কেন এখানে?

মল্লিকা বলে—দুনিয়াটা স্বার্থপরের ভিড়ে ভরে গেছে। নিজের তালেই এসেছে বুড়ি এখানে শিকড় গাড়ার মতলবে।

কথাটা সমীর শোনে বাইরে থেকে। শোনাবার জন্যই গলা তুলে বলছে ওরা।

সে অবশ্য প্রথমে এ বাড়িতে পা দিয়ে ওদের মুখচোখ আর অভ্যর্থনার বহর দেখেই বুঝেছিল এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। কেউ তাদের জন্য এতটুকু ঠাঁইও অন্তরে রাখেনি। মা-ভাইদের যেন চিনতেই চায় না এরা।

মাকে ওই বাইরের বারান্দাতে বসিয়ে ওরা নিজেদের আলোচনায় ডুবে গেছে। মায়া মল্লিকা ওঘরে এদের তাড়াবার প্ল্যান করছে।

সাবিত্রী বসে আছে। সেও বুঝেছে ব্যাপারটা। তার ছেলের ঘরে ঢোকার অধিকারও তার নাই। মা আজ সন্তানের কাছে কোন দূরের মানুষই হয়ে গেছে। আজ সে নিঃস্ব—তাই সন্তানও একালের নিঃস্ব মাকে চেনে না। তার জন্মদাত্রীকেও ভুলে গেছে! ঘরের বৌ সে তো পরের মেয়ে—সেও তাই চেনে না।

সমীর বলে—চলো মা।

চমক ভাঙ্গে সাবিত্রীর! তার একটা গোপন আশা তবু ছিল। ভেবেছিল অধীর তাকে কাছে টেনে নেবে এতদিন পর। কিন্তু সেই স্বপ্নও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সমীরের কথায় চাইল। সমীর বলে—ছেলেকে দেখলে তো? এবার চলো—

সাবিত্রীও হতাশা ভরা স্বরে বলে—হ্যাঁ বাবা, দেখলাম। চল।

মল্লিকা এবার ওদের উঠতে দেখে বের হয়ে আসে, পিছনে মায়া।

মল্লিকা বলে—চলে যাচ্ছেন কেন ঠাকরুণ? এ বেলাটা থেকে গেলে হতো না? ফিরতে দেরী হবে—

সমীর বলে—না। যেতেই যখন হবে তখন একবেলা থেকে অন্নধ্বংসই বা করবো কেন দাদার? তাছাড়া দুজনের এক বেলার খাওয়ার খরচও তো কম নয়। চলো মা!

ওরা বের হয়ে যায়।

ওদের মুখের উপর সমীর ওদের কথাগুলোই বলে গেছে। মল্লিকা বলে—শুনলি ওই গোমুখ্যু ছোঁড়াটার কথা? গেড়ে বসতে পারেনি এখানে, তাই ওইসব বলে গেল। কথার তেজ আছে।

অধীরও বের হয়ে আসে। সে বলে—মা চলে গেল ?

মায়া শোনায়—কেন, ওই শুকনো বোঝা ঘাড়ে চাপাবে নাকি ?

মা মেয়ের সামনে অধীর নীরবই থাকে। বসে সে—না-না। তোমরা যা ভালো বুঝেছো করেছো। আমি কেন কথা বলতে যাবো ?

সাবিত্রী ফিরে আসে তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বাসে ট্রামে আসতেও দেরী হয়। রীনার হেঁসেলও উঠে গেছে।

রীনা বলে—এত দেরী ?

অবশ্য রীনা আশা করেছিল যে অধীর হয়তো ওদের দু' চারদিন রেখে দেবে তার বাড়িতে। এখন তো তারা ভালো রোজগার করে, মাকে রাখতেও পারে। তার বোঝা কমবে। কিন্তু ওদের ফিরে আসতে দেখে তাই বিরক্তই হয়। তবু সেটাকে চেপে রেখে বলে রীণা—দুপুরে ওখানেই খেয়ে দেয়ে এলেন ? মেজবাবু-মায়া খুব যত্নআত্তি করলো ?

সাবিত্রী দেখছে ওকে। এ যেন পরিহাস তরল কণ্ঠস্বরই।

সাবিত্রীকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে সমীর! এক বেলা না খেলেও তার চলে। খিদে সহ্য করার অভ্যাস তার আছে। সাবিত্রীরও উপবাস দেওয়া নতুন নয়। আগেও ছেলেদের, স্বামীকে খাইয়ে কোন কোনদিন তার জন্য কিছুই জুটতো না। জল খেয়েই থাকতো দিনভোর।

এখনও থাকতে হয় মাঝে মাঝে। উপবাস সহ্য হয়, ওই উপহাসটা তার গায়ে বাজে। সেটাকেও সইতে হবে তাকে।

সাবিত্রী বলে—হ্যাঁ বাছা, খেয়েই এলাম। বেশ ভালোমন্দ খাইয়েছে।

—হাজার হোক ছেলে তো। ফোড়ন কাটে রীনা।

সাবিত্রী বলে—হ্যাঁ মা। ছেলেদের দয়াতেই তো মায়েদের বাঁচতে হয় শেষ জীবনে। তোমারও ছেলে আছে—সেদিন আমার মত অবস্থা যেন না হয়।

কথাগুলো বলে সাবিত্রী চলে গেল সিঁড়ির নিচে। তার চোখে জল নামে।

রীনাও বেশ বুঝেছে ওই কথার মর্মার্থ। বলে সে—কেন ? আমি তো সাধ্যমত করতে চেষ্টাই করি। আরও তো ছেলে আছে, তারা কি করে তাও জানি। একা আমারই দায় ? দুজনের বোঝা টানতে পারবো না। সমীর তো বড় হয়েছে—তাকে নিজের পথ দেখে নিতে বলুন। একজনের অন্ন দিতে পারি—দুজনের নয়, এই আমার শেষ কথা বলে গেলাম।

সমীর আজ মেজদার মেজবৌদির সব ব্যাপারটাই দেখেছে। বার বার মনে পড়ে মায়ের অসহায় বেদনার্ত মুখখানা। সে কিছুই করতে পারেনি।

সমীর স্বপ্ন দেখে সে নিজে ব্যবসা করে নিজের বাড়ি করেছে। মাকে নিয়ে সেই ঝকঝকে বাড়িতে ঢুকছে। মায়ের মুখে হাসি—শাঁখ বাজছে।

স্বপ্ন দেখছিল সে। এখনও তার পায়ের তলে মাটি নাই। তাই সেও এদের

সকলের বোঝা হয়েই আছে। তাই দাদা বৌদিরা তাকে সহ্য করতে পারে না। এড়িয়েই চলে তাকে।

তবু একজন আছে যে তার পথ চেয়ে থাকে এটা জেনে মনে মনে খুশীই হয় সমীর। বীণা তাকে বার বার আসতে বলেছিল তাদের বাড়িতে।

কদিন ধরে গেঞ্জির ব্যবসা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিল সে। টাকার যোগাড় করে সে ব্যবসাতে নেমেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু দোকানে তার মাল বিক্রীও শুরু হয়েছে। দু' একজায়গায় ভালোই বিক্রী হয়েছে—নতুন করে মালও দিয়েছে। কোম্পানীর ঘরেও কিছু টাকা ফেরৎ দিয়ে মালও আনছে।

সমীর আজ ফাঁক পেয়ে এসেছে বীণাদের বাড়িতে। এর আগেও এসেছে দু' একবার। আজ বীণা বাড়িতেই ছিল। ওকে দেখে খুশী হয়।

—যাক্! এসেছো তাহলে? ভাবলাম—আমার কথা ভুলেই গেছো বোধ হয়।

সমীর দেখছে ওকে। ফর্সা সুন্দরী বীণা। চাঁপাবরণ শাড়িতে ও যেন একটা আলোকবিন্দুর মত ঝলমল করছে। মুখের হাসিটাও খুব সুন্দর।

—চলো! বীণাই ভিতরে নিয়ে যায় ওকে। বীণার মা ওকে শুধোয় —রীনারা সব ভালো আছে তো?

—হ্যাঁ।

ছাদে এসেছে ওরা। বীণা নিজের হাতে ছাদে অনেক ফুলের গাছ লাগিয়েছে। যুঁই লতায় সাদা ফুলের রাশ বাতাসে ঝরে ঝরে পড়ে। বেলফুলের গাছে অজস্র কুঁড়ি এসেছে। সবুজ সুগন্ধময় একটি পরিবেশ।

বীণা জীবনকে, আশপাশকে সুন্দর করে তুলতে পারে। সেই ক্ষমতা ওর আছে। সমীরের মনে হয় তার ব্যর্থ জীবনকে সেই পূর্ণতায় ভরিয়ে দিতে পারে।

বীণা এর মধ্যে খাবার এনেছে। গরম টোস্ট-সন্দেশ, কলা আর চা। খিদেও পেয়েছে সমীরের। দিনভর উপবাস চলেছে।

বলে সে—এসব কেন?

বীণা হাসে—বা-রে, এলে খাবে না? খাও! নিজের হাতে বানিয়েছি টোস্টগুলো।

—তাই এত সুন্দর!

বীণা বলে—ছাড়ো ওসব কথা। বলো, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?

সমীর বলে—শুরু করেছি। দেখা যাক কেমন চলে।

বীণা এর মধ্যে একটা খাম বের করে বলে—শ' পাঁচেক টাকা আছে, আমার নিজের টাকা। তোমার ব্যবসাতে লাগাও।

অবাক হয় সমীর। কেউ তাকে এতগুলো টাকা এমনি দিতে পারে তা সে ভাবেনি। সে অবাক হয়—কী বলছ বীণা?

বীণা বলে—ঠিকই বলছি। নাও—

—যদি মারা যায়?

বীণা বলে—তোমার জন্য এটুকু নয় আরও অনেক কষ্টই আমার সইবে সমী। আমি চাই—জীবনে তুমি বড় হও, সফল হও। জানি—কেউ তোমাকে রুখতে পারবে না। তুমি বড় হবেই—

সমীরের হাতটা বীণার হাতে। সন্ধ্যা নামছে। আকাশের আলো নিভে তারাগুলো জেগে ওঠে এক এক করে ভীরু চাহনি মেলে। বীণার দু'চোখে যেন সেই তারার দীপ্তি জাগে। সমীরের মনে হয় পৃথিবীটা শুধুই কঠিন, নির্মম নয়, এখানে বীণারাও আছে। যারা সারা অন্তর দিয়ে কামনা করে একজন সুখী হোক। ভালবাসার স্বাদ আজ যেন নিবিড়ভাবে অনুভব করে সমীর।

সমীর বলে—টাকাটা এখন থাক বীণা, এখন টাকার যোগাড় আমি করেছি। ব্যবসাও শুরু করেছি। যদি দরকার লাগে নিশ্চয়ই নেব।

—সত্যি! না পর ভেবে এড়িয়ে যেতে চাইছ?

সমীর বলে—তোমাকে পর ভাবতে পারি না বীণা। জীবনে এই একজনকে প্রথম দেখলাম যে সত্যি আমার জন্য ভাবে, আমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার এই ভালোবাসাকে অপমান করার সাধ্য আমার নাই বীণা।

বীণা এগিয়ে আসে।

আজ বীণাকে কি এক দুঃসাহসে কাছে টেনে নেয় সমীর। ওর নরম পেলব দেহের উষ্ণ স্পর্শে সমীর এক বিচিত্র অনুভূতির স্বর্গরাজ্যে হারিয়ে যায়।

হঠাৎ কার ডাকে চমক ভাঙ্গে। ছাদে বীণার মা কখন এসে উঠেছিল জানে না তারা। ওর মাও অবাক হয় সমীর বীণার এই ঘটনা দেখে। সারা মন জ্বলে ওঠে। তবু কোন রকমে নিজেকে সংযত করে ওদিক থেকে ডাকে—বীণা।

বীণা চমকে ওঠে। সমীরও। সরে যায় তারা।

মা বলে—বীণা, নিচে মাস্টারমশাই এসেছেন।

—যাচ্ছি।

বীণা নেমে যায়। সমীরও নামছে।

হঠাৎ বীণার মায়ের ডাকে চাইল। বীণার মা বলে—সমীর, বীণার বয়স হয়েছে। তোমরা আর ছোট নও। নিশ্চয়ই সেটা বোঝার বয়স তোমার হয়েছে। তাই মনে হয় এ বাড়িতে আসা যাওয়া কম করলেই ভালো হয়।

সমীর চুপ করে নেমে এলো। ও বাড়িতে আর দাঁড়ায় না। সোজা বাইরে এসে দাঁড়ায়। সারা মনে তার ঝড় ওঠে। কিন্তু ওসব ভাবার সময় তার নাই। এদিকে কয়েকটা দোকানে তার মাল দিতে হয় সেখানে যেতে হবে, খবর নিতে হবে। গেঞ্জিওয়ালার জীবনে প্রেমের অবকাশ খুবই কম। সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফেরে তখন রাত হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই বের হতে হয় সমীরকে। শুরু হয় পরিক্রমা।

সুবীরেরও সময় নাই। সেও বের হয় সকালে।

রীনা যথারীতি ভাঁড়ারের জিনিসপত্র সাবিত্রীকে বের করে দেয়। সাবিত্রী দেখছে চাল দেয় মাত্র একজনের মত।

সাবিত্রী বলে— একজনের চাল ?

এ সংসারে সুবীর রীনা ও প্রবীর রঞ্জুর মত করে ভালো চালের ভাত হয় প্রেসার কুকারে। যুঁই ফুলের মত ভাতগুলো। আর সমীর-সাবিত্রীর জন্য বরাদ্দ রেশনের চাল—সে ভাতের কোন স্বাদই নাই। মাঝে মাঝে পিণ্ডির দলা পাকিয়ে যায়, কখনও গন্ধ ছাড়ে। বিশ্রী গন্ধ। সেই চালও আজ মাত্র এক কৌটা দেয় রীনা, বলে—কাল বলেছি শোনেননি ? আজ থেকে এ সংসারে আপনাদের মধ্যে একজনকেই খেতে দেবো। দু'জনকে খেতে দিতে পারবো না। আর একজন যাবে মেজবাবুর ওখানে, না হয় খেটে খাবে। দু'জনের খাবার হবে না এখানে।

সাবিত্রী স্তব্ধ হয়ে যায়। কোন কথাই বলে না।

সমীর আজ আদায়পত্র ভালোই করেছে। তার মালও চলছে ভালোই। ভবদেবও খুশী হয়। বলে—তুমি বোলচাল যদি দিতে পারো, তাহলে সেলস লাইনে উন্নতি করতে পারবে হে ছোকরা !

সমীর সেখানের হিসাব মিটিয়ে দেখে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা উদ্‌বৃত্ত রয়েছে। কোম্পানী এবার আরও বেশী মালই দেয় তাকে।

সমীর টাকাটা নিয়ে সোজা সেই সোনার দোকানে আসে। তার বন্ধকী সেই আংটিটা ছাড়াতে হবে। দোকানদারও তাকে এত শিগগির মাল ছাড়াতে দেখে খুশীই হয়। সুদ দু'মাসের তিরিশ টাকা পেয়ে সেও খুশি।

সমীর আংটিটা ফিরিয়ে নেয়। তার বাবার দেওয়া আংটি। সেটা সযত্নে পকেটে রেখে এবার বাড়ির পথ ধরে। তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে।

সাবিত্রী বেশ বুঝেছে এখানে এরা একজনকেই খেতে দেবে ; তাদের দু'জনকে নয়। ছেলেদের কাছে বলেও কোন লাভ হবে না। এর বেশী আর জুটবে না এখানে। সাবিত্রী তার পথই বেছে নিয়েছে।

সমীর ফেরে। মা বলে—এত দেরী !

—কাজে আটকে গেছলাম মা !

মা বলে—স্নান করে নে বাবা, তোর দেরী দেখে আমি খেয়ে নিয়েছি। তুই চান করে আয়—খাবার দিচ্ছি।

সমীর বলে—বেশ করেছো মা। অবেলায় খেলে তোমার শরীর খারাপই হতে পারে। আমি চান করে আসছি।

সমীর নিচেকার চৌবাচ্চার ঠাণ্ডাজল ঢেলেই গা হাত মাথা মুছে ভাতের থালায় বসে। তখন ভাত পিণ্ডি পাকিয়ে গেছে। সমীর জানে না মা কালও খায়নি, এক ছেলের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে উপবাস দিয়েছে। আজ

এরা মাত্র দিয়েছে একজনের অন্ন। আর মা নিজে না খেয়ে সেটা এগিয়ে দিয়েছে সমীরের দিকে। মা স্থির করেছে তার আর বাঁচার দরকার নাই এখানে, তবু তার সন্তান বাঁচুক, আশ্রয়টুকু তারই থাক।

মা হয়ে সন্তানের জন্য এটুকু সে ত্যাগই করবে। সমীর খেয়ে ওঠে। মা দেখে ছেলের চোখে অন্নতৃপ্তি—তাতেই মা নিজের ক্ষুধাকেও ভুলে যায়।

সমীর সারাদিন ঘুরেছে। এবার ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ে—সাবিত্রী দেখছে ওকে। ক্লান্ত ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোয়।

সমীর চাইল—মা।

সাবিত্রী চোখের জল সামলে বলে—ঘুমো। বৈকাল হয়ে গেছে। গঙ্গাস্নান করে ভাগবত পাঠ শুনে আসছি।

মা গামছা কাপড় নিয়ে বের হয়ে গেল এ বাড়ি থেকে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি নামে। সমীর সন্ধ্যার মুখে শ্যামবাজার হাতিবাগান এলাকার দোকানে মাল দিতে যায়। তার মনে আজ আশার আলো জাগে। বীণার কথা মনে পড়ে। সে ওদিকের স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে আসে। বৈকালে কাল দেখা করবে ওর সঙ্গে। দোকানের কাজ আজ সেরে রাখবে। তাই ফিরতে দেরী হয়। দেখে মা তখনও ফেরেনি।

সুবীর ফিরেছে। রীনা গজগজ করছে—ভাগবত পাঠ কি সারারাত শুনবে? এখনও ত্যানার বাড়ি ফেরার নাম নাই। রাতের পিণ্ডি কে রাঁধবে? আমি? দূর করো আপদকে।

রঞ্জনাই খবর দেয়—কাকু, ঠাক্‌মা এখনও ফেরেনি।

অবাক হয় সমীর—সেকি! মা তো বৈকালে গঙ্গাস্নানে গেছে—বললে পাঠ শুনে ফিরবে।

—তোমার মায়ের ব্যাপার মাই জানে। রীনা গজগজ করে। রাত্রি প্রায় নটা। বের হয় সমীর।

গঙ্গার ঘাটে তখন পাঠের আসর সব শেষ হয়ে গেছে। পাঠক, কথক, শ্রোতৃবৃন্দ আর কেউ নাই। রাস্তার কুকুর, গরুগুলো ওই স্থান দখল করেছে। মাঝিদের ঢোলক বাজিয়ে গানের শব্দ ওঠে। ঘাটে স্নানার্থীরাও কেউ নাই। সব শুনশান। সমীর এ-ঘাট ও-ঘাট ঘোরে। কারোও দেখা পায় না। দুচার-জন মাতাল চুল্লুর ঠেকে আসর জমিয়েছে, ওদিকে গাঁজা পার্টিও আছে।

সবাই মিলে চাঁদা করে গাঁজার ছিলিম ধরিয়ে টানে। অল্প পয়সার নেশাতেই ডুবে থাকে। তাদের একজন বলে—কি বোকা রে। রাতদুপুরে কেউ এদিকে মায়ের খোঁজে আসে? বেরসিক।

কোন রসিক মাতাল বলে—মাকে খুঁজছো, মন্দিরে যাও ভাইটি, মা সেখানে আছেন। এখানে যাদের দেখছো তারা সবাই মাতঙ্গিনী—মায়াবতী—মা কেউ নয়। গুড্ বয়।

সমীরের মনে হয় মা কি গঙ্গাতেই ডুবলো তাহলে? এর মধ্যে ওর পুরনো

বন্ধু ন্যাপার দলও খবর পেয়ে পোস্তা থেকে এসে পড়ে। ওরাও এঘাট ওঘাট ঘুরে খবর নিয়েছে, সেরকম দুর্ঘটনা কোথাও ঘটেনি।

জলপুলিশের ওখানেও যায় তারা। পুলিশ অফিসার এত রাতে ওদের দেখে শুধোয়—কি ব্যাপার ? কোন হাঙ্গামা বেধেছে নাকি ?

পরে আসল খবরটা শুনে বলে সে—কই না তো ! এদিকের কোন ঘাটে তেমন কোন ঘটনা ঘটার খবর তো আসেনি।

—তাহলে ওর মা গেল কোথায় ? ন্যাপাই প্রশ্ন করে।

পুলিশকর্মী বলে—নিরুদ্দেশ হয়েছে কিনা খবর নাও।

রাতভোর থানা—গঙ্গার ঘাট—এখান ওখান মায় পরদিন ওরা বিভিন্ন হাসপাতালেও খবর নেয়।

সুবীরকেও সকালে বলে সমীর ঘটনাটি। রীনা ছিল সেখানে। সুবীর খবরটা শুনে বলে—খুঁজে দ্যাখ কোথায় গেল ?

সমীর বলে—আমরা তো খুঁজছি। পুলিশ তেমন গা করছে না। তোমার তো চেনা জানা আছে, একটু বলে দ্যাখো, ওরা যদি একটু খোঁজ করে তাহলে মাকে পাওয়া যেতে পারে।

রীনা বলে—সে কি ছোট মেয়ে যে হারিয়ে যাবে ? গেছেন কোথাও—দেখবে ঠিক ফিরে আসবে। তারপর তীক্ষ্ণস্বরে মন্তব্য করে—এখানে বসে খাবার মৌরসী পাট্টা ছেড়ে চলে যাবে ? মোটেই না। ফিরে এলো বলে।

সমীরের সারা মন হাহাকার করে ওঠে। সে ওদের চেনে। মাকেও চেনে। এতকাল ধরে মায়ের উপর ওরা অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। তাই মা অতিষ্ঠ হয়ে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে বোধ হয়।

সমীর জবাবটা দিতে পারে না। ওই সিঁড়ির নিচে তক্তপোশে এসে বসে। মায়ের সবই পড়ে আছে এখানে। ছেঁড়া ময়লা শাড়িটাও রয়েছে। মা নেই। দুচোখ ছাপিয়ে জল আসে।

রঞ্জনা এখন বড় হয়েছে। ঠাক্‌মা-কাকুর উপর তারই কিছু মায়া আছে। মাকে লুকিয়ে চলে আসে এখানে। সবই দেখে, শোনে মেয়েটা।

রঞ্জনা বলে—জানো কাকু, ঠাক্‌মা কাল থেকে কিছুই খায়নি। আজও ভাত খায়নি।

—কেন ?

সমীরের কথায় মেয়েটা এদিক ওদিক চেয়ে বলে—মা তোমাদের দুজনের খাবার আজ থেকে বন্ধ করেছে—একজনের খাবারই দেবে বলেছে। তোমাকে খাইয়ে ঠাক্‌মা না খেয়েই এ বাড়ি থেকে চলে গেল।

চমকে ওঠে সমীর। মাকে এরা খেতেও দেয়নি। এরা একজনের খাবার দেবে মাত্র। মা তাই সমীরকে বাঁচার পথে রেখে সে হারিয়ে গেল এখান থেকে কোন অনিশ্চিতের জগতে চিরকালের জন্য।

মা নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে নিয়ে ছেলেকে বাঁচার পথ করে দিয়ে গেল।

—মা ! মাগো। এত দয়া তোমার ? আমাকে বাঁচাবার জন্য নিজে চলে গেলে ?

সমীরের মনে হয় এ যেন মায়েরই দেওয়া প্রাণ—মাকে খুঁজতেই হবে। কোথায় যাবে সে। মেজদার বাড়িতেও যায়। অবশ্য তখন দাদা বৌদি কেউ ছিল না।

মল্লিকা দুপুরে আরাম করে আহারের পর নিদ্রা দিচ্ছিল। অসময়ে বেল বাজতে কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিরক্তিভরে উঠে এসে গেটের বাইরে সমীরকে উস্কোখুস্কো চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভয় পায়। গেট খোলে না।

সমীর শুধোয়—মা এসেছে এখানে ?

মল্লিকা অবাক হয়—তোমার মা ? না তো। এখানে আসেনি বাপু।

আর কোন কথা না বলে ওর মুখের উপরই দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সমীরের ওখানে প্রবেশ নিষেধ। ফিরে আসে সে।

মনে পড়ে একটু ওদিকেই বালিগঞ্জে বীণাদের বাড়ি। প্রথম দিকে দাদার বিয়ে হবার পর বীণার মা তার মাকে দু' একবার নেমন্তন্ন করে এনেছিল। অবশ্য মায়ের আর কিছু না থাক আত্মসম্মান জ্ঞানটা ছিল খুবই সজাগ। মা বলতো—কুটুমের বাড়ি যখন তখন যেতে নাই।

পরে অবশ্য আর যায়নি। কে জানে এখন যদি এসে থাকে তাই খবরই নিতে ইচ্ছা করে ! এছাড়া বীণার কথাও মনে পড়ে।

এই চরম বিপদের দিনে একমাত্র বীণাই তার যেন একান্ত নির্ভর। ওর কথা—সান্নিধ্য তার হতাশ মনে কি আশার বাণীই এনে দেবে। তাই ওদিকের পথই ধরে সমীর।

বীণার মা সেদিনের সমীর বীণার ঘটনাটা দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল। জানে সে সমীরের অবস্থা। পড়াশোনাও করেনি। বীনার মুখেই শুনেছে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেশে। দিনভোর কি করে তার ঠিকঠিকানা নেই। সেই বাজে ছেলেটার এই দুঃসাহসে চমকে উঠেছিল বীণার মা। আরও অবাক হয় বীণার ব্যবহারে। কলেজে পড়ছে, মোটামুটি ভালো অবস্থা তাদের। তার জন্য এরা ভালো লেখাপড়া-জানা অবস্থাপন্ন পাত্রের সন্ধানই করছে, আর সেই মেয়ে কিনা ওই রাস্তার বখাটে ছেলেটার সঙ্গে প্রেম করছে ?

সেই সন্ধ্যার ঘটনার পর বীণার মা বীণাকেও বলে—তোর রুচি দেখে অবাক হয়েছি। একটা বখাটে রাস্তার ছেলের সঙ্গে এত মেলামেশা সহ্য করব না।

বীণা বলে—ও রাস্তার বখাটে ছেলে নয় মা। দেখবে ও একদিন বিরাট কিছু হবে।

—ছাই হবে। যা বলি শোন—ওদিকে মাড়াবি না। তোর বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।

বীণা বলে—এখন বিয়ে-থা করবো না।

—তবে ওইসব বেলেল্লাপনা করবি? শেষ কথা বলছি—পরীক্ষা হয়ে গেছে। কলেজ নাই। বাড়ি থেকে হুটহাট বেরুবে না। বিয়ের কথা পাকাই করছি। সুপাত্র, ভবানীপুরে বাড়ি—ভালো চাকরি করে, শিক্ষিত—

বীণার মাও সেই ব্যবস্থাই পাকা করে এসেছে। বীণাকে বের হতেও দেওয়া হয় না। দাদারাও কড়া নজর রেখেছে ওর উপর। বীণাও বুঝেছে তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। সমীরের কথা মনে পড়ে। প্রায়ই নিঃসঙ্গ বীণা। কে জানে কেমন আছে সে।

হঠাৎ সেদিন ছাদ থেকে নিচে চেয়ে দেখে সমীর আসছে তাদের বাড়িতে। খুশিতে মন নেচে ওঠে বীণার। মনে হয় ও যেন কোন রাজপুত্তুর, বন্দিনী রাজকন্যাকে সে এই কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে কোন এর সাতরঙা রামধনুর দেশে।

সমীর গেট পার হয়ে বারান্দায় উঠতে যাবে সামনে বীণার দাদাকে দেখে দাঁড়ালো। ক'দিন থেকে সমীর পাগলের মত মাকে খুঁজে ফিরছে। স্নান খাওয়া নেই, ময়লা জামাকাপড়, চুলেও তেল পড়েনি। রুক্ষ চেহারা। একেবারে যেন পথেরই মানুষ।

বীণার মা ছেলেদেরও সব কথা জানিয়ে রেখেছে। বড়ছেলের সামনেই পড়েছে সমীর। বড়ছেলের মেজাজও বেশ চড়া। ইদানীং ব্যবসায়ে দুনম্বরী করে কাঁচা পয়সাও কিছু পেয়েছে তাই ধরাকে সরা দেখে।

বড়বাবু বলে—এখানে কেন?

সমীর কিছু বলার আগেই বড়বাবু এসে সমীরের জামার কলার ধরে মুখে একটা থাপ্পড় মেরে গর্জে ওঠে—সেই সন্ধ্যায় আমি বাড়িতে ছিলাম না, আমার বোনকে বেইজ্জৎ করে তাই পার পেয়ে গেছো। আমি থাকলে তোমাকে জ্যান্ত এখানে পুঁতে দিতাম রাস্কেল, একটা রাস্তার ছেলের এত বড় সাহস। আবার এসেছো?

সমীর বলার চেষ্টা করে— আমার মা—

গর্জে ওঠে বড়বাবু—জাহান্নামে যাক তোমার মা।

—কি যা তা বলছেন?

বড়বাবু আর একটা ঘুষি মেরে ওকে ছিটকে ফেলে গর্জায়—নবাব! গেট আউট—গেট আউট। নাহলে মেরে লাশ বানিয়ে দেব। যাও।

সমীর কথা বাড়াতে চায় না। সেও এই ধরনের আত্মীয়দের কাছে অবজ্ঞা অবহেলা পেতে অভ্যস্ত, কিন্তু এভাবে অপমানিত হবে ভাবেনি। মা যে এখানে নেই—থাকতে পারে না তো বেশ বুঝেই ধীরে ধীরে বের হয়ে এল।

বীণার মাও এসে পড়ে। সে ছেলের বীরত্ব দেখে খুশিই হয়। বলে—ঠিক করেছিস। মেয়েটার সর্বনাশ করার মতলব ওর।

বীণা ওঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। দেখেছে এ বাড়ির মানুষদের নিষ্ঠুর নির্মমতাকে। মা বলে বড়ছেলেকে—ওদের কথা দে বাপু, মেয়েটার বিয়ে থা

দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। রীনাকেও বলছি—ওর ওই হতচ্ছাড়া দেওরকে সামলাক।

সমীরের কাছে এই জগৎ যেন শূন্য হয়ে গেছে। পথে পথেই ঘুরছে এখন। বীণাও আসেনি তার সামনে। ওরা তাকে মেরে বের করে দিয়েছে।

সমীর গঙ্গার ধারে বসে আছে, কে জানে ওরই অতলে মা কোথায় হারিয়ে গেছে। না হয় কোথাও এত বড় পৃথিবীতে হারিয়ে গেল তার জন্যই। নিজের উপরই রাগ হয়। সেই কর্মক্ষমতা উদ্যম সব যেন হারিয়ে গেছে। বাড়িতেও সবদিন ফেরে না। রাতে গিয়ে ওই তক্তপোশে এখন একাই পড়ে থাকে।

ঘুমের ঘোরে হাতটা বাড়ায়—মনে হয় মাকে পাবে। কিন্তু কেউ কোথাও নাই।

ভোরে আসে গঙ্গার ধারে, দলে দলে মহিলা বৃদ্ধরা আসে গঙ্গাস্নান করতে। সমীর খোঁজে তাদের মধ্যে তার হারানো মাকে, কিন্তু মাকে সে পায় না।

বেলা বাড়ে—স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গঙ্গার ধারে। ন্যাপা আসে মাঝে মাঝে। ইদানীং ন্যাপা আলুপোস্তা-মশলাপোস্তার একজন মস্তান হয়ে উঠেছে। সেইই ছেলেদের কাজে লাগায়, মহাজনদের চমকে ওদের রেটও বাড়ায়। দলবল নিয়ে দরকার হলে কাজ বন্ধ করে দাবি আদায় করে।

এ হেন ন্যাপাও আসে সমীরের কাছে। কোন দোকান থেকে শালপাতার ঠোঙায় গরম কচুরি, ডাল এনে বলে—ভোগ চড়াও গুরু।

সেদিন সমীরের কপালে নাকে কাটা ফোলার কালশিটে দেখে অবাক হয় —কেউ ঝেড়েছে গুরু তোমাকে ?

সমীর বলে—কেন ?

—ওসব মারেরই দাগ। আমি খুব ভালো করে চিনি। বল কোন শালার এতবড় হিম্মৎ। নাম বলো—ব্যাটাকে আজই আড়ং ধোলাই দিয়ে আসি। পোস্তার ন্যাপার গুরুর গায়ে হাত! বলো—ন্যাপা তা পারে।

সমীর বলে—থাম তো। ওসব কিছু নয়।

—চেপে গেলে গুরু। নাও—খাও।

সমীর বলে—খেতেও ইচ্ছা হয় না রে। আমাকে খাওয়াবার জন্যই মা তার ভাগটা ছেড়ে দিয়ে গেল।

ন্যাপা বলে—মা কেমন জিনিস জানি না, তবে মনে হয় দুনিয়ায় মায়েরাই সব। নাহলে তোমার মত কঠিন মাল এমনি ভেঙে পড়তো না। তা গুরু, মা তোমাকে বাঁচার জন্যই রেখে গেছে তো ?

সমীর বলে—তাই রে!

—তা মায়ের সেই আশায় তো গুলি মারছো গুরু ? সব ছেড়েছুড়ে কি কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ? হেরে পালাবে সংসার ছেড়ে ?

চাইল সমীর।

ন্যাপা বলে—কাজকর্ম ব্যবসাপত্তর শালা লাটে তুলে দিয়ে এবার ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবে ? মায়ের আশা তাতে পূরণ হবে ? এইসব করছো ?

সমীর ন্যাপার দিকে চাইল। আট দশদিন সে মায়ের জন্যই ঘুরছে পথে পথে। কাজকর্মও দেখেনি। ন্যাপা বলে—এসব ছেড়ে কাজকর্ম করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও গুরু। শালা সেই মনে দুনিয়ার পিছনে লাথি মেরে বাঁচার চক্কর চালাতে হবে, তবে না মরদ। আরে মা-বাপ—তিনকুলে কেউ নাই ন্যাপার, সে যদি বাঁচতে পারে তুমি পারবে না ? তার থেকে হাজার গুণ বড় হয়ে বাঁচবে, তোমার মা যেখানে থাকুক খুশী হবে। আশীর্বাদ করবে। তাই বলছি—ফিন্ চালু হয়ে যাও গুরু।

ন্যাপার কথাগুলো সমীরের মনে কি আশার আলো আনে।

আবার ব্যবসার কাজে বের হয়। কিন্তু এই দশ পনেরো দিনেই বাজার যেন বদলে গেছে। এতদিন আসেনি। দোকানদাররা ভেবেছিল ব্যাটা ভেগেছে। তার মাল বিক্রী করে টাকা নিজেরাই খেয়ে ফেলেছে আর সে টাকা সহজে দিতেও চায় না। ফলে কোম্পানীর ঘরে দেনা পড়ে যায়।

ভবদেববাবু বলে—তোকে মাল আর দিই কি করে বল ? এত টাকা বাকী। এখন টাকা না পেলে আমাকেই কোম্পানী ধরবে। টাকা আদায় করে আন। নাহলে তুইও ডুবলি—আমিও মলাম বাপধন।

কিন্তু দোকানদাররা এখন তাকে চেনেই না। সমীর আসা যাওয়াই করে, এদিকে হাতও খালি হয়ে আসছে।

শ্যামবাজার—কলেজ স্ট্রীট—শিয়ালদা অঞ্চলের দোকানীরা বলে—মাল দাও, টাকা পাবে।

—নাহলে বকেয়া টাকা পাবো না ?

—দেখি। তারা এড়িয়ে যায়।

সমীর এবার বিপদেই পড়ে। সব শুনে ন্যাপা বলে—শালাদের দোকানে চলো তো—

ন্যাপাই দলবল নিয়ে তাদের হুমকি দিয়ে কাউকে চমকে কিছু টাকা আদায় করে মাত্র। তাতে ভবদেবের দেনা শোধ করে সমীরের আর কিছুই থাকে না।

কি করবে ভাবছে সমীর।

সুবীরের দোকান দুতিনটে। তাতে একা সুবীর সামলাতে পারে না। বিডন স্ট্রীটের দোকানে বিক্রী ভালোই হয়, উত্তর কলকাতায় বিড়ির তামাক ভালো চলে। বিশ্বস্ত লোক না পেলে চলবে না। এমনি দিনে সুবীরই কথাটা ভাবে।

রীনাও বলে—ছেলেটা তো বসে বসে খাচ্ছে, ওকেই দোকানে বসাও, ওই সমীরকে।

সুবীরও ভাবেনি কথাটা। আজ সেও যেন পথ পায়।

সমীরের গেঞ্জির ব্যবসা লাটে উঠেছে। এত স্বপ্ন নিয়ে সে ভাগ্য গড়তে নেমেছিল, সব এক নিষ্ঠুর আঘাতে চুরমার হয়ে গেল। মায়ের কথা মনে পড়ে। এদের দয়া কুড়িয়েই বাঁচতে হবে তাকে। নাহয় আবার আলুপোস্তার সে হাড়ভাঙা খাটুনিই খাটতে হবে।

এই বাড়ির ভাতও রোচে না। মা যেন নিজের অন্ন তাকে দিয়ে চলে গেছে কোন অজানায়। এ অন্নে মায়ের চোখের জল মিশে আছে।

সেদিন সুবীরই বলে—নিজেদের ব্যবসাতেই কাজ কর। লোকে খেয়ে যাচ্ছে, তুই বিডন স্ট্রীটের দোকানটা দেখাশোনা কর, দুজন কর্মচারী আছে, তাদের উপরও নজর রাখবি। ক্যাশে বসবি তুই। এ ব্যবসা শেখ—ব্যবসার কাজ জানা থাকলে তোর কাজের, টাকার অভাব হবে না। দোকানে বসবি, বাড়িতে থাকবি খাবি। হাতখরচা বাবদ শখানেক করে পাবি।

সমীরের কাছে ওই কাজটাই এখন খুব দরকার। তবু দোকানে বসবে, কিছুটা ওই ব্যবসার হালও বুঝতে পারবে। আর দাদার অন্ন সে বসে খাচ্ছে না, এটাও ভাবতে পারবে, কিছুটা স্বস্তি পাবে। তাই সমীর রাজী হয়ে যায়।

সকালে চাবি নিয়ে গিয়ে দোকান খোলে বেলা নটায়, তারপর বেলা দুটোয়, দোকান কর্মচারীদের হাতে রেখে খেতে আসে বাড়িতে। খেয়েদেয়ে চারটে নাগাদ দোকানে গিয়ে আবার আটটায় হিসাব মিলিয়ে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি ফিরে দাদাকে ওসব বুঝিয়ে দিয়ে তবে তার ছুটি হয়।

সমীর বুঝেছে যখন যেটা করতে হয় সেটাকে পুরো মন দিয়েই করতে হয়। কাজে নিষ্ঠার দরকার। সেখানে ফাঁকি দিতে নাই। তাই দোকান নিয়েই থাকে সে।

এর মধ্যে সুবীরও বুঝেছে তার ভাই সত্যিই কাজের ছেলে। দোকানে কর্মচারীরা আর দুনম্বরী মাল বেচার সুযোগ পায় না—ভালো মাল পায় বলে পুরানো খদ্দেররা ফিরে আসছে। দোকানে চুরিও বন্ধ হয়েছে। ফলে বিক্রীও হুহু করে বাড়ছে।

রীনা তবু যেন খুশি নয়। বলে সে—এখানে বসে খাচ্ছে তোমার ভাই, তাকেও মাস মাইনে দিতে হবে?

সুবীর ব্যবসা বোঝে। বলে সে—ক'মাসেই দোকানের লাভ দ্বিগুণ হয়েছে। হাতখরচার ওটুকু টাকা না দিলে ও তো ডবল চুরি করবে। অমন একজন লোক রাখতে গেলে এ বাজারে হাজার টাকা মাইনে দিতে হতো। জানো? আমি জানি কাকে কি দিয়ে বেশী কামাতে হয়।

রীনা তবুও বলে—একজনের খাই-খরচা ধরো বাজারে।

সমীরের দোকানের কাজে, ব্যবসার কাজে যেন সহজেই মাথা খোলে। মালপত্র বেচার ব্যাপারে খদ্দেরকে সে বশ করে কথায়।

তার দোকানের ওদিকেই একটা বড় সাইকেলের দোকান। দোকানের মালিক হরিদাস মুখুয্যের বিরাট কারবার। সাইকেলের টায়ার টিউব—সাইকেল রিক্সার এজোন্স—টায়ার টিউব এসবও বেচে তারা।

তাদের ওখানে মফঃস্বলের অনেক খদ্দের আসে। ডানলপ কোম্পানীর থেকে টায়ার টিউবের এজেন্সী নিয়েছে সে। আর তাদের চিফ এজেন্ট মিঃ জয়শোয়াল মিলে ওরা এই টায়ার টিউবের হোলসেল ব্যবসাও চালু করেছে দুজনে।

জয়সোয়ালবাবুও দেখে সমীরকে। ছেলেটি খুবই কাজের। আর সৎ। দাদার ওই মরা দোকানকে সে নতুন করে বাঁচিয়েছে, আবার সেখানে রমরম ব্যবসা চলেছে।

জয়সোয়ালের নজর পড়ে সমীরের উপর। মাঝে মাঝে ওর দোকানে এসে বসে। সমীরের সঙ্গে কোন খরিদ্দারের তখন মাল নিয়ে কথা হচ্ছে। সমীর তাকে তামাকের ইতিহাস—তার মিশ্রণ উৎপাদন শৈলী নিয়ে গভীর আলোচনা করে তাকে ওই মালই মণে দশ টাকা বেশী চাপিয়ে গছিয়ে দিল।

জয়সোয়াল বলে—আরে তুমি তো বহুৎ আচ্ছা সেলসম্যান আছো সমীর।

সমীর বলে—মাল তো গছাতে হবে। তবে ও ঠকবে না, ঠকাতে চাই না। ঠকালে ব্যবসাই চলবে না।

—জরুর। ই বহুৎ জরুরী বাত।

জয়সোয়ালও ছেলেটার এলেম দেখে খুশী হয়। তার ব্যবসার রীতি-নীতিকেও সে শ্রদ্ধা করে।

কিন্তু তার কণামাত্র দাদার কাছে পায়নি সমীর। তবু সমীর দোকানে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। দোকান থেকে বের হতে প্রায় দুটো আড়াইটা বেজে যায়।

সকাল থেকে এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট না হয় চার পয়সার মুড়ি, এতেই তাকে দুপুর অবধি থাকতে হয়। দোকানের তহবিল থেকে চারটে পয়সাও সে নেয় না। দরকার হলে জল খেয়েই থাকে।

বাড়িতে তখন বৌদি নিদ্রামগ্ন। মা নেই। তার জায়গায় একটা কাজের মেয়ে আছে। সে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গতে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দেয় সমীরকে।

সমীর স্নান করে খেতে বসে। ওদিকের একটা টুলে কলাই করা থালায় তার জন্য কড়কড়ে চাট্টি ভাত—একটু ডাল তাও জলের মত, সঙ্গে কুমড়ো টুমড়োর ঘ্যাঁট মত। ভাতও ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে গেছে। মাছের মুখও দেখে না। অবশ্য বাড়িতে মাছ মাংস ডিম সবই আসে, সে সব উপরতলার জন্য। তার জন্য ওইই বরাদ্দ। খিদেও মেটে না সমীরের ওই ভাতে। আর চাট্টি ভাত যে চাইবে তার জন্য সামনে কেউ নাই।

মনে পড়ে মায়ের কথা। মা তার খাবার গরম করে দিত—তার জন্য নিজে না খেয়ে ভাত রাখতো!

আর সে সব স্বপ্নই। মাও হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য—মায়ের আর কোন খবরই পায়নি সে।

খাওয়ার পর ওই তক্তপোশে একটু গড়িয়ে নেয়। মনে হয় মা ফিরে এসেছে। বগলে পুঁটুলি। মুখে মিষ্টি হাসি। বলে—তীর্থে গেছলাম রে।

বড় সাধ ছিল শ্রীক্ষেত্রে যাবো। বাবা জগন্নাথ দর্শনে, কন্যাকুমারী রামেশ্বরম যাবো, সুযোগ পেলাম চলে গেছলাম।

সমীর মাকে জড়িয়ে ধরে।—আমাকে ফেলে আর কোনদিন কোথাও যাবে না মা?

মা বলে—না রে।

হঠাৎ কার কর্কশ স্বরের ডাকে চমক ভাঙ্গে। বড়বৌদি ডাকছে—আর কত ঘুমুবে? দোকানে যেতে না? এ্যাঁ।

ধড়মড় করে ওঠে সমীর। কোথায় সেই স্নেহময়ী মা। সামনে ওই নিষ্ঠুর মহিলা। সমীর উঠে পড়ে। দোকানে যেতে হবে।

সে যে ওদের চাকর, তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নাই সেইটাই পদে পদে বুঝিয়ে দিতে চায় বৌদি-দাদাও। সেদিন দোকানে রয়েছে। হঠাৎ বীণাকে আসতে দেখে চাইল।

—তুমি।

বীণা কলেজ থেকে ফিরছে। বীণা বলে—আর যাওনি।

সমীর বলে—দেখছ তো কাজে ব্যস্ত। সময় পাই না।

বীণা দেখছে ওকে। বলে—তোমার নিজের ব্যবসা কেমন চলছে?

সমীর নিজের সেই চরম ব্যর্থতার কথাটা বলতে লজ্জা পায়। বলে সে—চলো কথা হবে।

দোকানের ছেলেটাকে বলে—একটু দোকান দেখিস—আসছি।

বীণাকে নিয়ে বের হয় হেদোর দিকে।

আজ বীণারও অনেক কিছু বলার আছে। বীণা দেখেছে বাড়িতে তার বিয়ের কথা পাকা হতে চলেছে। তাকে দেখতেও এসেছিল। সে বের হতেই চায়নি ওদের সামনে।

বড়দি রীনাও গেছল। সে দেখেছে বীণার জেদ। সে বলে—বিয়ে করবো না। এম-এ পাশ করার পর ভাববো।

মা বলে—ওরা এসেছে, চল।

রীনাও বিরক্ত হয়। বলে সে—বিয়ে করবি না কেন?

মা বলে—ওর মাথায় ভূত চেপেছে।

—ভূত!

রীনাকে এখন বীণার সঙ্গে সমীরের মেলামেশার কথাটা খুলে বলতে পারে না মা। বলে—হ্যাঁ, পরে শুনবি। ওই ভূত আমি নামাবোই ঘাড় থেকে। চল।

বীণাকে যেতে হয়। মোটা নাড়ুগোপাল মার্কা ছেলেটাই নাকি বর। বীণা রেগে ওঠে। বরের বাবা মাও এসেছে। তারা হাঁটিয়ে, চুল খুলে দেখে মেয়েকে। গোড়ালিও দেখে, মেয়ের খড়ম পা কিনা তাও দেখে। খড়ম পায়ের মেয়েরা নাকি দজ্জাল হয়।

শাশুড়ী প্রশ্ন করে—রাঁধতে পারো ?

বীণাকে যেন ওঘরে রান্নার জন্যই নেওয়া হচ্ছে।

বীণা এসেছে সমীরের কাছে। বলে সে—ওরা বিয়ের নামে আমাকে বলি দিতে চায় সমীর। ওখানে বিয়ে করতে পারবো না। তুমি আমাকে বাঁচাও।

চমকে ওঠে সমীর—কি বলছ বীণা ? আমার নিজের পায়ের তলে মাটি নেই। দাদাদের দয়ায় কোনমতো পড়ে আছি ওদেরই আশ্রয়ে, তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবো ?

—যেখানে হোক। ওবাড়ি থেকে চলে আসবো। তোমার সঙ্গেই নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু করবো।

বীণা জেদভরা স্বরে কথাগুলো বলে। কিন্তু সমীর বলে—মাথা গরম করো না। এ কোনমতেই সম্ভব নয়। জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করো না বীণা। তুমি বাড়ি যাও—

বীণার চোখে জল নামে।

সুবীর হঠাৎ বিকালের দিকে দোকানে এসে পড়ে। দেখে সমীর দোকানে নাই। দোকানের ছেলেটাও দোকান ফেলে রেখে ওদিকের চায়ের দোকানে চা খেতে গেছে। দোকান ফাঁকা। সমীরও নাই।

সুবীরের মন মেজাজ ভালো নাই। ইদানীং তার ব্যবসাতে বেশ মন্দাই চলেছে। যদিও এ দোকান ভালোই চলে—অন্য দোকানে লোকসান চলেছে। সেখানেই বকাবকি করে এসেছে এখানে, কিন্তু এখানের এই হাল দেখে চটে ওঠে।

দোকানের ছেলেটা ফিরেই মালিককে দেখে বলে—চা খেতে গেছলাম বাবু।

—সমীর কোথায় ? সেও কি এখনও চাই খাচ্ছে ?

সুবীরের কথায় ছেলেটা বলে—আজ্ঞে না। এক দিদিমণি বেশ ফর্সামত এলো তার সঙ্গে বেইরেছে, আসবো বলে গেছে।

আগুনে যেন ঘি পড়ে। সুবীর ফুঁসে ওঠে—দিদিমণিদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে ? হারামজাদার এদিকে নাই ওদিকে আছে। তাকে বলে দিস—দোকান বন্ধ করেই যেন বাড়ি চলে যায়, তারপর দেখছি তাকে। পেটে ভাত নাই জলে কপ্পুর।

সুবীর ট্রাম ধরে শ্যামবাজারের দিকে যাবে। হেদোর কাছে ট্রামের জন্য আসছে হঠাৎ নজরে পড়ে বেঞ্চে বসে আছে বীণা আর সমীরই। বীণার চোখে জল। দুজনে গদগদ হয়ে কি কথা বলছে।

সমীর বীণা যে এত ঘনিষ্ঠ—গোপনে তাদের সাক্ষাৎ হয়, বীণা বালিগঞ্জ থেকে কলেজে এসে সমীরের সঙ্গে এখানে বসে আড্ডা দেয় এসব কথা জানতো না সুবীর।

রীনার মুখে শুনেছিল বীণা নাকি কোন একটা বদ ছেলের পাল্লাতে পড়েছে, বিয়ে করতে ও রাজী নয়। সেই ছেলেটাকেই বিয়ে করতে চায়, এ নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি শুরু হয়েছে।

কিন্তু সেই ছেলেটা যে তারই বেকার বখাটে ওই গলগ্রহ ভাই তা জানতো না। এসব কথা জানাজানি হলে শ্বশুরবাড়িতে তার সম্মান চলে যাবে। মুখ দেখানো ভার হবে। এ নিয়ে শাশুড়ী, সম্বন্ধীরা তাকেই পাঁচ কথা শোনাবে।

সুবীর আর এগোলো না। মনে হয়, গিয়ে সমীরকে চড় থাপ্পড় মেরে উচিত শিক্ষাই দেবে, কিন্তু পারে না। একটা ট্রাম আসতে রাগ চেপে উঠে পড়ে তাতে।

রীনাকেই বাড়ি ফিরে কথাগুলো বলে সুবীর। রীনাও বাড়িতে মায়ের কাছে বীণার এমনি সব কাণ্ডের কথা শুনেছিল কিছুটা। এখনও যে এইসব চলছে তা ভাবেনি রীনা।

বীণা বাড়ি থেকে কলেজে যাবার নাম করে এখানে এসে দুজনে দেখা-সাক্ষাৎ করে! ওর জন্যই বিয়েতেও রাজী নয় বীণা।

সমীরের মত বখাটে ছেলে সবই পারে।

রীনাও কথাটা শুনে বলে—এর বিহিত করতেই হবে। নাহলে মায়ের কাছে মুখ দেখাতে পারবো না। তুমি ভাইয়ের হয়ে কোন কথা বলবে না। ভালো হবে না। ওই বখাটে বেকার হতভাগা আমার বোনের জীবন নষ্ট করবে—ওর সর্বনাশ করবে, এ হতে দেব না।

সমীর ভাবেনি যে তার বাড়িতে আজ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণই ঘটবে। বীণাকে সে কোনমতে নিরস্ত করেছে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার থেকে। মেয়েরা যে এত বেপরোয়া হতে পারে তা জানা ছিল না সমীরের।

ওকে বুঝিয়ে বাড়ি ফেরার বাসে তুলে দিয়ে দোকানে এসে দাদার আসার খবরও পায়। তাকে দোকানে পায়নি। অবশ্য ছেলেটা বলে—আমি বড়-বাবুকে বলেছি তুমি তাগাদায় গেছো।

সমীর তাই জানে না যে বাড়িতে একটা নিদারুণ ঝড়েরই প্রস্তুতি চলেছে। সে বাড়ি ঢুকতেই দেখে উপরের ঘরে আলো জ্বলছে। সারা বাড়িটায় একটা স্তব্ধতা নেমেছে। সমীর চাবি খাতাপত্র দোকানের ক্যাশ দাদাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে সিঁড়ির নিচে তার তক্তপোশে এসে বসে।

আজও তেমনি উপরে উঠে যায়। সুবীর চাইল। রীনাও দুচোখে যেন নীরব অগ্নিজ্বালা ফুটে ওঠে।

সুবীর চাপা স্বরে বলে—দোকান ছেড়ে কোথায় যাস? কে এসেছিল দোকানে?

সমীর চমকে ওঠে। কি জবাব দেবে ভাবছে। সুবীর গর্জে ওঠে—জবাব দে?

রীনা বলে—ও কি জবাব দেবে ? সে মুখ আছে ? লেখাপড়া শিখলো না, বেকার বাউণ্ডুলে, দাদার ঘাড়ে বসে খাচ্ছে আর নষ্টামি করছে। মিজ্‌কেপোড়া চুপ শয়তান—ওর পেটে পেটে বদ বুদ্ধি।

সমীর বৌদির কথায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ওর সব ব্যবহার, মায়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা, তার প্রতি সব দুর্ব্যবহার সে সহ্য করেছে। মা ওর জন্যই চলে গেছে। কে জানে বেঁচে আছে কি নেই।

সেই জ্বালাটা আজ সমীরের কণ্ঠে প্রতিবাদ হয়ে ফুটে ওঠে।

—কি বলছো বৌদি।

রীনা বলে—ঠিকই বলছি। একটা ভালো মেয়ের সর্বনাশ করছো ?

—সর্বনাশ !

—নয়তো কি ? বীণা আসে না তোমার কাছে ? তুমিও ও বাড়িতে বেহায়ার মত যেতে। মায়ের চোখেও পড়েছে তোমার ইতরামি। ছিঃ ছিঃ। দাদারাও জানে সব।

সমীর বলে—এসব বাজে কথা।

সুবীর গর্জে ওঠে—চোপ। এক চড়ে মুখ ভেঙ্গে দেব। নিজের ঠিক-ঠিকানা নাই, পরের ঘাড়ে খাস, আবার একটা ভদ্র ঘরের মেয়ের সর্বনাশ করার মতলব।

রীনা তীক্ষ্ন বিদ্রূপের স্বরে বলে—বামনের চাঁদ ধরার শখ। নিজের ক্লাশ এইট অবধি বিদ্যে, বেকার, ও প্রেম করছে বি-এ পড়া মেয়ের সঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে ? ঘাড় ধরে বের করে দেব বাড়ি থেকে—দুদিন পথে পথে না খেয়ে ঘুরলে তখন প্রেম করা ছুটে যাবে।

সুবীর জানে এখুনি ওকে বের করে দিলে তারই সমূহ ক্ষতি। ওই আমদানীর দোকানও বন্ধ করে দিতে হবে। তাই ওদিকে না গিয়ে গার্জেন সুলভ কণ্ঠে বলে—ওসব ছেড়ে ব্যবসার কাজে মন দে। আর যেন এসব কোন দিন না শুনি।

রীনা বলে—ভাইকে বোঝাবার চেষ্টা করো, নাহলে ওর বরাতে অশেষ দুঃখ আছে বলে দিলাম। বীণার সঙ্গে ফের মিশলে আমিই ওকে এখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো। আমার বোনের নখের যুগ্যি হতে সাতজন্মো তপস্যা করতে হবে, বুঝেছো ?

সমীর নেমে আসে। বেশ বুঝেছে বড়বৌদি মাকে তাড়িয়েছে—এবার তাকেও তাড়াবে। তাই সমীর এবার নিজেই নিজের পথ খুঁজে নেবে। কোন পথ পেলে এখানে আর থাকবে না। যতদিন না পাচ্ছে তাকে মুখ বুজেই থাকতে হবে।

বীণার কথা মনে হয়। সমীর তাকে সব কথাই বলেছে। নিজের করুণ অবস্থার কথাও গোপন করেনি।

বীণা বলেছিল—বি-এ পাশ করে একটা স্কুলে চাকরি পাবো। যেভাবে হোক দুজনের চলে যাবে। তার মধ্যে তুমিও ব্যবসাতে দাঁড়িয়ে যাবে।

কিন্তু সমীর রাজী হয়নি—তোমাকে ওই সুখের পরিবেশ, প্রাচুর্য থেকে নিজের স্বার্থে অভাবের নগ্নতার মাঝে আনতে পারবো না। যেদিন ভুল ভাঙ্গবে সেদিন তুমিও বুঝতে পারবে—না বীণা।

বীণাকে চোখের জলেই বিদায় দিয়েছিল সমীর বীণার মঙ্গলের জন্যই। ভালোবাসে সে বীণাকে, তার নিঃস্ব রিক্ত জীবনে বীণা একটি আলোক-বর্তিকার মতই এসেছিল। কিন্তু তাকে গ্রহণ করার মত সামর্থ্য ছিল না সমীরের। এ তারই চরম দুর্ভাগ্য।

তার জীবন থেকে সবই হারাবার পালাই এসেছে। মা চলে গেছে, জীবনে সুখ শান্তি সম্মানের মুখও দেখেনি। পড়াশোনা করার অধিকাও তার নাই। সে দেখে তারই বয়সী ছেলেরা যখন পার্কে খেলা করছে—স্কুলে যাচ্ছে, সেজেগুজে বেড়াতে বের হয়েছে সে তখন রুটির লড়াই-এ সামিল হয়েছে।

আজও সকাল থেকে রাত্রি অবধি খাটছে ওই আহার আর এই সিঁড়ির তলায় রাস্তার কুকুরের মত পড়ে থাকার জন্যই। তবু একজন ছিল—যে তার দুঃখের জীবনে এতটুকু আশা-স্বপ্ন এনেছিল। সেই বীণাকেও কেড়ে নিয়েছে ওরা। কারণ তার কিছুই নাই। টাকা-প্রতিষ্ঠা তার নাই।

ওই টাকা-প্রতিষ্ঠাই অর্জন করতে হবে তাকে সৎভাবে খেটে। সমাজে একদিন তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই হবে।

সমীর দোকানে যায়।

সেদিন মিঃ জয়সোয়ালও এসেছে ওই মিঃ মুখার্জিদের দোকানে। এখন বাজারে নতুন ধরনের টায়ার টিউব এসেছে। কোন বিলেতী কোম্পানী এখানে বিরাট কারখানা করে রবারের টিউব—আর তাতে পাম্প করে হাওয়া ভরার যন্ত্র বের করেছে। এখন সারা দেশে—দূর পল্লীতেও সাইকেল রিক্সা, ভ্যান আর সাইকেলের খুবই চল হয়েছে।

লোকজন যাতায়াত করে, মালপত্রও আনা-নেওয়া করা হয়। ওর প্রসার আরও বাড়ছে। তাই টিউবপাম্প বিক্রীও বাড়ছে মফঃস্বলে।

জয়সোয়াল তারই এজেন্সী নিয়েছে। তার দরকার বেশ কিছু সেলস-ম্যানের, যারা বাইরে বাইরে ঘুরে এই জিনিস বিক্রী করবে।

কথাটা সমীরও শোনে। দোকানে বসে বিড়ির কড়া—মিঠেকড়া তামাক বিক্রী করায় তার ক্লান্তি এসেছে। গেঞ্জি ব্যবসাটা চলছিল ভালোই, এতদিন ওই লাইনে টিকে থাকলে সে একটা জায়গায় পৌঁছতে পারতো, কিন্তু তা হয়নি। মা চলে যাবার পর সব উদ্যম তার হারিয়ে গেছল।

তবু সেই অভিজ্ঞতাটা তার আছে। ওই নতুন মালের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সমীরের মনে হয় ওসব জিনিসের কাটতি আরও বাড়বে। বাজারও বাড়বে। তাই নিজে ওই লাইনে কাজ শুরু করতে চায়। দাদা-বৌদির এখানে থাকতে মন চায় না।

ভাবছে কথাটা। জয়সোয়ালকে সমীর শুধোয় - ওতে আয়পয় হবে ?

হাসে জয়সোয়ালজী। বলে—ওই বিচে তো গাড়ি বাড়িভি করেছি। তুমি ইয়ং ম্যান, বাইরে ঘুরলে জরুর পয়সা পাবে।

—কিন্তু মাল কেনার টাকা তো নাই।

সমীরের কথায় জয়সোয়ালজী বলে—শোচো, কাম করো তো তুমারে বারে হম্ ভি শোচে গা। মাল নেবে, বিক্রী হলে দাম আমার, লাফা তুমার। তবে কলকাত্তার বাহার যেতে হবে হামেশাই—

এমনি দিনে সমীর বাড়ি ফিরে একদিন শোনে রঞ্জনার মুখে—মাসিমণির বিয়ে। আমরা সবাই বিয়ে বাড়ি যাবো কাকু। কি সুন্দর কার্ড করেছে দ্যাখো।

রঞ্জনা সুন্দর কার্ডটা তার কাছেই রেখেছিল সেটা এনে দেখায় এবার কাকুকে। প্রজাপতি আঁকা সোনার জলে লেখা দামী কার্ড। লেখাটা যেন জ্বলজ্বল করছে।

বীণার বিয়ে হচ্ছে সেই গোমড়ামুখো ছেলের সঙ্গেই। ছেলে বি. কম পাশ করা। এখন কোন ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি করে। কলেজ স্ট্রীটের দিকে নিজেদের বাড়ি। কলকাতার বনেদী পরিবার।

রীনা বলে—বিরাট ঘরে বিয়ে হচ্ছে বীণার। বরও দারুণ। বি. কম পাশ, অফিসার। কথাটা যেন সমীরকে শুনিয়েই বলে।

কত রোজগার ওই অফিসারের তা জানে না সমীর। তবে বীণা তার জীবন থেকে চিরদিনের মত সরে গেল—বীণাকেও ওরা কেড়ে নিল তা বুঝেছে সমীর।

তার জীবনে সবকিছু হারাবারই পালা। এই দুনিয়ায় কেউ সহজেই অনেক কিছু পায় আর তার মত অভাগাদের সর্বস্বই হারিয়ে যায়।

রাতে ঘুম আসে না। বড়বৌদি-দাদা, ভাইপো প্রবীর, রঞ্জনা সবাই সকালেই বিয়ে বাড়িতে গেছে। বীণার বিয়ে।

একাই রাতে ওই সিঁড়ির নীচে তক্তপোশে পড়ে আছে সমীর। আজ দুবেলাই বাইরে খেয়েছে? ঘুম আসে না। পাড়াতে কোথায় বিয়ের সানাই বাজছে। ওই সানাই-এর সুরটা সমীরের মনে একটা নীরব হাহাকার আনে। বীণা আজ পরের ঘরেই চলে গেল।

সমীর তাকেও তার জীবনে রাখতে পারেনি। শুধু দিনরাত এই ভাবে বেগার খেটেই জীবন কেটে যাবে তার?

এ পাড়ার খুদুবাদুকে দেখেছে। সে এক বনেদী ধ্বসেপড়া বাড়ির ছোটবাবু সে। ছেলেবেলায় দেখেছে সমীর খুদুবাবু জুড়িগাড়ি চেপে আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবিতে হীরের বোতাম লাগিয়ে হাতে সদ্য ফোটা বেলফুলের মালা জড়িয়ে কোঁচাটা ময়ূরের পেখমের মত ধরে বেড়াতে যেতো। বিয়ে-থাও করেনি। কাপ্তেনী করে।

ক্রমশঃ বাড়ির বেশীর ভাগ বিক্রী করে এখন সব হারিয়ে লুঙ্গি পরে ছেঁড়া ফতুয়া পরে বিড়ি ফোঁকে আর কাশে রকে বসে। চোখমুখ কোটরে ঢুকে গেছে।

ছোটবাবুর দিন শেষ, এখন সে ফৌত। রকে বসে ঝিমোয় আর মাঝে মাঝে কাশে। বলে—নিমতলার পথও ভুলে গেছি রে। মৃত্যুর দিন গুণছে।

তার মনে হয় সে কি ওই ছোটবাবুরই অন্যতম সংস্করণে পরিণত হবে?

কিন্তু না। তাকে ভাগ্য ফেরাতেই হবে। ওভাবে হারিয়ে যাবে না সে। বীণা-রীনাদেরও দেখিয়ে দেবে অর্থ প্রতিষ্ঠা অর্জন সেও করতে পারে। করবেই?

কলকাতায় আর তার কোন বন্ধনই নাই। আর বীণা তার খোঁজ করতে আসবে না। সে এখন অন্য কার ঘরের বৌ। মাও নেই।

সমীর সেদিন আসে জয়সোয়ালজীর কাছে। মিঃ জয়সোয়াল, মিঃ মুখার্জি কিসের হিসাব, সেলস-এর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছে। সমীরকে দেখে মিঃ জয়সোয়াল বলে—কিছু ঠিক করলে?

সমীর বলে—যদি আপনাদের মাল বেচি কত কমিশন দেবেন?

জয়সোয়াল খুশী হয়। এইরকম উদ্যমী ছেলেরই দরকার তার। বলে মিঃ জয়সোয়াল—তোমাকে দেব সাড়ে বারো পার্সেন্ট।

সমীর ব্যবসা বোঝে। বলে—হোটেল খরচা—ট্রেন ভাড়া এতে তো অনেক যাবে, কুড়ি পার্সেন্ট না হলে পোষাবে না।

শেষ অবধি সাড়ে সতেরো পার্সেন্টে রফা হলো ওর সঙ্গে।

জয়সোয়াল বলে—তাহলে সামনের হপ্তা থেকেই কাজে নেমে পড়ো। আমি রানীগঞ্জ-আসানসোল-বরাকর-ধানবাদ লাইনেই কাজ করতে বলি তোমাকে। ওদিকের মার্কেট ভালো। কোলিয়ারী বেল্ট—স্টীল প্ল্যান্ট এলাকা। লোকের হাতে—মায় গ্রামের চাষী মজুরদের হাতেও পয়সা থাকে ওদিকে। ঠিকমত কাজ করতে পারলে দুপয়সা পাবে।

সমীর মনস্থির করেই ফেলে। দাদাকে বলে—আমি কিছুদিন বাইরে যাচ্ছি।

সুবীর অবাক হয়—বাইরে যাবি।

রীনা মনে মনে খুশিই হয়। কারণ এই বাড়িটা বেশ সস্তা দরেই তারা বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছে। তারপর এটাকে আমূল পরিবর্তন করে কিছু রদবদল করে নতুন করে গড়ে তুলবে। তাই সিঁড়ির তলাটাও খালি করানোর দরকার।

ওকে তাই চলে যেতেই বলতো সে। এখন সমীরকে নিজে থেকেই সেই কথাটা বলতে দেখে মনে মনে খুশীই হয় রীনা। তবু লোকদেখানি আন্তরিকতার স্বরে বলে—সেকি! চলে যাবে তুমি? তাই কি হয়?

সমীর দেখছে ওই মহিলাকে। ওর এটা যে শুধু মুখেরই কথা তাই মনে হয়।

সুবীর একটু বিপদে পড়ে। সমীর কাজের ছেলে, সৎ এটা সে জানে। তাকে স্রেফ দুমুঠো ভাতের লোভ দেখিয়ে সে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করায়। তাই

সে চলে গেলে তারই সমূহ লোকসান হবে। সুবীর বলে—চলে যাবি? কেন?

সমীর এড়িয়ে যায়।

—না। ভাবছি মনটা ভালো নাই কিছু দিনের জন্য একটু ঘুরে আসবো এখান ওখানে। কলকাতায় ভালো লাগছে না।

সুবীর বলে—ঠিক আছে। তবে কোথায় যাবি?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি। গেলে বলে যাবো।

সুবীর অগত্যা বলে—তাই বলিস, ও দোকানে কাউকে বসাতে হবে সে ক'দিন।

সমীর চলে যেতে রীনা স্বামীকে বলে—তুমি কি গো? ঘাড় থেকে বোঝা নামতে চাইছে তুমি বলছ থেকে যা। যেতে চায়, যাক। বোঝা হালকা হোক। বাড়িটা কিনেছ, পুরা মেরামত করতে হবে তো।

সুবীর বলে—ও বোঝা নয় রীনা, একে ক্রমশঃ চিনেছি। ও ষোলআনা সৎ, একটা পয়সা এদিক ওদিক করে না। ব্যবসা বোঝে। বছর খানেকের ভিতর সব লোকসান পুষিয়েও লাভের দিকে এনেছে দোকানকে। মনে হয় ভুলই করছো—ও কারোও বোঝা হয়ে থাকবে না। ওইই অনেকের বোঝা বইবে।

রীনা মুখ বাঁকিয়ে বলে—শালিখ চিনেছে গোপাল ঠাকুর। ভাইয়ের জন্যে দরদ কতো? তবু যদি বেকার মূর্খ বাউণ্ডলে না হতো। ও গেলে মা বিপদতারিণীকে পাঁচ সিকের পুজো দিয়ে আসবো। মা, মাগো দয়া করো মা।

সমীর এতদিন কলকাতার মধ্যেই বন্দী ছিল। উত্তর কলকাতাই ছিল তার জগৎ। শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ এই মফঃস্বল অঞ্চলে সে এর আগে আসেনি।

সবুজগাছগাছালি—কত জনপদ—দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত—পাখীর ডাক, তার মনে এক নতুন সাড়া আনে। এত বড় বিশ্বের অঙ্গনে সে একা। চারিদিকে এত সুর-সৌন্দর্য তার মাঝে মানুষ কেন এত ছোট, স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে তা বুঝতে পারে না সমীর।

শহরগুলো ছোট, তার মাঝেই দোকান বাজার, বাসের ডিপো—যাত্রীদের ভিড়। স্টেশনকে কেন্দ্র করেই এদের জীবন।

সমীর বর্ধমানে এসেছে। জয়সোয়াল দুচারজন এজেন্টের নাম দিয়েছে। তাদের দোকানে এসেছে, সমীর কথাবার্তা বলেছে।

বয়স্ক বুড়ো পাকাকাঁচা গোঁফওয়ালা দে মশায়ের বিরাট কারবার। সমীরের কথাবার্তা শুনে বলেন—মাল নিতে পারি, তবে প্রথম দিকে বেশী টায়ার টিউব নেব না।

সমীর বলে—এক নজর রাস্তার দিকে চেয়ে দেখুন। শহরের রাস্তায় সাইকেল, সাইকেল রিক্সার ভিড়ই বেশী, ভ্যানও চলেছে। বলে সমীর—শহরের

মেন ট্রাফিক ওইই, আরও বাড়বে। তাহলে হিসাব করুন এ মালের খদ্দের কমবে না বাড়বে স্যার ?

দে মশাই ছেলেটির কথাতে একটু অবাক হন।—বেশ বলেছো হে ?

সমীর বলেন—আমাদের কোম্পানীই একচেটিয়া এই মাল তৈরী করে। আপনি এজেন্সী নিলে সারা শহর কেন এই অঞ্চলের মধ্যে একাই এসব সাপ্লাই করবেন।

দে মশায় ওর দেওয়া কাগজগুলো দেখছেন। বলেন—ওগুলো রেখে যাও, পরের সপ্তাহে এসো। আমি ভেবে দেখি। আপাততঃ দু ডজন করে টায়ার আর টিউব দিয়ে যাও। দেখি কেমন কাটে মাল।

আরও দুজায়গায় যায় সমীর। তার পরের ট্রেন ধরে চলে যায় আসানসোল।

সমীর অবাক হয়ে দেখছে এই জগৎকে। দুর্গাপুরের বিশাল শাল জঙ্গল —দু দিকে গর্ত মত। ট্রেন চলেছে ওর বুক চিরে। অদম্য অরণ্য। সেই অরণ্যভূমিতে গড়ে উঠছে নতুন এক ময়দানবের রাজ্য। বন এলাকা পরিষ্কার করে তৈরী হচ্ছে বড় বড় বিশাল কারখানা—কত কর্মকাণ্ড চলেছে। ওসব কারখানা চালু হলে এখানেও গড়ে উঠবে বিশাল শিল্পনগরী। গড়ে উঠবে মানুষের উপনিবেশ।

মানুষের সভ্যতা এগোচ্ছে এক তীব্র গতিতে, শহরে থেকে সে এই গতিময় নতুন জীবনকে দেখেনি। মনে হয় এক নতুন সভ্যতার সঙ্গে নতুন ব্যবসার জগৎও গড়ে উঠবে এই পরিবেশে। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হবে। যে ধরতে পারবে কিছু সেইই কোটিপতি হবে।

আসানসোল আসছে। মাটির রং রূপও বদলে গেছে। এখানে লালমাটি আর সে মাটি বন্ধুর। ছোট ছোট টিলা—বনতুলসীর ঝোপ তার মাঝে মাঝে। কোলিয়ারীর হেডগিয়ারগুলো দেখা যায়—বিশাল চাকাটা ঘুরছে। যেন কোন দৈত্যের হাতের লাটাইয়ের মত, ওতে বাঁধা আছে ঢুলি। ঢাকা দেওয়া বাক্সের মত লিফট। ওতেই নামে মানুষজন মাটির অতলে। তুলে আনে কালো সোনা—কয়লার স্তূপ। ওই কয়লাই এখানের প্রধান সম্পদ।

আসানসোল শহরের রূপই আলাদা। এখানে যেন হাওয়ায় পয়সা ওড়ে। সারা শহরে সেই প্রাচুর্যের, কমব্যেস্ততার চিহ্ন। গাড়ি-ট্যাক্সি-সাইকেল-সাইকেল রিক্সা যেন গিশগিশ করছে।

দুচারজন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দোকানদারের ঘরে যায় সমীর। এখানের দোকানগুলোয় বিক্রী-বাটাও বেশী। সারা কোলিয়ারী এলাকার বিভিন্ন ছোট ছোট বাজারের দোকানদাররা এখানে মাল কিনতে আসে।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। সমীর এখানে এসে বোঝে তার মাল বেশী কাটাতেই হবে। তাই একটা রিক্সাওয়ালাকে বলে—এখানে থাকার হোটেলে নিয়ে চলো।

রিক্সাওয়ালারা এইসব সেলসম্যান যাত্রীদের দেখলেই চিনতে পারে। এরা

কলকাতা থেকে আসে। এখানের মাঝারি দামের হোটেলগুলোয় থেকে কয়েক-দিন ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গায়—দোকানে-অফিসে বাণিজ্য করে চলে যায়, আবার মাস খানেক বা দুতিন মাস পরই আসে। অনেকেই এদের চেনা-জানাও হয়ে যায়।

রিক্সাওয়ালা বলে—আপনি নতুন লাইনে, না বাবু ?

শহরের এদিকটা রেল কলোনী। তখনও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা সবাই চলে যায়নি। রেল কলোনী তাই সাজানো রয়েছে গাছ-গাছালি ফুলের গাছ দিয়ে, এর পরেই শহরের কলরব, গিজ্জি পরিবেশ শুরু হবে।

রিক্সাওয়ালার কথায় সমীর বলে—কেন বলো তো ?

রিক্সা চালাচ্ছে যে তার বয়স বেশী নয়। বলে—দেখে মনে হলো।

তবু আমার রিক্সায় চড়ে ওকথা বললেন—অন্য কোন রিক্সা হলে আপনাকে শহরে পাক লাগিয়ে বিশ টাকা ভাড়া আদায় করে একেবারে দামী হোটেলে নে যেতো। কমিশনও বেশী পেতো।

হাসে সমীর—পয়সাকড়ি বেশী নাই ভাই। তোমার নাম ?

ছেলেটা বলে—আমার নাম গুপী। স্টেশনেই থাকি—মালগুদামের এদিকের শেডে। থাকার জায়গা তো নাই। রিক্সায় খাটি—এটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনে চালাচ্ছি।

গুপীই ওকে গলির মধ্যে একটা ছিমছাম হোটেলে নিয়ে আসে। দরও খুব বেশী নয়। সমীর ওকে ভাড়া মিটিয়ে দেয়। গুপী বলে—স্টেশনে না হয় বাস স্ট্যাণ্ডেই পাবেন আমাকে।

শহরে সমীর বিভিন্ন দোকানে যায়। এখানের বাজার খবুই ভালো। আর জয়সোয়াল কোম্পানীর ওই মাল ভালোই বিক্রী হয়। দুতিন দিন শহরে থেকে পাশের পুরোনো শহর রানীগঞ্জেও যায় সমীর।

সেখানেও তার মাল কিছু বিক্রী হয় তারপর ও এগিয়ে চলে বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ধানবাদ শহরে। বিহারের কোলিয়ারী অঞ্চলের প্রধান শহর। এর চারিদিকে বিস্তীর্ণ এলাকা কয়লায় সমৃদ্ধ। ফলে টাকার খেলা এখানে ভালোই চলে। মালপত্রও বিক্রী ভালোই হয়।

সমীর বেশ কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে ফিরে আসে। তার বিক্রী ভালোই হয়েছে। সামনের মাসেও যেতে হবে।

জয়সোয়াল, মুখার্জিবাবু তার প্রথম সফরেই খুবই খুশী হয়। মুখার্জি-বাবু হিসাবপত্র দেখে বলে—প্রথমবারই ভালো ব্যবসা করেছো হে সমীর।

জয়সোয়াল বলে—বলিনি ও একজন পাকা সেলস্‌ম্যান। যে মালই দাও ও দারুণ ব্যবসা করবে। ওর সেল করার ক্ষমতা আছে।

কমিশনও মন্দ পায় না। এবার দাদার বাসায় ফিরেছে সমীর মাস দেড়েক পর। গলির মধ্যে পুরানো বাড়িটাকে আর চিনতে পারে না। একেবারে ভোল বদলে গেছে। নতুন রং করা হয়েছে।

বাড়ি ঢুকে দেখে সিঁড়ির নিচে তার আর মায়ের সেই জায়গাটাও আর

নেই। মায়ের চিহ্ন সেই তক্তপোশও নাই। সিঁড়ির নিচে এখন কাঠের পাটাতনের উপর পাম্পসেট বসানো হয়েছে। ওটা দিয়ে এখন বাড়ির ছাদে নতুন ট্যাঙ্কে জল তোলা হয়। তার থেকে পাইপে করে জল সাপ্লাই হয় বাথরুমে, কিচেনে।

গুপচি রান্নাঘরে মা চোখের জাল নাকের জলে হয়ে দমবন্ধ অবস্থায় রান্না করতো। এখন কিচেনে ঝকঝকে টালি বসানো। গ্যাস এসেছে—ঝকঝক করছে রান্নাঘর, ওদিকে ধোঁয়া বের করার জন্য এগজস্ট ফ্যানও লাগানো হয়েছে।

রঞ্জনাই ছুটে আসে—মা, কাকু এসেছে।

রীনা বের হয়ে আসে—তুমি!

সমীরকে ও বোধহয় এখানে ফিরে আসতে দেখবে ভাবেনি।

সমীর বলে—হ্যাঁ! সব তো বদলে গেছে।

রীনা বলে—বাড়িটা তোমার দাদা ধার দেনা করে কিনলো। আমি চাইনি, এখন দিন চলবে কি করে তাই ভাবছি।

সমীর লক্ষ্য করে বৌদি তাকে বসতেও বলে না।

রীনা বলে—তোমার থাকার জায়গাটাও চলে গেল। ঘরগুলো এখনও সব ভাঙ্গাচোরা—

রঞ্জু বলে—মেরামত তো হয়ে গেছে সব মা।

রীনা বলে—না। মানে এখনও রংটং হয়নি। কোথায় যে থাকবে তুমি।

সমীর বুঝেছে এ বাড়িতে আর ওর থাকার দাবীটুকুও মানবে না। সমীর কোথায় যাবে জানে না। তবু বলে—আমার জন্য ভাবতে হবে না বৌদি। অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে নেব। দাদার সঙ্গে দেখা হল না।

—ওর ফিরতে তো অনেক রাত হবে।

রীনা এড়াতেই চায় ওকে। সমীর সেটা বুঝেছে। বাড়িতে কেউ এলে তাকে এক কাপ চা, নিদেন এক গ্লাস জলও দেওয়া হয়—এটাই গৃহস্থের রীতি। কিন্তু বৌদি তাকে এক গ্লাস জলও দেয় না।

সমীর দাঁড়ালো সিঁড়ির তলায়—মায়ের কথা মনে পড়ে। মা থাকলে আজ সে কোথায় থাকতো এখানে না পথে তা বুঝতে পারে না। মা চলে গেছে—এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চলে গেছে।

এবার সমীরকেও যেতে হবে। বের হয়ে আসে সমীর। কাঁধের ব্যাগে তার পার্থিব সম্পত্তি, কোথায় যাবে জানে না। মনে হয় জয়সোয়াল-এর দোকানেই যাবে। মুখার্জিবাবুদেরও বেশ কয়েকটা বাড়ি আছে। বিডন স্ট্রীট অঞ্চলের ওরাই এককালে জমিদার ছিল। ওদের অনেক বাড়ির একটাতে যদি ঠাঁই মেলে। এখানের আশ্রয় তার চলে গেছে আজ। পথের মানুষ এখন সে, নিরাশ্রয়ই।

দুপুরে দোকানে মুখার্জিবাবুই রয়েছেন। সমীরকে ফিরতে দেখে চাইলেন। এর মধ্যেই মুখার্জিবাবুও ভালোবেসে ফেলেছেন ছেলেটিকে। খুবই কাজের ছেলে। ব্যবসার ব্যাপারে তাকে খুবই দরকার।

বলেন হরিদাস মুখুয্যে—কি ব্যাপার সমীর?

সমীর সব কথাটা খুলে বলতে পারে না। বলে—দাদার বাড়ি ভেঙ্গেচুরে নতুন করে তৈরী হচ্ছে, থাকার জায়গা নাই। এখন থাকার জন্য একটা আস্তানার দরকার। ভাড়াও বেশী দিতে পারবো না, জানেন তো অবস্থা—

—একখানা ঘর চাই ? হরি মুখুজ্যে কি ভাবছে। তারপর বলে—হ্যাঁ। আছে একখানা ঘর। তবে একতলায়, পুরোনো ঘর—

সমীরের কাছে তাই এখন অনেক বড় পাওয়া। বলে সে—ওতেই হবে।

সমীর ভাবেনি যে এত সহজে তার থাকার ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। হরিবাবুর দোকানের বুড়ো কর্মচারীই ওকে নিয়ে আসে হেদোর পিছন দিকে একটা গলির মধ্যে বড় বাড়িতে। অবশ্য গলিতে সোজা হয়ে ঢোকা যায় না, বিশেষ করে মোটা মানুষ তো পারবেই না। আড়কাত মেরে এগোতে হবে মাথা বাঁচিয়ে, পা বাঁচিয়ে। নিচে সরু গলিতে পথ বলে কিছুই নাই, কোন কালে ছিল হয়তো, এখন ওটা নিকাশী নালায় পরিণত হয়েছে আর তাই দুপাশের বাড়ি থেকে ওখানেই সময় অসময়ে তরকারির খোসা—ছেঁড়া নোংরা কাগজ, মাছের কাঁটাপোটা, মায় বাড়ির বাচ্চাদের কাগজে মোড়া 'ইয়ে' অবধি নিক্ষিপ্ত হয়। তাই পথচারীরাই ওপথে যাবার সময় আওয়াজ দেয়—সামালকে। যাতে তাদের ঘাড়ে তেমন কিছু নিক্ষিপ্ত না হয়।

এহেন গলির গলি তস্য গলির মধ্যেকার একতলার একটা ঘরে সমীর ঠাঁই পেল। ঘরটা অন্ধকারই—দিনেও আলো জ্বালতে হয়। বাথরুম বলতে উঠানের একদিকে একটা বড় চৌবাচ্চা আছে—শেওলা পড়েছে। তারই জমা জলে স্নান করতে হয়—পায়খানাটা এক কোণে। ওটা বারোয়ারি।

ওদিকে ছোটখাটো কিসের কারখানা—ওপাশের ঘরগুলোতে অন্য কারা রয়েছে। মেয়েছেলের গলার দরাজ আওয়াজ, বাচ্চার চিলচীৎকারও শোনা যায়।

উপরের ঘরগুলোতেও মানুষজন রয়েছে।

সমীর বাড়ি থেকে তার বিছানাটা নিয়ে আসে। এক কোণে পড়েছিল। রঞ্জনা বলে—চলে যাচ্ছো কাকু ?

সমীর বলে—হ্যাঁ। তোর মাকে বলিস।

—মা তো ঘুমুচ্ছে।

সমীর ওকে আদর করে বের হয়। ভাইপো প্রবীর মায়ের মতই চালাক। সেও এসে দাঁড়ায়। ছেলেটা নজর রাখছে কাকা কি নিয়ে যাচ্ছে।

জয়সোয়ালও সব শুনে খুশী হয়। বলে—মুখুয্যে ছেলেটাকে আশ্রয় দিয়ে ভালোই করেছো। খুব কাজের ছেলে।

সমীরের এখন আর কোন বাঁধনই নাই। কাজই করতে হবে তাকে। যেভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাকে। তাই সমীর এখন প্রায়ই বাইরে যাচ্ছে।

ক্রমশঃ বর্ধমান-আসানসোল-রানীগঞ্জ-ধানবাদ এলাকায় সে অনেক এজেন্টই

করেছে। তার টায়ার টিউব বিক্রীও বেড়েছে অনেক ওই অঞ্চলে। আর হরিদাস মুখুয্যে জয়সোয়াল দুজনেও বেশ লাভবানই হচ্ছে সমীরের ওই বিক্রীর জন্য।

সমীর আসানসোল-রানীগঞ্জ অঞ্চলে আসে। সেই রিক্সাওয়ালা গুপী-নাথও এখন তাকে ভালো করেই চেনে। ওর রিক্সাতেই ঘোরে সমীর।

সেদিন চলেছে সমীর বাজারের দিকে। বাসস্ট্যাণ্ডের ওদিকে রাস্তায় হঠাৎ গাছের নিচে একটা বুড়িকে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে সমীর।

মা সেই যে হারিয়ে গেছে তারপর আর কোন খবরই পায়নাই। খোঁজাখুঁজি করেছে অনেক। ন্যাপার দল তারপর নৌকা নিয়ে দুতিন দিন গঙ্গায় চষে বেড়িয়েছে। কোন মৃতদেহ কেউ পায়নি।

মনে হয় মা কোথাও চলেই গেছে। আজও সমীরের মনে মায়ের সেই ছবিটা ম্লান হয়ে যায়নি, উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে পড়ে মায়ের কথা —তুই অনেক বড় হবি বাবা।

সে মায়ের আশীর্বাদে আজ কাজ করছে, দুটো পয়সা পাচ্ছে! কিন্তু মাকে পায়নি আর।

হঠাৎ ওখানে তাকেই দেখেছে। মা ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছে। সমীর বলে—গুপী থামো থামো।

ওর চীৎকারে গুপী রিক্সা থামাবার চেষ্টা করে। ঢালুর মুখ, গাড়িটা জোরে নামছিল, সমীরের কথায় কোনমতে ব্রেক করে সে।

—কি হলো?

সমীর রিক্সা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে ওই গাছতলার দিকে দৌড়ালো। —মা। মাগো।

সমীর এতদিন পর তার হারানো মাকে ফিরে পেয়েছে। আবার ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরেই তুলবে।

বুড়ি বসেছিল গাছতলায়। ওই ব্যাকুল ডাক শুনে চাইল। সমীরও এসে পড়েছে। কিন্তু বুড়িকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

নাহ্। এ তার মা নয়। অন্য কোন মহিলা, দেখতে অনেকটা তার মায়ের মতই। মহিলাও অবাক। বলে সে—কিছু বলছো বাবা?

সমীর স্তব্ধ। মা এ নয়—অন্য কেউ। সমীর বলে—না। হঠাৎ মনে হলো—

কথাটা শেষ করতে পারে না। বুড়ির অবস্থা যে খুবই করুণ তা বোঝা যায়। সংসারে একেও তার মায়ের মতই নির্মমভাবে ঘর থেকে পথেই বের করে দিয়েছে। হাতে ভিক্ষাপাত্র, পরনে ছেঁড়া কাপড়।

সমীর একটা দশ টাকার নোট বের করে ওর হাতে দিয়ে ম্লান মুখে রিক্সার দিকে ফিরে আসে।

সব ব্যাপারটা গুপী দেখেছে। শুধোয় সে—বাবু, আপনার মা নেই, না?

সমীর চাইল গুপীর দিকে। গুপী বলে—আমার মাও না খেতে পেয়ে আমাদের ছেড়ে নাকি কোলিয়ারীর ধসা খাদে লাফ দিয়ে মরেছিল। আমরা

যাতে দুমুঠো খেতে পাই তাই নিজের খাবার রেখে গেছল আমাদের জন্যে। মাটাকে আর খুঁজে পাইনি বাবু, কেউ বলে মরে গেছে, কেউ বলে দেশান্তরী হয়েছে।

সমীর দেখছে ওকে। ওই গুপীর মত হতভাগ্য সেও। আজও সে মাকে খুঁজছে। সমীর বলে—আমার মাও চলে গেছে ওই ভাবেই। তাই পথেঘাটে মায়ের সন্ধানই করি গুপী, তার মত কাউকে দেখলে কিছু দিতে চেষ্টা করি। মাকে তো কিছুই দিতে পারিনি। ওদের দিলে মা যেখানেই থাকুক তার কিছুটা অন্যের মারফৎ মায়ের কাছেও হয়তো পৌঁছবে।

গুপী বলে—মা দুনিয়ার সব থেকে আপনজন বাবু, এমনি পোড়া কপাল সেই মাই রইল না। চলেন— শালা দুনিয়ায় জন্মেছি দুঃখ করতেই—

গুপী রিক্সায় প্যাডেল করতে থাকে। মনে হয় সমীরের সে আর ওই রিক্সাওয়ালা গুপী যেন কোথায় একই ভাগ্যের পরিহাসে নিঃস্ব—রিক্ত।

কোথায় দুজনের মধ্যে যেন অদৃশ্য একটা বন্ধন রয়ে গেছে।

হরিদাস মুখুয্যে জয়সোয়াল-এর সঙ্গে ব্যবসাতে নেমে এখন উন্নতিই করছে। কিন্তু জয়সোয়াল-এর মূল ব্যবসা পুরানো লোহালক্কড়ের। এখন সে ব্যবসা খুব জোর চলছে। কলকাতা তার আশপাশে এককালে প্রচুর ছোট বড় ফ্যাক্টরী ছিল। লোহালক্কড়, টিন দিয়ে তৈরী শেড—তাতে প্রচুর মেসিনও ছিল। ইদানীং বহু ফ্যাক্টরী নানা কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর তার লোহালক্কড়—শেডের লোহার বিম—যন্ত্রপাতিও বাতিল লোহার দরে কিনে বিক্রী করে তারা।

এ ছাড়াও রেলের প্রচুর পুরোনো লোহার ইস্পাত কেনার ঠিকেও পেয়ে গেছে। ফলে তার ওই ব্যবসার দিকেই নজর বেশী গেছে জয়সোয়ালের।

তাই এখান থেকেও টাকা টেনে সস্তায় বাতিল লোহা কিনছে। হরি মুখুজ্যে রবার টায়ার টিউব নিয়েই রয়েছে। ওই পুরানো লোহার ধান্দায় সে নেই।

সমীরের সঙ্গে তাই হরিবাবুই ব্যবসার কথা বলে। এখন সমীরই এদিকে মায় কারখানাতেও যায় মালের অর্ডার দিতে।

ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে নেমে বেশ কিছু পথ রিক্সায় গিয়ে গঙ্গার ধারে পড়ে ওদের বিশাল রবার কারখানা। সমীর ওদের অফিসে যাতায়াত করে। দুচারজনের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছে এই আসা-যাওয়ার ফলে।

কারখানার এদিকে সুন্দর বাগান, সবুজ গাছগাছালির মধ্যে সাজানো অফিস বিল্ডিং, ভিতরে সুন্দর স্টাফ কলোনী। ওই অফিসেই দেখে কাউল সাহেবকে।

বেশ ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, পরনে দামী পোশাক। গাড়ি নিয়েই আসেন কাউল সাহেব। ওঁর কাজ কারখানায় রবার সাপ্লাই করা। অবশ্য প্রধানতঃ ওদের রাবার কেরালা—এমনকি বাইরে থেকেও আসে। আর

এখানেও প্রচুর বাতিল রবারের টুকরোকে ফের মোল্ড করে রবারের সিট তৈরী করা হয়। বিভিন্ন কোম্পানী নানাভাবে বাতিল রবার জলের দামে তা সংগ্রহ করে কোম্পানীকে ওই সব সিট বানিয়ে সাপ্লাই করে। কোম্পানী সেই সব সিট থেকে নানাভাবে প্রসেস করে সাইকেল, মটর, ট্রাক, ট্রাকটার, প্লেন এসবের টায়ার টিউব, আরও নানা কিছু তৈরী করে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করে।

তাই এসব রবার সিটের দামেও ভালোই দেয়। কাউল সাহেব ভালোই ব্যবসা করছেন।

সেদিন সমীরের কাজ হয়ে গেছে। কলকাতা ফিরতে হবে। কাউল সাহেবই বলেন—কলকাতা ফিরবে তো। চলো—গাড়িতেই চলো।

সমীর উঠেছে ওর গাড়িতে। কাউল সাহেবের কলকাতায় খিদিরপুরের দিকে বাড়ি। আর বেশ কিছুদিন থেকেই রবারের ব্যবসাতে রয়েছেন। ট্যাংরার ওদিকেই কিছু রবার কারখানা আছে। তারা সিট রবার থেকে অনেক রকম মাল তৈরী করে। যন্ত্রাংশও তৈরী করে। বড় কারখানাগুলোও বেশ চলে, ছোটগুলোতেও কাজ ভালোই হয়।

কাউল সাহেব বলেন—এখন রবারের যুগই চলেছে। টায়ার-টিউব তো বহু রকমের তৈরী হচ্ছে। অন্যসবও। কিন্তু তার প্রধান কাঁচামাল ওই রবার। যা এদেশে সামান্য এখন ত্রিপুরা তৈরী করে আর তার থেকে বেশী হয় কেরালে। বাকী মাল আসে মালয়েশিয়া-জাভা-থাইল্যাণ্ড-সিঙ্গাপুরের দিক থেকে। এখানে তাই বাতিল রবার, রবারের ছাঁটও অনেক দামী। গলিয়ে সিট তৈরী করো, এরাই ভালো দামে নেবে।

মালবিক্রীরও কোন ঝামেলা নাই। অবশ্য ঝামেলা মাল যোগাড় করার।

সমীর ভাবছে কথাটা। সে টায়ার টিউবই বেচছে কমিশনে। যদি নিজে ওইসব বাতিল রবার সংগ্রহ করে মোল্ড করে সিট তৈরী করে এদের সাপ্লাই দেয়—ভালো লাভই হবে।

কিন্তু তার আগে এই লাইনটা জানা দরকার। আর সমীরও ভেবে নেয়, এর জন্যই কাউল সাহেবের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখতে হবে।

বলে সমীর—আপনার কারখানায় একদিন কাজ দেখতে যাবো।

কাউল সাহেব বলেন—বেশ তো।

নিজের ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলে—সকাল নটার পর কারখানায় থাকি, চলে এসো একদিন। এলে খুব খুশী হবো। ওখানেই নাস্তার দাওদ্ রইল।

জয়সোয়াল হরিবাবু দোকানেই রয়েছে। জয়সোয়ালের টাকার দরকার। সে চায় ব্যবসা বিক্রী করে দিতে।

সমীরও এসেছে। সে ফ্যাক্টরীতে অর্ডার দিয়ে এসেছে। এবার তারও বেশ কমাসের কমিশন বাকী। হিসাব নিকাশ কিছুটা সমীরও করেছে।

সেইমত ফর্দ দেয়। তাতে সমীরের প্রাপ্য কয়েক হাজার টাকাই। অবশ্য মাসে খরচা বাবদ কিছু নিয়েছে, বেশীটা এখানেই রয়েছে।

সমীর বলে—আমার টাকাটা যদি দেন বড় ভালো হয়।

জয়সোয়াল বলে—টাকা! এখন তো নাই। এদিকে কারখানায় এসবের দাম দিতে হবে। এই লটের মাল বেচে দেব।

হরিবাবু বলেন—এখন কিছু নাও, বাকী সামনের মাসেই ক্লিয়ার করে দেব।

জয়সোয়াল চুপ করেই থাকে। এখন এসব যেন হরিবাবুরই দায়।

সমীর কাজের পর সেই গলির মধ্যে বাসায় ফেরে। সকালে নিজেই চা করে স্টোভে, বিস্কুট নাহয় মুড়ি কিছু রাখে। ওই দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে স্নান করে বের হয়ে যায়—ফেরে রাতে।

বাইরে থেকেই রুটি তড়কা, না হয় মাটির ভাঁড়ে সব্জী কিনে আনে। সেদিন ফিরে দেখে কুঁজোয় খাবার জলও নাই। সকালে তাড়াহুড়োয় জল ধরতে ভুলে গেছে। তেষ্টাও পেয়েছে। জল না থাকলে তেষ্টা বোধ হয় বেশীই পায়। কুঁজোটা নিয়ে উঠানের চৌবাচ্চার কাছে এসে ওই চৌবাচ্চার পচা জলই কুঁজোতে পুরছে। হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল।

—ওই জলই খাবেন নাকি?

চাইল সমীর। দেখে একটি মেয়ে ওদিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার ওই কাণ্ড দেখছে। ম্লান বালবের আলোয় দেখা যায় তাকে। ফর্সা— সুন্দরীই। ডাগর দুচোখে ওর আতঙ্ক ফুটে ওঠে। বলে সে—ও তো কতদিনের পচা নোংরা জল।

সমীর বলে—খাবার জল নাই, কলেও জল নাই।

—তাই বলে ওই বিষ খেতে হবে? দাঁড়ান।

সমীর থামলো। মেয়েটির কথায়, চলায় একটা ব্যক্তিত্বই ফুটে ওঠে। বলে সে—জল আনছি।

ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের জগে জল এনে বলে—এটা কুঁজোতে ঢেলে নিন।

সমীর ঢালার চেষ্টা করে, পড়ে না ঠিক। মেয়েটি বলে—এটুকুও পারেন না? সরুন।

নিজেই ওর কুঁজো ধুয়ে তাতে জলটা ঢেলে দেয়। সমীর বলে—অনেক ধন্যবাদ, এটুকু না পেলে ওই জলই খেতে হতো।

মেয়েটি বোধহয় ওদিকেই থাকে। সমীর তার প্রতিবেশীদেরও চেনে না। অবশ্য চেনার সময়ও তার নাই। সমীর বলে—এক বাড়িতে থাকি—কেউ কাউকে চিনি না।

মেয়েটি বলে—ওপাশে আমরা থাকি। আপনি তো প্রায়ই বাইরে থাকেন। দেখি ঘর বন্ধ।

—হ্যাঁ। বাইরেই কাজ আমার।

মেয়েটি চলে যায়। সমীর চেয়ে থাকে ওর গতিপথের দিকে। ফিরে এসে ঘরে ঢোকে। রুটি তড়কা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাই চিবোতে থাকে।

সমীরের সকালেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকালে না উঠলে বাথরুম পায়খানায় লাইন পড়ে। বারোয়ারী ব্যাপার। উপরের তলায় তো এ নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা বাধে। নিচে কারখানা দু' তিনটে অফিসমত আছে। তাদের লোকজন দশটার পর আসে, তাই এখানের দু' তিনঘর ভাড়াটেদের খুব অসুবিধা হয় না।

সমীরের চোখ যেন কাকে খুঁজছে। দেখে ওদিক থেকে সেই মেয়েটি সঙ্গে ভাইবোন হবে তাদের নিয়ে এর মধ্যে তৈরী হয়ে স্কুলে চলেছে।

মেয়েটিই সমীরকে বলে—কলে জল এসেছে, কুঁজো ভরে নেবেন।

পিছনে একটি বয়স্কা মহিলা। বোধহয় ওদের মাই হবে। বেশ সৌম্য চেহারা। বলে সমীরকে—ওই ঘরে থাকো তুমি ?

সমীর ঘাড় নাড়ে।

—নাম কি ?

সমীর নামটা বলে।

বয়স্কা বলে—আর কেউ নাই ?

হাসে সমীর। মলিন বিষণ্ণ হাসি। বলে সে—ছিল তো সবাই। বাবা-মা-দাদারা-বৌদিরা। বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই, মাকে নিয়ে দাদার বাড়িতেই ছিলাম। মাও গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আর ফিরলেন না। এক দাদা প্রফেসর—তিনি চলে গেলেন বালিগঞ্জে নিজের বাড়ি করে। আর এক দাদাও ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেন এখানে। আপনি-কপনি এসে জুটলাম মাসীমা—

ওই মেয়েটিও ডাগর চোখ মেলে শুনছে সমীরের জীবনকাহিনী। ওর চোখে যেন কি বেদনার ছায়া নামে।

মহিলা বলে—এই তো সংসার বাবা। মায়ের কোন সন্ধানই পাওনি ?

সমীর মাথা নাড়ে। মহিলা বলেন—আহারে। এভাবে মাকে হারালে। তারপর এমনি করে লড়ছো ?.

সমীর বলে—লড়তে তো হবেই মাসীমা। টাকার অভাবেই মাকে হারিয়েছি -- টাকার যে এত দাম তা জানতাম না।

মহিলা বলেন—তোমার মেসোমশাইও তাই বলেন। সরকারী চাকরি, বদলি হয়ে গেলেন বহরমপুরে, আর দু' একবছরের চাকরি আছে, কলকাতার কাছেই জায়গা কিনেছি, ওখানে বাড়ি করছি। হয়ে গেলে চলে যাবো। এ ক'দিন এখানেই থাকতে হবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন—কইরে উমা, স্কুলে যাবি না ? বেলা হয়ে গেল।

মেয়েটির নাম বোধ হয় উমা। সুন্দর নাম—ওর স্নিগ্ধ চেহারার সঙ্গে নামটাও মানানসই। উমা বলে—যাচ্ছি মা।

ওরা চলে যায়। মহিলা বলে সমীরকে—চলি বাবা। পরে দেখা হবে।

সমীরের মনে কি যেন একটা সুর বাজে। মনে পরে বার বার বীণার কথা। সেও এসেছিল তার জীবনে। বীণাই তার জীবনে এনেছিল প্রেমের সাড়া। তার কাছে আজও সে যেন দূর আকাশের তারার মতই অধরা রয়ে গেছে, দুঃখের গভীর আঁধারে সে এনেছিল আশার দীপ্তি।

সে সব আজ কোন্ শূন্যে মিলিয়ে গেছে। বীণা আজ পরের ঘরনী। তাকে দেখেওনি আর। সমীর নিজের জীবনের লড়াই নিয়েই ব্যস্ত—তার কাছে প্রেম এক দুরাশা, আলেয়ার আলো মাত্র, বাস্তবে যাদের কোন অস্তিত্বও নাই।

সমীর কি ভেবে কাউল সাহেবের কারখানার উদ্দেশ্যেই রওনা দিল। শিয়ালদহ থেকে ধাপার বাসে উঠে বেশ খানিকটা এসে একটা বস্তির ধারে নামলো।

এদিকটার রূপই আলাদা। কলকাতা শহরের এত কাছে তবু এদিকে এখনও অতীতের সুন্দরবন ঘেঁষা কলকাতার চেহারা কিছুটা রয়েছে।

বড় রাস্তা একটা তৈরী হচ্ছে, তার দুপাশে এখন পানা-ডোবা, জলা—তালগাছ, তার এদিক ওদিকে ছড়ানো বস্তিই বেশী। মাঝে দুচারটে সদ্য গজানো পাকাবাড়ি চোখে পড়ে, বাকি সবই বস্তি। শুয়োর চরছে এদিকে ওদিকে। এদিকের কোন এক নামী লোকের নাকি সাহেবদের আমলে শুয়োর সাপ্লাই দেবার বড় ব্যবসা ছিল।

এখন সাহেবরা নাই—শুয়োরের চালানও বন্ধ। তবু তাদের বংশধর কিছু রয়ে গেছে এখানে। মাঝে মাঝে খোয়া ঢালা রাস্তার ধারে ছোট মাঝারি দু চারটে কারখানা। বড় কারখানাও দেখা যায়। তাদের বড় বড় চিমনি, শেডগুলো চোখে পড়ে। এখানের বাতাসে নানা বর্ণের ধোঁয়া—তার সঙ্গে কাদা, পচা ডোবা আর কারখানার পূতি গন্ধও মিশেছে।

মানুষ তবু এখানেও এসে জুটেছে। বসবাসও করছে। কারখানার শ্রমিক, মাঝারি কর্মচারীরাও এখানেই বাসা নিয়েছে। তাই চায়ের দোকান, মনোহারি দোকান—বাজার এসবও গড়ে উঠেছে।

সমীর একটা পানের দোকানে কাউল সাহেবের কারখানার সন্ধান করতে সেইই বলে—বড় মিঞার কারখানা? ওই যে চিমনি দেখছেন—ওইটা। এই গলি দে চলে যান, ডাইনে ঘুরলেই পাবেন।

কাউল সাহেবের অফিস কারখানায় ঢুকেই ওদিকের একটা ঘরে। পিছনে কারখানার শেড—গুদাম। কাউল সাহেব সমীরকে দেখেই চিনতে পারে।

—আরে এসো এসো—তুমি যে সাচমুচ আসবে তা শোচেনি আমি। বোসো বাবুজী।

সমীর বলে—এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম দেখা করে যাই। কারখানাও দেখে যাবো।

কাউল সাহেবই ওকে নিজে সঙ্গে করে কারখানার শেডে নিয়ে যায়। ওদিকে ফার্নেসে রবারের স্ক্রাপ, টুকরো এসব গলানো হচ্ছে। বাতিল রবারের টুকরোগুলো উত্তাপে গলে গেছে, তাতে কিছু কেমিক্যাল দিয়ে ওই রবার থেকে কিছুটা ময়লা বের করে সাফ করা হচ্ছে, পরে সেই রবারকে বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন গেজের ডাইসে ঢেলে ঠাণ্ডা করে সিটে পরিণত করা হচ্ছে।

সেগুলোই এবার রবারের জিনিসপত্র যারা তৈরী করে তাদের কাছে—বড় বড় কোম্পানীর কাছে বিক্রী করা হয়।

যন্ত্রপাতিও বিশেষ লাগে না। শুধু সাবধান হতে হয়, যাতে আগুন না লাগে। সমীর ওইসব জিনিস করার ব্যাপারগুলোও ভালো করে লক্ষ্য করে।

কাউল সাহেব ওকে অফিসে এনে বসায়। কাকে বলে—চা নিয়ে আয়।

সমীরকে বলে কাউল সাহেব—এই ব্যবসায়ের মার নাই। মালের চাহিদাও খুব জ্যাদা। লেকিন কাঁচামাল এখানে জ্যাদা মেলে না। যা মেলে তাই পড়তে পায় না। তুমি যদি ওই স্ক্রাপ সাপ্লাই করো—ভালো দর দেব তোমাকে। যিতনা মাল দেওগে সমুচা লেঙ্গে সমীরজী।

সমীর বলে—এখানে তো কমই মেলে বলছেন, তাহলে বেশী পাওয়া যায় কোথায়?

কাউল সাহেব বলেন—ডানলপ কোম্পানী তো বহুৎ সমান বাইরে থেকে আনে। ওদের স্ক্রাপ রবার যদি পাও তো ভালো দর পাবে। এছাড়া বেশী মাল মেলে সাউথে। এপ্যালো টায়ার—প্রিমিয়ার টায়ার—আউর ভি কারখানা আছে কেরালামে—উসোক স্ক্রাপ তো শুনা নালিমে ফেক দেতা হ্যায়। উসব মাল ভি আচ্ছা হোগা।

অর্থাৎ বাতিল মাল কুড়িয়ে এখানে চালান দিতে পারলেই পয়সা। সমীর ভাবছে কথাটা। কিন্তু কোথায় সেই মাদ্রাজ, কেরালা—তার অচেনা জায়গা। টাকাও নাই।

কাউল সাহেব বলে—সময় মিললে চলে এসো বাবুজী। ইয়ংম্যান আছো, লড়ে যাও। হামি ভি ফকীরই থা বাবুজী, এক ওয়াক্ত রোটি ভি মিলত না, লেকিন ভুখা পেটে লড়েছি, সে লড়াই ফালতু হয়নি। তোমাকে তাই আমার ভালো লেগেছে, লড়াই জারী রাখো। আদমী তোমাকে ঠকাবে জরুর, লেকিন আর কোই আদমীই তোমাকে মদত ভি দিবে। লেকিন তুমি কাউকে ঠকাবে না—দেখবে ভগবান তোমার জমানা জরুর বদলে দিবেন। তাঁর উপর ভরসা রাখো।

সমীর ফিরে আসে নতুন এক আশা নিয়ে। মনে হয় সে তো যায় ওই বড় বড় রাবার কারখানায়, তাদের টায়ার টিউবও বেচে। সেখানের কোন অফিসারকে বলে যদি সে কিছু স্ক্রাপ রাবার পায় তাহলে কাউল সাহেবকে সাপ্লাই দিলে প্রতি কেজিতে বেশ কিছু মার্জিনও থাকবে। টায়ার টিউবের ব্যবসাটা চলে বাইরে, কলকাতায় থাকার সময় ওই কাজই করবে।

জয়সোয়াল মুখার্জি কোম্পানীতে তার বেশ কিছু টাকা পড়ে আছে, ওটা পেলেই এই কাজে নামবে। তার আগে ওই কোম্পানীর স্ক্রাপ সংগ্রহের কাজটা এগিয়ে রাখতে হবে।

সুবীর এখন বেশ অসুবিধাতেই পড়েছে। রীনার চাপে পড়ে এই বাড়িটা কেনে। দোকানের পুঁজি ভেঙেই কিনতে হয়েছে। রীনা অনেকদিন থেকেই ঘ্যানঘ্যান করছে,—মেজবাবুর বাড়ি হলো, আমাদের কি চিরকাল ভাড়া বাড়িতেই থাকতে হবে? তোমার মা-ভাইকে তো তাড়ালাম। এবার নিজেদের একটু হাত-পা মেলে নিজের বাড়িতে থাকতে দাও।

সুবীর বলে—সমীর থাকতে ওই দোকান থেকে সংসারের খরচা উঠতো। তাকে তাড়িয়ে দোকান আবার ডুবতে বসেছে। ব্যবসাতেও মন্দা চলছে। ট্যাক্স দিতেই চলে যাচ্ছে মোটা টাকা—মহাজনের দেনা।

রীনা বলে—ওসব কথা চিরকালই শুনছি। তাহলে কি ব্যবসা করো? বীণার স্বামী শুনেছি নিজের বাড়ি করছে।

সুবীর বলে—ব্যাঙ্কে কাজ করে। ব্যাঙ্ক ওদের লোন দেয় বাড়ি তৈরী করতে।

—তোমার তো দুটো দোকান, ব্যবসা।

শেষ অবধি দোকানের টাকা ভেঙেই বাড়ি কেনে, তারপর শুরু হয় রীনার বায়না। বড় ছেলে প্রবীর ক্লাস সেভেনে পড়ে। এর মধ্যে সেও বারমুডা পরে টেপ রেকর্ডারের বিদেশী বাজনার সঙ্গে হাত-পা ছুড়ে নাচে। মা বলে—ছেলে আমার কতো এসমার্ট।

প্রবীরের বায়না ডেক মিউজিক চাই—গিন্নীর বায়না বাড়িতে মোজাইক টালি বসাতে হবে, সব নতুন গ্রিল চাই, দেওয়ালে প্লাস্টার অব প্যারিস করতে হবে—আরও কতো বায়না।

ফলে জলের মত টাকা যাচ্ছে সুবীরের। দোকানও চলছে না। এবার সেইই বলে—এসব বন্ধ করো। বাবার আমলে কত কষ্ট করেছি। আবার কি তাই করতে হবে তোমাদের পাল্লায় পড়ে? কত টানবো আর?

রীনা অনুযোগ করে—আমরা তোমার বোঝা?

সুবীর এবার সমূহ লোকসানের ভয়ে এখন কঠিন হয়ে উঠেছে। বলে—হ্যাঁ তাই! মা-ভাই সবাইকে তো তাড়িয়েছো—এখন তোমরা ছাড়া এ সংসারে আর কে আছে?

চুপ করে যায় রীনা।

প্রবীর বলে—বাবা তুমি একেবারে ব্যাকডেটেড।

—হ্যাঁ। তাই ছিলাম ভালো। এখন তোদের মত সভ্য হতে গিয়ে যথাসর্বস্ব না চলে যায়। অনেক তো গেছে।

সুবীরের মনেও মায়ের হারিয়ে যাওয়াটা আজ গভীরভাবে বাজে। সমীরও চলে গেছে এবাড়ি থেকে। তাকেও অনেকদিন দেখেনি।

সমীর ক'দিনেই দেখেছে এই বাড়িতে তার উপর নজর দেবার মত লোকও জুটেছে।

মাসীমাও এখন মাঝে মাঝে সমীরের ঘরে আসে সমীর থাকলে। বলে—এত নোংরা করে রেখেছো ?

সমীর মাঝে মাঝে হোটেলের খাবার না খেয়ে বাড়িতেই স্টোভে ভাত ডিমের ঝোল এসব করে নেয়। এতে মুখও বদলানো হয় আর খরচও কম পড়ে।

সেদিন উমা নিজেই আসে একটা ঝাঁটা নিয়ে, শাড়িটা গাছকোমর করে পরা। সমীর আলু কুটছিল। ওকে ওই অবস্থায় ঢুকতে দেখে বলে—একি! ঝাড়ু মেরে তাড়াবে নাকি ? একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এসেছো—

হাসে উমা। হাসলে ওর সুন্দর গালে দুটো টোল পড়ে। চোখের তারায় ফুটে ওঠে সেই হাসির ঝিলিক। উমা বলে—তাড়াবো আপনাকে ? না—না। সরুন তো—

—কি হবে ?

—সরুন না। সমীর উঠে দাঁড়ায়। উমা নিপুণ হাতে ঝাঁটা চালাতে থাকে। বিছানা—তাক—খাটের নিচে থেকে রাজ্যের জঞ্জাল মায় দু' চারটে কাঁকড়া-বিছে অবধি বের করে—সমীর উমা দুজনে মিলে সেগুলো পিটিয়ে মারে।

উমা বলে—এই সব নিয়ে ঘরে বাস করেন ?

সমীর বলে—এর চেয়ে অনেক বড় হিংস্র জানোয়ার নিয়ে ঘর করেছি উমা। তারা কামড়েছে, হুল ফুটিয়েছে, বিষ ঢেলেছে—তবুও সব হজম করে এখনও বেঁচে আছি।

উমা দেখছে সমীরকে। ক্রমশঃ ওর জীবনের অনেক ঘটনাই জেনেছে সে। তার মা হারিয়ে গেছে। বলে উমা—তা জানি। তবু তো সাবধানে থাকবেন।

সমীর দেখছে উমাকে। বীণার কথা মনে পড়ে। আজ কোথায় হারিয়ে গেছে সে। মনে হয় হারায়নি, বীণাই যেন ওই উমার রূপ ধরে ফিরে এসেছে তার রিক্ত শূন্য জীবনে।

উমা বলে—আজ বেশী রান্না করবেন না। ওনলি ভাতই পাকিয়ে নেন। মা বলেছে।

—কেন ?

উমা বলে—তা জানি না। মা বলেছে তাই বলে গেলাম। বাকীটা জানতে হয় তো আপনার মাসীমাকেই শুধোবেন।

চলে যায় উমা। ঘরের রূপটাই উমা বদলে দিয়েছে। সেই এলোমেলো অগোছালো ঘরটা এখন যেন এক শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মনে হয় ওরাই পারে পুরুষের ছন্নছাড়া জীবনকে নতুন মাধুর্যে ভরে দিতে।

দুপুরে খাবার সময় দেখে সমীর উমাই একটা বাটিতে মাছের ঝাল আর অন্য বাটিতে মাংস এনেছে।

—কি ব্যাপার ?

উমা বলে—মা পাঠলেন।

সমীর অনেকদিন পর এত উপাদেয় মাছ খায়। মৌরলা মাছ তার খুবই প্রিয়। মা মাঝে মাঝে রাঁধতো। আজ ওই রান্নায় যেন মায়ের হাতের স্বাদই ফুটে ওঠে।

বলে সমীর—মাকে মনে পড়ে। বুঝলে মাও এমনি মাছ রাঁধতেন। কতদিন পরে আবার সেই মাছ খেলাম।

উমা খাবার পর পাত্রগুলো তুলে নিয়ে বলে—এই ভরদুপুরে না বেরিয়ে একটু ঘুমোন।

হাসে সমীর—ঘুম। নিশ্চিন্তে ঘুমোবার বরাত করে আসিনি উমা। বেরুতে হবে। নাহলে অনেক কাজ আটকে যাবে।

মুখার্জি জয়সোয়াল কোম্পানীর মধ্যে ফাটলটা এবার বেশ বড় হয়েই ওঠে। জয়সোয়াল গোপনে অনেক পার্টির কাছে প্রাপ্য টাকা নিজে তুলে নিয়েছে। কোম্পানীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্সও নাই। হরিবাবু সেটা আবিষ্কার করে চমকে ওঠে।

জয়সোয়ালও আর এদিকে আসে না। সেও এখন তার লোহালক্কড়ের ব্যবসা নিয়ে ডুবে আছে। অনেক কারখানার বাতিল লোহা, এমন কি চালু যন্ত্রপাতিও রাতারাতি সরিয়ে এনে পাচার করছে। তাতেই প্রচুর লাভ করে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেছে।

সমীর আসতে মুখার্জিবাবু বলে—সর্বনাশ হয়েছে সমীর। জয়সোয়ালজী কোম্পানীকে ডুবিয়ে গোপনে সব টাকা তুলে নিয়ে চলে গেছে। এখন মহাজনদের দেনা মেটাবো কি করে তাই ভাবছি। তোমার সাড়ে তিন হাজার টাকাও দেবার সাধ্য আমার নাই। কোম্পানী বন্ধ করে দিতেই হবে।

চমকে ওঠে সমীর।—সেকি! আমার টাকা—

হরি মুখুয্যে বলে—বেঁচে থাকলে তোমার টাকা দেব, তবে এখন পারাঁছ না। কোম্পানীই তুলে দিচ্ছি। কত টাকা আমার লোকসান করে গেল ওই ব্যাটা।

সমীরের পায়ের তল থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে :

সমীর ভেবেছিল ওই টাকার থেকে কিছু দিয়ে সে রবার স্ক্রাপ কিনে কাউল সাহেবকে বিক্রী করে ওই লাইনে ব্যবসা শুরু করবে। কিন্তু সেসব এখন মাথায় উঠলো। হাতে পয়সাও নাই।

অভাব-কষ্ট যেন তাকে ছাড়তে চাইছে না। এই ক'মাসের কঠিন পরিশ্রমে সে কিছু রোজগার করেছিল তাও সবই গেল। আবার পথেই নামতে হবে তাকে।

সমীর তবু শেষ চেষ্টাই করবে, যদি কিছু টাকা আদায় করতে পারে। তাই সমীর খুঁজে খুঁজে জয়সোয়ালজীর লোহার দোকানেই এসেছে।

কলকাতার এই অঞ্চলে এখন পুরোনো লোহার বাজার জমে উঠেছে। অবশ্য পুরোনো লোহার সঙ্গে নতুন রড, অ্যাঙ্গেল এসবও রাখে এরা। দোকান ছাড়া অর্ধেক ফুটপাথই এদের দখলে। ফুটপাথেই গ্যাস কাটার দিয়ে এরা লোহা কাটে, বিক্রীবাটা করে।

সমীর খুঁজে খুঁজে জয়সোয়ালের গদিতেই এসেছে। দোকানের চারিপাশে নানাধরনের লোহার গাদা, ওদিকে একটা উঁচু তাকমত। সেখানে তোষক পেতে গদিয়ান হয়ে বসে আছে জয়সোয়ালজী।

পেটানো চেহারা। সমীরকে দেখে বলে—এখানে। হিয়াঁ কিউ আয়া বাবুজী ; উ রবার-ফবার টায়ার-ফায়ারকা ধান্দা হম্ ছোড়া দিয়া। মুখার্জিসে বাত করো। হামি আউর কুছ জানে না।

—আমার টাকা! সমীর তবু জানায়—ওটা দিয়ে দাও।

কথাটা শুনে বলে জয়সোয়াল—উসব হিসাব-কিতাব হামি জানে না। মুখার্জিসে বাত করো। যাও আভি। ইধার উ সব বাত নেহি হোগা। যাও।

ও কোন কথাই আর বলে না। সমীরকে পাত্তাই দিল না। ওরা অমনিই। খাটিয়ে নিয়েছে এখন আর চেনে না।

ঠকবার জন্যই যেন জন্মেছে সমীরের দল। হতাশ হয়ে বের হয়ে আসে। কোথাও কোন আশাই আর নাই। এবার সামনে তার জমাট অন্ধকারই।

ক্লান্ত হতাশ সমীর আসছে। কোথায় যাবে জানে না। আর কোন কাজই তার নাই। বেকার—কদিনের খাবার পয়সা আছে মাত্র। তারপর কি হবে জানে না সে।

হঠাৎ পাশেই বিকট শব্দ করে একটা মটরবাইক থামতে দেখে লাফ দিয়ে সরে দাঁড়ায় সমীর। আর একটু হলে ধাক্কাই খেতো।

মটরবাইক আরোহী গর্জন করে—আবে আঁখ হ্যায় নেহি, অন্ধ হো গিয়া। আবে—মটরবাইকওয়ালাই এবার চমকে ওঠে।

দুটো পা দিয়ে গর্জনমুখর মটরবাইকটাকে থামিয়ে বলে—গুরু—তুমি!

সমীরও প্রথমে চিনতে পারেনি। চকোলেট রংয়ের চামড়ার জ্যাকেট পরা চোখে গাগলস্—ওটা খুলতে এবার চেনে সমীর।

— ন্যাপা! তুই।

ন্যাপা ক'বছরেই এখন ভোল বদলে ফেলেছে। বেশ দশাসই চেহারা। পরনে জিনস্। সমীরকে বলে—কতকাল পরে দেখছি, ওঠো গুরু। অনেক কথা আছে।

সমীরেরও আজ কোন কাজই নাই। ন্যাপার ডাকে পিছনে উঠলো। সাঁ করে মটরবাইকটা বের হয়ে যায় রাস্তা কাঁপিয়ে।

একটা ভালো রেস্তোরাঁয় এনেছে ওকে।

—কি খাবে গুরু?

সমীর দেখছে ওকে। অবাকই হয়। ন্যাপা বলে—হাঁ করে দেখছো কি গুরু? ভাবছো শ্যালা ন্যাপার হলো কি?

—ব্যাপার কি বল তো ?

ন্যাপা বলে—বুঝলে গুরু, এখন দেখলাম চমকাতে না পারলে দুনিয়ায় কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না। সাধু থেকে কিছুই করা যাবে না, আলুতে মাটি মাখিয়েই জিন্দগী বরবাদ হবে। তাই বড়বাজারে মস্তানি শুরু করলাম। লরীবালাদের হয়ে পুলিশের সঙ্গে সমঝোতা—তাদের পেন্নামী দেওয়া, তারপর এল ভোট। ওই অঞ্চলের মধ্যে তখন আমি পয়লা নম্বরের রংবাজ। বোমা—চেম্বারও মিলে গেছে। দাদাকে ভোটে জিতিয়ে দিলাম, একটা লরীও ম্যানেজ হয়ে গেল। আলুর ব্যবসাও সাথ সাথ করি, এদিকে দাদার ডানহাত—চলে যাচ্ছে। অ্যাই কাটলেট দে দুটো জলদি। তারপর তোমার খবর কি বলো ?

সমীর তার ওই সর্বস্ব হারাবার কথাটাই জানায়। বলে—ব্যাটা জয়সোয়াল সাড়ে তিন হাজার টাকাই গায়েব করে দিল। রক্তজল করে রোজগার করা টাকা—ওটা হলে রবারের ব্যবসা করতাম। এখন পথের মানুষ আবার পথেই নেমেছি।

ন্যাপা কি ভাবছে। বলে—জয়সোয়াল। প্রদীপ জয়সোয়াল—ব্যাটা দুনম্বরী মাল। ওইই তোকে হাঁকিয়ে দিল ?

—হ্যাঁ।

ন্যাপা বলে—খাও। খাও গুরু। দেখছি ব্যাটাকে। বললাম না সাধু সেজে থাকলে এই দুনিয়ায় স্রেফ বুড়ো আঙ্গুল চুষতে হবে।

জয়সোয়াল ন্যাপার মটর বাইকের শব্দটা চেনে। ন্যাপাকে তো বিলক্ষণ চেনে। এই এলাকার নেতার ডান হাত। আর ইতিমধ্যে ন্যাপার খ্যাতিও ছড়িয়েছে এ মহলে।

তাই ন্যাপাকে ঢুকতে দেখে জয়সোয়াল যেন খুশীই হয়।—এসো—এসো নেপালবাবু। হঠাৎ গরীবের এখানে—

ন্যাপা এখানে নেপালবাবু বলেই স্বীকৃত। পিছনেই সমীরকে দেখে জয়সোয়াল থেমে যায়। ন্যাপার মত ডেঞ্জারাস মালের সঙ্গে ওই ছেলেটার চেনাজানা তা ভাবেনি জয়সোয়ালজী।

ন্যাপা বলে—আসতে হলো জয়সোয়ালজী—কান টানলেই মাথা ভি আসে। আমার গুরুর নোটগুলো ছাড়ো—তোমাদের কারবারে কে কাকে চৌপট করলো জানার দরকার নাই—কিন্তু আমার গুরুর খাটুনির পয়সা—মেরো না। দাও ওর টাকা—সাড়ে তিন হাজার। ওটা হজম করতে পারবে না।

জয়সোয়াল যে এত বিনয়ী হতে পারে তা ভাবেনি সমীর।

জয়সোয়াল বলে—আরে দেব না তাই বলেছি নাকি ? তোমার গুরু—তার টাকা সব দেব।

—তাহলে দিয়ে দাও। ন্যাপা বেশ স্পষ্ট স্বরেই বলে কথাটা।

জয়সোয়াল বলে—দুতিনদিন পর—আভি নেহি।

ন্যাপা বলে ওঠে—তাহলে দেবে না ?

ওর কণ্ঠস্বর চাহনিও বদলে গেছে। জয়সোয়াল হাঁ হাঁ করে ওঠে—না—না। এখন হিসাব করতে হবে—

ন্যাপা বলে—হিসাব তুমি ভালোই বোঝো, আর এটা বুঝছ না—তোমার আজ এক ট্রাক মাল আসবে বেলঘরিয়ার কারখানা থেকে,—সেটা এসে পৌঁছবে না। কত যাবে—ষাট হাজার টাকা। মালুম হ্যায় ?

চমকে ওঠে জয়সোয়াল। এবার সুর বদলে বলে—আরে রসিকতাও বোঝ না ? চটে উঠলে ? ঠিক আছে—।

এবার আলমারী খুলে জয়সোয়াল খাতা বের করে, তাতে সমীরের হিসাবটাও আছে। গুনে গুনে সাড়ে তিন হাজার টাকা বের করে সমীরকে দিয়ে বলে—সই করে দাও।

সমীর সই করে টাকাটা নেয়। জয়সোয়াল বলে—নেপালবাবু, মুখার্জি-বাবু আমার কারবার ডুবিয়ে দিল। তাই চলে এলো হামি। ভগবান হনুমানজীর কসম—পুরা লোকসান হোয়ে গেল। হ্যাঁ—খুশ তো নেপাল-বাবু ?

ন্যাপা বলে—ঠিক আছে।

ন্যাপাই সমীরকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যায়। বলে ন্যাপা—আমাকে পোস্তাতেই নবীনবাবুর আড়তে পাবে গুরু। ওখানেই আমার ঠেক। চলি—

ন্যাপা ওকে গলির মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তখন বৈকাল নামছে। সমীরের মনটা আজ বেশ খুশী। মনে হয় একজন কেউ আছেন যিনি দয়াও করেন মানুষকে, নাহলে সবই গেছলো, পথেই দাঁড়াতে হতো। কোথা থেকে ন্যাপা ঝড়ের মতো এসে পড়ে টাকাটা এক ধমকে আদায় করে দিল। ওই জয়সোয়ালদের মত মানুষরা সোজাপথে চলে না, ওদের অন্ধকারের ব্যবসা তাই অন্ধকারের দৈত্যদের খুশী রাখতে হয় তাদের।

গলির ওদিকেই পার্কে তখন বৈকাল নামছে। গাছগাছালির মাথায় পড়ন্ত সোনা রোদের আভা। সমীর এসে পার্কে একটা বেঞ্চে বসলো। সারাটা দিন খুব ধকল গেছে। হঠাৎ উমাকে আসতে দেখে চাইল। উমা ওকে দেখে এগিয়ে আসে—আপনি !

সমীর বলে—সবে ফিরছি। চারিদিকে এত আলো, এসময় বদ্ধ ঘরে গিয়ে ঢুকতে মন চায় না। তাই বসলাম এখানে। তুমি রোজ আসো ?

উমা বলে—হ্যাঁ। ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে। তবে বাবা যেখানে নতুন বাড়ি করছেন সেই জায়গাটা বেশ ফাঁকা। খোলামেলা।

সমীর বলে—তোমার জীবনে তবু মুক্তির আশা আছে—কিন্তু আমাকে এইখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তুমিও চলে যাবে।

উমা বসেছে বেঞ্চের এক দিকে। সলজ্জ চাহনিতে চাইল। শুধোয় সে—ব্যবসাপত্র কেমন চলছে ?

হাসে সমীর। বলে—একটা ব্যবসা করলাম এতদিন। ভাবলাম এটাতেই থাকবো, কিন্তু সে কোম্পানীই উঠে গেল মালিকদের ঝগড়ায়। আপাততঃ বেকার—অন্য কিছু করতে হবে। তাই ভাবছি কি করা যায়।

উমা বলে—ঠিক পথ পেয়ে যাবেন। মা বলছিল আপনি ঠিক দাঁড়াবেন জীবনে।

বৈকাল নামছে। সমীরের মনে পড়ে বীণার কথা। সেও তার পাশে এসেছিল, উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু জীবনের গতিপথ তাদের আলাদাই করেছে। উমাও একদিন চলে যাবে তার জীবন থেকে।

তার জীবনে পাওয়া নয় হারানোটাই পরম সত্য। আকাশে মেঘ জমেছে ওরা কেউ দেখেনি। হঠাৎ খেয়াল হয় কালো মেঘ সারা আকাশ ভরে দিয়েছে। লোকজনও পালাচ্ছে ঝড়ের ভয়ে।

আর ঝড়টাও এসেছে দমকা। উমা ভীতকণ্ঠে বলে—কি হবে ?

রাস্তার ধারের দোকানের একটা সাইনবোর্ড সশব্দে আছড়ে পড়ে। ধুলো উড়ছে—সঙ্গে আকাশ কাঁপিয়ে মেঘের গর্জন ওঠে। ভয়ে উমা সমীরের হাতটা ধরেছে। উন্মাদ ঝড়ে উড়ছে ওর শাড়ির আঁচল, এলোমেলো চুল।

সমীর ওর নরম হাতটা ধরে টেনে কোনমতে রাস্তা পার হয়ে গলিতে ঢোকে। সরু গলিতে ঝড় যেন তীরবেগে ছুটছে, ছিটকে ফেলে দেবে তাদের। কোনমতে উমাকে নিয়ে বাড়ি ঢোকে সমীর আর শুরু হয় শিলাবৃষ্টি।

বড় বড় শিল পড়ছে। জানলায় সার্সিতে লাগে, ছিটকে পড়ে শিলগুলো উঠানে। এর মধ্যে উমার ভাইবোন—অন্য ঘরের ছেলেমেয়ে বউরাও জুটেছে উঠানে, হৈ চৈ করে শিল কুড়োচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজছে সবাই হৈ চৈ করে কি দুর্বার আনন্দে।

উমাও খুশিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে—সমীরও। বৃষ্টি ভেজা উমার মুখে যেন পদ্মফুলের কমনীয়তা জেগেছে। সমীর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওই স্বপ্নময়ীর দিকে। জীবনের সব অভাব হতাশাকে যেন ভুল গেছে সমীর উমার সান্নিধ্যে এসে।

তাই নতুন করে বাঁচার পথই খোঁজে সমীর। এবার এসেছে সেই রবার কারখানায়, এখানে এর আগেও এসেছে। কাজ ছিল তার প্রডাকশন ডিপার্টমেণ্টে। এখন সে এসেছে বাতিল স্ক্র্যাপের সন্ধানে ওদের কারখানায়।

এদের কারখানায় টায়ার তৈরী হয় নানা ধরনের। স্কুটারের ছোট টায়ার—মটর সাইকেলের নানা মাপের মানা মানের টায়ার—মটরগাড়িরই বিভিন্ন রকম টায়ার, ট্রাকের ট্রাকটারের বিশাল টায়ার, মায় পঞ্চাশ ষাট টন পাথর বইবার ডাম্পারের বড় বড় টায়ার, এরোপ্লেনের টায়ারও তৈরি হয়।

রাশি রাশি টায়ার তৈরী হয়, এক একটার জন্য এক এক বিভাগ। সেখান

থেকে বাতিল রবারের ছাঁট যা বের হয় তাও কম নয়। দৈনিক কয়েক ট্রাক—যার বাদবাকী আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

ঠিকাদাররা ট্রাক বোঝাই স্ক্রাপগুলো নীলামে কেনে, সেখানে অনেক টাকার ব্যাপার। সমীর দেখে বাতিল স্ক্রাপের টুকরো আবর্জনার সঙ্গে পড়ে আছে।

চায়ের দোকানে বসে ভাবছে কথাটা। ওদিকে বেশ কিছু ছেলে হৈ চৈ করছে। সমীরের মাথায় বুদ্ধিটা এসে যায়। সে ওই ছেলেদের মধ্যে সর্দার গত দুটো ছেলেকে ডাকে। একটা লম্বা—মাথার চুলগুলো মিঠুনের মত, অন্যটা বেঁটে, বেশ পাকানো চেহারা।

সমীর বলে—ওই সব রবারের গুঁড়ো ছাঁট যা ওখানে পড়ে আছে তোরা দলবল নিয়ে কুড়োতে পারবি? সিমেন্টের বস্তা আমি এনে দোব, এক বস্তা কুড়িয়ে ভরতে পারলে পাঁচ টাকা বস্তা। দিনে আট দশ বস্তা করে ভরতে পারলে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা করে পাবি।

পানের দোকানদারও পয়সার গন্ধ পেয়ে বলে—কেন করবে না? ওসব তো পড়েই আছে। তুললে তো ভালোই হয়।

সমীর বলে—ওর দোকানের পিছনে গাদা করবি, বস্তা হিসাবে পয়সা দেব। আগাম দশ টাকা করে রাখ।

আর দোকানদারকে বলে—তোমার এখানে রাখবে—ফি বস্তা এক টাকা করে পাবে তুমি।

ছেলেটা কি ভেবে বলে—হবে। তবে বস্তা কই?

সমীর ওকে নিয়ে বাজারে এসে চুন সিমেন্টের দোকানে বেশ কিছু খালি প্লাস্টিকের সিমেন্টের বস্তা পেয়ে যায় আট আনা দরে। খান পঞ্চাশ বস্তাও কিনে ফেলে।

চায়ের দোকানী গজুও এবার ওই বস্তির ছেলেদের রোজগারের পথ করে দিতে পেরে খুশী হয়। তারও কিছু আমদানী হবে। ছেলেগুলোও কাজ পাবে। বদমাইশী কমবে তাদেরও।

সমীর বলে—তবে স্রেফ রবারের ছাঁটই চাই। অন্য মাল ঢোকালে পয়সা দেব না। বস্তার মাল দেখে তবে পয়সা দোব।

ওরা তাতেই রাজী। ছেলেগুলো জানে ওসব বাতিল মাল কোথায় বেশী আছে। সমীর গোটা পঞ্চাশ টাকা দমকা খরচা করে তার টিমকে কাজে নামিয়ে দেয়।

সমীর বলে—পরশু আসবো। এখানে মাটাডোর—ছোট ট্রাক মিলবে?

চায়ের দোকানী গজু বলে—হ্যাঁ। আমারই চেনা জানা ড্রাইভার আছে। ট্রাক মিলবে।

সমীর ওকে আরও কিছু টাকা দিয়ে বলে—আরও শতখানেক খালি বস্তা কিনে নিও। সব ভর্তি করতে হবে। মাল বেশী না হলে পোষাবে না। ট্রাক-ভাড়া তো কম নয় কলকাতা অবধি।

গজু বলে—ওসব হয়ে যাবে। নিদেন দেড়দুশো বস্তা মাল রেডি থাকবে কিরে মণ্টে ?

লম্বা ছোঁড়াটা বলে—হ্যাঁ গো ! তা হয়ে যাবে।

কাউল সাহেবকে আগেই বলে রেখেছিল সমীর—কিছু মাল আনার ব্যবস্থা করেছি।

কাউল সাহেব বলে—আনো। দর যা সকলকে দিই তাই তোমাকে ভি দেব। কিন্তু মাল পাবে কোথায় ?

সমীর তার মাল সংগ্রহের খবরটা জানায় না। বলে—দেখি, একজন কিছু দেবে বলেছে কাল।

সমীর তার নিজের ওই টাকা থেকেই খরচা করেছে, ওখানে গিয়ে ছেলেগুলো রাতারাতি রবারের আসলি ছাঁটই প্রায় শ দুয়েক বস্তা গাদা করে রেখেছে।

—কিরে, মাল সব ঠিক আছে তো ?

সেই লম্বা ছেলেটা বলে—দেখে লিন বাবু। একদম নম্বরী মাল।

গজুই ম্যাটাডোর ঠিক করে আনে। পুরো বস্তা তাতে লোড করে ওদের দাম মিটিয়ে গজুর টাকা দিয়ে বলে সমীর তার বাহিনীকে—আরও মাল এনে এখানে গাদা কর। যত পারিস। তিন-চার দিন পর আসছি বস্তা নিয়ে, সব লাদাই করে দাম মিটিয়ে মাল নিয়ে যাবো।

ওরা হাতে নগদ এতগুলো টাকা পেয়ে খুশী হয়। ওরা বুঝেছে এ কাজ করলে পয়সা তারা পাবে। তাই রাজীও হয়।

কাউল সাহেব মাল দেখে খুশী হয়। স্ক্রাপ রবারের থেকে ওইসব টুকরো রবারের মান অনেক উন্নত। টায়ারের ব্লক থেকে কাটাই করা মাল, এত সরেস মাল দেখে কাউল সাহেব ভালো দামই দেয় সমীরকে।

এক চালানে সমীর খরচ-খরচা তার লেবার এসব বাদ দিয়ে প্রায় নগদ তিন হাজার টাকা লাভ করে।

পরের বার কিন্তু এবার কারখানার কিছু লোভী ওয়াচম্যানদের নজরে পড়ে ব্যাপারটা। বেশীর ভাগ স্ক্রাপ মাল নীলামে বিক্রী হয়। বাড়তি ঝড়তি মালও ওই ছেলেগুলোকে কুড়োতে দেখে ক্রমশঃ তারা পয়সার গন্ধ পায়।

ফলে গজুই তাদের সঙ্গে রফা করে— কিছু তাদেরও দিতে হবে।

সমীর দেখে মাল গাদা করা হয়েছে ঠিকই। তবে আড়ালে কিছু ভাগীদারও জুটে গেছে, তাদেরও কিছু দিতে হবে। অবশ্য একটা আশার কথা —ওদের কিছু দিলে বাতিল ওই মাল নিরাপদেই তোলা যাবে।

সমীর তাই রাজী হয়। লাভের অংশ কিছু কমবে। তবে মালের যোগান ঠিকই থাকবে। তাই ওদেরও প্রণামী দেয় সমীর। তার মালপত্রও ঠিক আসতে থাকে।

কাউল সাহেবই তার মহাজন হয়ে ওঠে। সমীর প্রায়ই যায় ওখানে। দেখে তারই দেওয়া মালগুলো মোল্ড করে সিট বানিয়ে চারগুণ লাভে বিক্রী করছে কাউল সাহেব।

সমীরকে ন্যায্য দামই দেয়। তবে ইদানীং ওই স্ক্রাপ সংগ্রহের লাইনে তার বুদ্ধিটাকে অনেকে কাজে লাগিয়েছে আর কোম্পানীর কিছু অফিসারও জেনে গেছে যে ওর থেকেও বাণিজ্য শুরু হয়েছে, ফলে তারাও সমীরকে চাপ দেয়।

সাপ্লাই-এর কাজ চালু রাখতে হবে। ক্রমশঃ মাল সংগ্রহের অন্য চিন্তাও করছে সমীর। এখন দুটো পয়সার মুখ দেখছে সে। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

বাড়ি ফিরতে রাত্রি হয়ে যায়।

সেদিন ছুটির দিন, রবিবার। আজ বেরুবে বেলায়। সমীর শুয়ে আছে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চাইল। তাকে এখানে ডাকবে কেউ ভাবতেও পারে না।

উঠে দরজা খুলতেই সামনে দেখে সেই নবুমামাকে। একেবারে যেন ধূমকেতুর মত এসে উদয় হয়। পাকানো চেহারা—লগির মত লম্বা। আর বেশ কিছুদিন পর দেখছে তাই গাল দুটো মনে হয় আরও তুবড়ে গেছে।

—নবুমামা! সমীর অবাক হয়।

নবুমামা অবশ্য আপ্যায়ন আবাহনের অপেক্ষা করে না। সোজা ভিতরে এসে তক্তপোশে বসে। ফাটা কাঁসরের মত গলায় বলে ওঠে—চামার, চশমখোর, বেইমান।

সমীর অবাক হয়ে চাইল। কে জানে ওইসব বিশেষণ বোধ হয় তার উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু নবুমামা এবার দম নিয়ে একটা আধপোড়া বিড়ি কানের খাঁজ থেকে বের করে দেশলাই ঠুকে ধরিয়ে বলে—তোর দাদাদের কথা বলছি। দুটোই ওই-ই।

সমীরের মনে হয় মামা ওদের ওখানে পরিক্রমা সেরে এখানে এসেছে। শুধোয়—তা এতদিন কোথায় ছিলে? মাও চলে গেল—

খিঁচিয়ে ওঠে নবুমামা—যাবে না? যে সব রত্ন গর্ভে ধরেছে তাতে সংসার কেন ভূভারত ছাইড়া পালাইতে না হয়। সন্তান! উঃ দিদি চইলা গেল এই ভাবে? শুইনা চক্ষু জলে ভইরা আসে সমীর! একজন লাখপতি ব্যবসাদার, এক পোলা কলেজের প্রফেসর! বিদ্যাদান করস? মা-ভাইয়েরে দেখস না? এর চেয়ে মূর্খ হইলেই ছিল ভালো। তারপর মামা এক পায়ের উপর আর এক পা চড়িয়ে মৃদু মৃদু আন্দোলিত করতে করতে বলে—চা-টা আছে গিয়া?

নবুমামাকে শুনোয় সমীর—তা তুমিও তো এতদিন খোঁজ খবর নাও নি। আমার খোঁজই বা পেলে কি করে? দাদারা তো এখানের খবর জানে না।

নবুমামা বলে—তর দাদারাও এবার বুঝছে তরে তাড়াই কি মহা ভুল করছে। দোকানে শুনি লুটপাট চলছে। চলুক—তর খবর দেছে ন্যাপাল। তা শুনি এহন ব্যবসাপাতি ভালোই করছস? আমিও ছিলাম না এহানে। ঝরিয়ার ওদিকে এক সিমেন্ট-লোহা কারবারীর আড়তে কাজ-কাম করছিলাম—চইলা আইলাম। ব্যাটারা বড় বড় লোহা কারখানার ওয়াগন ভাঙ্গা চোরাই

মাল কেনে। হালায় পুলিশের সাথে বখরার গণ্ডগোল হতি—ওরা রেইড কইরা মালিকের ভাই-ভাতিজাদের ধরছে। আমিও বেগতিক দেইখা কাইটা পড়ছি। ভাবছি, কলকাতাই ভালো। ওই ডাকাতের দ্যাশে—অয় বাপ্! আর যামু না।

মামা যেন কোন মতে ওর স্রেফ বাপুতি পরানটা নিয়েই কেটে পড়েছে।

চা করতে যাবে। এমন সময় ঘরে ঢোকে উমা!

নবুমামা চাইল।

সমীরই বলে—এ আমাব নবুমামা, মামা—এ উমা! পাশেই থাকে এরা।

উমা বলে—চা করেননি তো? চা হয়েছে—আনছি।

সমীরের সকালের বেডটি ওইই দেয়।

সমীর বলে—আবার কষ্ট করবে?

নবুমামা চায়ের কাপ হাতছাড়া করতে চায় না। বলে সে—আনতি চাইছে আনো মা। পরে না হয় আবার তুই করস।

তা কি করছিস এহন সমীর—কাজ-কাম!

সমীর এখন ব্যবসা মোটামুটি করছে। তবে তার মাথায় আছে এখানেই নয় বাইরে থেকেও অর্থাৎ মাদ্রাজ-কেরলের দিকে নাকি প্রচুর মাল ওরা ফেলেই দেয়, সেই সব মাল আনতে হবে। এখানের সাপ্লাই লাইনও রাখতে হবে। তাই নিজের একজন চালু লোক দরকার যে এদিকটা সামলাতে পারবে—আর সমীর বাইরে থেকে মাল আনবে।

পরে তার অবস্থা একটু ভালো হলে ট্যাংরার দিকে জায়গা নিয়ে নিজেই একটা ছোটখাটো মোল্ডিং-এর কারখানা খুলবে।

তাহলে তার ডবল লাভই হবে। ওসব মালের বাজারও জানে সে। কাউল সাহেব ছাড়াও আরও দু' একজন কারখানা মালিকের মধ্যে তাকে পাকড়াও করেছে মালের জন্য, কিছু দাদনও দিতে চায়। কিন্তু কারো ঘরে বাঁধা পড়তে চায় না সে।

এর মধ্যে উমা চা বিস্কুট দিয়ে গেছে। উমার ভাইও এসে ঘুরে গেছে। রবিবার সেও সমীরদার এখানে আসে। স্কুল নাই।

সমীর চা খেতে খেতে বলে—আমার সঙ্গে কাজ করবে নবুমামা? তবে এখন মাইনেপত্র খুব বেশী দিতে পারব না। কোন মতে চলে যাবে।

নবুমামা যেন হাতে স্বর্গ পায়। বলে—জানতাম তুই তর দাদাদের মত বেইমান চামার নোস। দিদি যদি এহন থাকতো? বরাতে সুখ নাই তার!

সমীর বলে—আমার কাজে ট্যাংরা ও বাইরের কারখানাতে ঘুরতে হবে। লোকজনদের সব চিনিয়ে দেব, বলে দেবো, সেইমত কাজ করতে হবে।

মামা বলে—খুব পারুম। চল—আজ আমার বাড়ি হই যাবি।

সমীর অনেকদিন কারো বাড়িতে যায় নি। ইচ্ছা করে বড়দার ওখানে যেতে, রঞ্জনার কথা মনে পড়ে। মেয়েটা তার খুব ন্যাওটা ছিল। প্রবীর—তার

ভাইপো অবশ্য মায়ের মতই। সব সময়ে যেন নাক উঁচু করে আছে। চকোলেট দিলে রঞ্জু তাই নিত সাগ্রহে, কিন্তু ছেলেটা বলতো—ওসব খাই না। বোগাস মাল।

মা চলে যাবার পরও এখানে থেকেও দু' একবার গেছে সমীর ওখানে। একটা আশা নিয়েই গেছে, মনে হয় দেখবে মাকে। মা তো ওই ঠিকানাই চেনে, হয়তো ফিরেছে।

কিন্তু বড়বৌদি নিচে থেকেই কথা বলেছে দু' একটা। দাদা দেখে তাকে মাত্র। কেমন আছিস তাও শুধোয় না। সুবীরের মনে হয় ও কোন মতলবেই এসেছে। তাই পাত্তা দিতে চায় না।

সমীরও দেখেছে বৌদি বলে আগে থেকেই—টাকা পয়সার খুব টানাটানি চলছে, ব্যবসাও মন্দা। বাড়ি করে দেনায় পড়ে গেছি। এসো ভাই।

ওদিকে বাড়িতে মাংস রান্নার সুবাস ওঠে। ওকে খেতেও বলে না। এক কাপ চাও দেয় না।

সেদিন সমীর বের হয়ে আসছে। হঠাৎ বৌদির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রবীরকে বলছে—ও এলে পার্স টাকা পয়সা সামলে রাখবি: রঞ্জনা, তোকে আদর করছিল, গলার হারটা ঠিক আছে তো? কি মতলবে আসে কে জানে?

সমীর বের হয়ে আসে। আর তারপর অনেকদিন যায় নি। মেজদার বাড়ির দিকেও যায় না। ওদের সঙ্গে তার মানসিক ফারাক অনেক। তাই সমীরও নিজেকে দূরেই রেখেছে।

নবুমামাই নিয়ে চলেছে তাকে তার বাসায়। গড়পারের দিকে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা বস্তিই বলা যায়! সরু পথটা ঢুকেছে বস্তিতে। গিঞ্জি বস্তি—আবজর্নার স্তূপ এদিকে। ওর মাঝে একটুকরো পথে ছেলেপুলেরা খেলছে। তাদের মুখের ভাষাও নানা বিশেষণে ভরা।

নবুমামা বলে—সাবধানে আইবি। পথ তো নয় নর্দমাই, হালাদের জ্ঞান গম্যিও নাই। এক্কেবারে নরক বানাইয়া রাখছে।

ওকে নিয়ে ভিতরে যায়—একটা বস্তির ঘরের দাওয়ায় একটি মহিলা বসে চাল বাছছিল। নবুকে দেখেই ফুঁসে ওঠে—কাকভোরে উঠে কোন চুলোয় গেছলা? গুষ্ঠির পিণ্ডি যোগাইব কে? মুখপোড়া—

নবুমামা বলে—আরে থামো। কারে আনছি দ্যাখো।

—কুন চৌদ্দপুরুষেরে আনছো যে পাদ্য অর্ঘ দিই পুজো করতি হইব?

পিছনে সমীর হতবাক হয়ে শুনছে ওই ভাষণপর্ব। এমন সময় ঘরের ভিতর থেকে একটা ছেলে বের হয়ে তার পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে যেন ধাক্কা দিয়েই চলে গেল।

নবুমামা চীৎকার করে—আরে সমীর, ধরো, ধরো ওইটারে। ব্যাটা এহন থেকেই পাকা পকেটমার হইছে, দ্যাহো সাফ করছে নাকি।

সমীর ওই পকেটে খুচরো কিছু রেখেছিল, বাকী খান পাঁচেক দশ টাকার

নোট রেখেছে বুক পকেটের পিছনে ভিতরের পকেটে। সেই খুচরো তিনচার টাকাই গায়েব। নাঃ হাত সাফাই আছে ছেলেটার।

সমীরকে একটা মোড়া বের করে দেয় নবুমামা—বও।

নবুমামা সেই মহিলাকে বলে—আমার ছোট ভাগ্নে সমীর, এহন বিজনেস করছে। ওখানেই কাম করুম। গলা নামিয়ে বলে—চা হইব নাকি ?

মামী এবার চুপ করেছে। দেখছে সমীরকে। সমীর বলে—না—না। ওসবের দরকার নাই। মামা—তোমার আস্তানা দেখে গেলাম। তুমি পরে বাসায় এসো। কথা হবে। এখন জরুরী কাজে বের হতে হবে। চলি।

কোনমতে ওইখান থেকে বের হতে পারলে যেন বাঁচে সমীর। নিদারুণ দারিদ্র্যকে সে দেখেছে। কিন্তু এখানে যা দেখেছে সেটা আরও করুণ। তবু মানুষ বেঁচে আছে। বাঁচার চেষ্টাও করছে। সমীরকেও জীবনে কিছু করতে হবে।

নবুমামার জন্য আজ সেও দুঃখ বোধ করে, মানুষটা জীবনের যুদ্ধে পদে পদে ঘা খেয়েও হাসিমুখে চলার চেষ্টা করে। বাঁচার জন্য উঞ্ছবৃত্তি কিছু করে, কিন্তু সেটা না করে উপায় নাই—তাই।

অভাবই মানুষকে এসব করাতে বাধ্য করে, যেটা করতে চায় না কেউই।

তবু সমীরের মনে হয় সে মাথা উঁচু করেই চলবে। জীবনের এই লড়াইয়ে সে হার মানবে না, নিজের ব্যক্তিত্ব আদর্শকে বিলিয়ে দেবে না। নবু-মামাকে কাজ কিছু দিতে পারলে একজন মানুষকে একটু শান্তিতে বাঁচার পথ দেখাতে পারবে সে।

হরি মুখার্জি ইদানীং টায়ার টিউবের ব্যবসা ছোট করে এনেছে! আগে যেমন বাইরের শহরে মাল পাঠাতো—লোক পাঠাতো এখন সেগুলো করে না। কলকাতা তার আশপাশের খদ্দেরদের নিয়েই ব্যবসা কোনমতে টিকিয়ে রেখেছে সে।

দোকানটা আছে। সমীর মাঝে মাঝে দোকানে আসে। মুখার্জি বলে—জয়সোয়াল গেছে ভালোই হয়েছে। তা তুমি তো ভালোই কাজ-কারবার করছো শুনি।

সমীর বলে—টুকটাক করছি। তবে মূলধন পেলে মাদ্রাজ-কেরল থেকে মাল আনতাম। একটা ছোট কারখানা করতে পারলে নিজেরাই সিট বানিয়ে বাজারে বেচতাম। লাভও হতো অনেক।

হরি মুখুয্যে ব্যবসা বোঝে। সেও কথাটা ভেবেছে। রবারের লাইনে এখন ভালো পয়সা, আর সমীরের মত ছেলে একদিন দাঁড়াবেই, ওর মাথা আছে, নিষ্ঠা আছে আর পরিশ্রম করতে পারে। সুতরাং ওকে কেউ আটকাতে পারবে না।

হরি মুখুয্যেদের ব্যবসা সেইই বাড়িয়েছিল। হরি মুখুয্যে বলে—তা জায়গা দেখেছো ? কারখানার জন্য জায়গা ?

—টাকা কোথায় ? সমীর বলে—টাকা থাকলে ট্যাংরার দিকে জায়গা এখনও মিলবে কম দামে। তারপর শেড তৈরী, যন্ত্রপাতি, ডাইস বসানো—কাঁচামাল-এর খরচা এসব তো আছে। সব মিলিয়ে কম করে লাখখানেক তো বটেই—দেড় লাখই বলা যেতে পারে—দরকার।

হরিবাবু ভাবছে কথাটা।

সমীর বলে—কয়েক ক্ষেপ মাল বেশী করে মাদ্রাজ থেকে আনতে পারলে হাতে কিছু ক্যাশ আসবে। তখন ভাবা যাবে। এখন ওসব স্বপ্নই।

হরিবাবু বলে—মাদ্রাজ থেকে মাল আনো।

সমীর বলে—সেখানেও টাকার ব্যাপার। এদিকে কাউল সাহেবের কাছেও টাকা পড়ে আছে অনেক। পাচ্ছি না—তারপর এখানের সাপ্লাইও রাখতে হচ্ছে। টাকা কোথায় পাবো যে ওখানে যাবো ?

হরিবাবু বলে—টাকা আমি দিচ্ছি।

অবাক হয় সমীর—আপনি দেবেন টাকা ?

হরিবাবু বলে—আমাকে টাকা ফেরৎ দেবে আর লাভের চার আনা বখরা।

সমীর বলে—যদি লোকসান হয় ?

হরিবাবু বলে—ব্যবসাতে লাভ লোকসান তো আছেই। তবে আমার টাকা তুমি মারবে না তা জানি। বলো রাজী ?

সমীর ভাবতে পারেনি যে এভাবে টাকা আসবে। ওদিকে কাউল সাহেবও যেন সমীরের মতলবটা টের পেয়ে গেছে। সমীর ওকেই মাল দেয়, কাউল সাহেব প্রতি ক্ষেপেই কিছু কিছু টাকা হাতে রাখে। এমনি করে বেশ কিছু টাকা. যেটা তার লাভ সেটা ওখানেই রয়ে গেছে। আদায় করতে পারেনি।

কাউল সাহেব জানে সমীর যদি দক্ষিণ থেকে মাল আনতে পারে তার পিছনে অন্য মহাজন ছুটে যাবে। মাল তাকেই দেবে, তাই সমীরকে এই ভাবে আটকে রাখতে চায়।

সমীর অনেক করেও টাকাটা বের করতে পারেনি। কাউল সাহেব নানা টালবাহানা করছে টাকা দিতে।

এমন সময় হরিবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখে সমীর বলে—আমি রাজী।

—কত টাকা লাগবে ?

সমীর যাতায়াত, ওখানে হোটেলে থাকা, ঘোরাফেরা, মালের জন্য কিছু টাকা, গাড়ি ভাড়া, এসব হিসাব করে বলে—এখন হাজার বিশেক হলেই চলে যাবে।

হরিবাবু রাজী হয়ে যান।

সমীর এগিয়ে যাবার স্বপ্নই দেখে, পিছনের স্মৃতি, ইতিহাস মায় হিসাব অবধি ভুলতে চায়। এবার দক্ষিণের দরজা যদি খুলতে পারে সে কিছু করতে পারবে।

খুশি মনেই বাড়ি ফেরে সমীর। আজ সে এই খুশীর খবর জানাতে চায় উমাকে।

উমা নেই। সন্ধ্যায় সে গানের ক্লাশে যায় মাঝে মাঝে। মাসীমাই বাড়িতে ছিল। সমীর বলে—মাসীমা, কিছুদিনের জন্য মাদ্রাজ, কেরলের দিকে যাচ্ছি ব্যবসার কাজে। আশীর্বাদ করুন যেন কাজ ঠিকমত করে ফিরতে পারি।

মাসীমা দেখছে ওকে। বলে—আশীর্বাদ করি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও বাবা। জানি একদিন মস্ত লোক হবে তুমি। ভগবান মুখ তুলে চাইবেনই।

সমীর মাসীমাকে প্রণাম করে। এ যেন তার মায়েরই আশীর্বাদ। সমীর বলে—মা নেই। আপনার কথা শুনে মাকে মনে পড়লো। আজ মা থাকলে এই কথাই বলতো।

মাসীমা বলে—আমি তোমার মায়ের মতই।

নবুমামাও যথারীতি আসছে। সমীর তাকে হরিবাবুর দোকানের পাশে একটা ঘরে বসার ব্যবস্থা করেছে। তাকে কাউল সাহেবের ওখানেও নিয়ে গেছে। বলে—চাচা, কিছুদিনের জন্য একটু ব্যস্ত থাকবো, বাইরে যাচ্ছি। এই আমার মামা, উনিই মালপত্র সাপ্লাই দেবেন। কিছু খরচাও দেবেন ওকে। পরে এসে হিসাব হবে।

কাউল সাহেব বলে—দক্ষিণে যাচ্ছো ?

সমীর বলে—মাল যদি পাই আপনাকেই দেব। টাকা রেডি রাখবেন। এক চালান মাল এলেই টাকা পাঠাতে হবে, বিদেশ জায়গা—ক্যাশ টাকা না হলে কাজ হবে না।

কাউল সাহেব বলে—জরুর। ও মালের সব টাকা ক্যাশই দেব।

নবুমামাকে এখানের কারখানায়, গজুর দোকানেও নিয়ে যায় সমীর। নবুমামা তো গজুর রীতিমত ইয়ার হয়ে ওঠে। বলে, নবুমামা এদিকের হাল-চাল বুঝে।

—এখানের মালের জন্য ভেবো না বাবাজী। সব ঠিকঠাকই যোগান দিমু।

সমীর বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে। এর আগে সে এতদূরে যায়নি। অচেনা জায়গা।

উমা বলে—সাবধানে থেকো।

সমীরের মনে হয় হঠাৎ উমা যেন তার শূন্য জীবনে একটা ঠাঁই করে নিয়েছে। বীণা চলে গেছে, তার জায়গায় এসেছে উমা। বলে উমা—মাকে চিঠি দেবে।

—তোমাকে ?

উমা সলজ্জ হেসে বলে—কেউ জানতে পারবে। তুমি মাকে চিঠি দিও—কেমন থাকো জানাবে। ঠিকানা দিও—আমিই তোমাকে চিঠি দেব। তোমার আমাকে চিঠি দিতে হবে না।

সমীরের হাতটা উমার হাতে। ওই স্পর্শটুকুই সমীরকে যেন কি শান্তি দেয়।

সমীর বলে—সাবধানে থেকো।

হরি মুখুয্যেই টাকাটা দেয়। সমীর মাদ্রাজ মেলে উঠলো। সামনে তার দূরের পথ। সন্ধ্যা নামছে। সমীর কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিল মাদ্রাজের দিকে। এর মধ্যে কয়েকটা কোম্পানীর নাম ঠিকানাও পেয়েছে। তাদের কাছে যেভাবে হোক তাকে সাহায্য পেতেই হবে।

নিঃসঙ্গ এক সৈনিক। মা হারিয়ে গেছে, বাবা আগেই গেছেন। দাদা-বৌদিদের সংসার থেকেও বিতাড়িত। জীবনে সে একা—তাকে এগিয়ে যেতে হবে একাই।

রাতের অন্ধকারে ট্রেনটা ছুটে চলেছে অজানা পথ-প্রান্তর পার হয়ে। ভূগোলে চিল্কা হ্রদের নাম শুনেছিল। ভোর হচ্ছে—ট্রেনটা চলেছে চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়ে, সবুজ বন—পাহাড়। দিনের আলোয় দেখা যায় কোন পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির।

ওড়িশা ছাড়িয়ে ট্রেন অন্ধ্রপ্রদেশে ঢুকেছে। ওয়ালটেয়ার ছাড়িয়ে চলেছে—রাতে গোদাবরী পার হয়। বিশাল নদী।

রাত নামে—দিনরাত কেটে গেছে ট্রেনে। কোন অজানা দেশে চলেছে সমীর। ট্রেনের যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কি বিচিত্র ভাষায় কথা বলছে।

ওদের ভাষাও বোঝে না সমীর। নেহাৎ কিছুদিন বিদেশী কোম্পানীতে মাল কেনাবেচা করেছে—চিনে পাড়াতেও যাতায়াত করেছে। ফলে কাজ চলার মত ইংরাজী, টুটি ফাটা হিন্দী বলতে পারে। তাই ভরসা করে এদেশে এসেছে। তবে সমীর স্কুল পাঠশালায় খুব বেশী না পড়লেও জীবনের পাঠশালায় অনেক বিচিত্র পাঠই সে নিয়েছে। তার বুদ্ধিটাও তীক্ষ্ন, দু' দিনের মধ্যেই পাশের তামিল সহযাত্রী পরিবারের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে। নামটাও জেনেছে কি যেন পদ্মানাভাইয়া। ওদের নামের আগে বাবার নাম, গাঁয়ের নাম, তারপর উপাধি থাকে। নামগুলো খুবই কড়মড় গোছের। ওই পদ্মনাভাইয়ার স্ত্রীও বেশ বয়স্কা। পদ্মনাভাইয়া ট্রেনেই স্নান সেরে বেশ খানিকটা বিভূতি কপালে লেপে অনেকক্ষণ ধরে সংস্কৃত শ্লোকই আওড়ায়। ওদের ওই সংস্কৃতের উচ্চারণও আলাদা।

ওর স্ত্রী কলাপাতায় কিছু ভেজিটেবিল পোলাও জাতীয় খাবারও দেয় সমীরকে। বলে—পুলিভোরা।

পদ্মনাভাইয়া খেতে খেতে বলে—গুড্ড-অ ফুড্ড-অ।

তিলতেলের গন্ধ ছাড়ে। তবু সমীর খায়। সব খাওয়াতেই অভ্যাস করতে চায় সে। এদেশে ভাত প্রধান খাবার, তবে সঙ্গে ডালের মত বস্তুকে বলে সম্ভরম্। টক আর কাঁচালঙ্কার ছড়াছড়ি। ওদের কাছেই দুচারটে তামিল ভাষা, সংখ্যা অর্থাৎ এক দুই-এর মত আজ্ঞে, মুড়ে—এসবও শিখেছে। ভাতকে বলে স্বাপরম্, আর বেশ কিছু কথা। মনে হয় তার এদেশে ব্যবসা করতে গেলে আগে এদের ভাষা, কিছু আচার-ব্যবহারকেও জানা দরকার। নাহলে এদের কাছাকাছি আসা সহজ হবে না।

সমীর দেখেছে ট্রেনে ওরা বেশ রক্ষণশীল জাত। আর ধর্মভীরুও।

অর্থের প্রাচুর্য থাকলে তার বহিঃপ্রকাশ কম। পোশাক বলতে সাধারণতঃ সাদা থান কাপড়কে লুঙ্গির মত পরে, একটা ফতুয়া, কাঁধে একটা তোয়ালে, পায়ে স্যাণ্ডেল। অবশ্য স্নানের পর উচ্চবর্ণের প্রায় সকলেই পূজা পাঠ করে। তাই কেউ কপালে শ্বেত চন্দন প্রধানতঃ বৈষ্ণব হলে, শাক্ত হলে রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরে। কেউ কপালে কোন দেবতার বিভূতি লাগায়।

চলতি ট্রেনেও যথাসম্ভব ওগুলো সারে।

পরদিন সকালে মাদ্রাজ সেণ্ট্রালে এসে ট্রেন ঢুকলো। আপাততঃ যাত্রা বিরতি। এরপর সমীরের আসল অভিযান শুরু হবে।

পদ্মনাভাইয়ার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে আসে। দেখে পদ্মনাভাইয়ার গাড়ি এসেছে। উর্দিপরা সোফার। পদ্মনাভাইয়া বলে—আমার চেনাশোনা লজেই তোমাকে ছেড়ে যাবো। এখন গিয়ে রেস্ট করো। পরে কথা হবে।

ঝকঝকে শহর। ফুটপাথ পরিষ্কার। সাজানো দোকানপশার। কিছুটা এসে এগ্‌মোর অঞ্চলে একটা তিনতলা বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। সাইনবোর্ড রয়েছে পিওর হিন্দু লজ।

কাউণ্টারের লোকটির পোশাকও ওই লুঙ্গি ফতুয়া—দশাসই চেহারা। কপালে তিনটে সমান্তরাল রেখায় বিভূতির দাগ। পদ্মনাভাইয়াকে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। ওদের ভাষায় দুচারটে কথাও হয়। লোকটা একদিকে নয় ঘনঘন দুদিকে মাথা নাড়িয়ে চলে।

পদ্মনাভাইয়া বলেন—চল্লিশ টাকা ডেলি নেবে ঘরভাড়া।

সমীর নিশ্চিন্ত হয়। ভেবেছিল অনেক বেশীই হবে। অবশ্য এটা হয়েছে পদ্মনাভাইয়ার জন্যই।

সে কিছু টাকা জমা দিতে দোতলায় একটা ঘরে নিয়ে গেল বেয়ারা। পিছনের দিকেও একটা রাস্তা। বেশ খোলামেলা ঘর, অবশ্য বাথরুম টয়লেট ওদিকে। তবে বেশ ঝকঝকে। জলও রয়েছে।

দুদিন ট্রেনে কেটেছে, খাবার দোকান নীচেই। এখানে শুধু কফি স্ন্যাকস্ সার্ভ করা হয়। স্নান সেরে নিচের হোটেলে খেয়ে এসে বিছানায় শুতে চোখ বুজে আসে সমীরের।

সন্ধ্যায় পদ্মনাভাইয়া আসেন অফিসফেরত। সমীর অবশ্য ট্রেনেই তাঁকে মাদ্রাজ আসার কারণটা বলেছিল। সেই সঙ্গে তার বিচিত্র জীবনকাহিনীও শুনিয়েছিল কিছু কিছু। আজও মাকে সে খোঁজে—মনে হয় দূর পথের কোণে কোথাও হয়তো তার মা আজও তার পথ চেয়ে আছে।

মাকে পায়নি। পদ্মনাভাইয়ার চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

—সো ইউ লস্ট ইয়োর মাদার?

সমীর মাথা নাড়ে। তার জীবনের লড়াইয়ের কথা, এদেশে আসার কারণটাও বলে।

—রবার স্ক্রাপ শুনেছি এখানে ফেলে দেয় বড় বড় টায়ার কোম্পানী।

যদি সেই বাতিল মাল পাই তারই সন্ধানে এসেছি।

পদ্মনাভাইয়া কি ভাবছেন। তার নিজের ব্যবসা অন্যসব জিনিসের। ইলেকট্রিক গুডস-এর হোল সেলার। নিজের একটা কারখানাও আছে। রবারের লাইনের ব্যবসা তাঁর নয়। হঠাৎ মনে পড়ে সম্বন্ধী এক বিরাট টায়ার কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী। দু' একজন আত্মীয় আর একটা টায়ার কোম্পানীতে কাজ করে।

যদি ছেলেটার জন্য তারা কিছু করতে পারে খুশী হবেন পদ্মনাভাইয়া। স্ত্রীকে বলতে মহিলাও বলেন—দ্যাখোনা ওদের বলে।

পদ্মনাভাইয়া সেই ব্যাপারেই এসেছেন সমীরের লজে। সমীর এর মধ্যে শহরটা কিছু ঘুরেছে। এখানে দেখে বসতি এলাকাতেও সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। কলকাতার মত রকবাজীর প্রচলন এখানে নেই। সকলেই কাজ করে, নাহয় কিছু রোজগারের জন্য ধান্দা করে।

পদ্মনাভাইয়া বলেন—দু তিনটে চিঠি দিচ্ছি, তুমি চলে যাও কালই সেখানে। ওইদিকে পাশাপাশি শহরে দুটো বড় টায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী আছে। ওখানে সস্তায় থাকার লজও পাবে, খাবারও পাবে। তবে নিরামিষ। ওদের সঙ্গে দেখা করো। যদি কিছু করা যায় ওরা তোমার জন্য তা করবেন আশা করি।

চিঠিগুলো সমীরকে দেন। কিভাবে যেতে হবে তাও বলে দেন।

মাদ্রাজের এগমোর অঞ্চল থেকেই মিটার গেজের গাড়িগুলো ছাড়ে। এই ট্রেনগুলো কিছু ছোট আকারের। তবে গতিবেগ মন্দ নয়।

সমীর এবার চলেছে মাদ্রাজ ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণের দিকে। মাদ্রাজের সঙ্গে বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যে যেন কিছুটা মিল খুঁজে পায় সে। মাঠে মাঠে সোনা ধান, আখ-কলাগাছের ক্ষেত, নারকেল বনে হাওয়া কাঁপে। শুধু মাঝে মাঝে পাহাড়গুলো মাথা তুলে আছে।

স্বাধীনতার পর এরাও পিছিয়ে নেই। এমনিতে খুব মিতব্যয়ী আর পরিশ্রমী এরা। জীবনযাত্রাও খুবই সহজ সরল। খাবারও খুব সহজ। ফলে এরা উন্নতি করেছে চাষবাস, লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যেও। ব্যয় করে কম, আয়টা বেশী—তাই বাঁচাতে পারে।

মাঝে মাঝে ছোটবড় নানা ধরনের কারখানাও গড়ে উঠেছে। ট্রেনেই পাওয়া গেল প্যাকেট করা কার্ডরাইস। অর্থাৎ দই মাখানো ভাত। তাই সকলে তৃপ্তিভরে খাচ্ছে, সঙ্গে দু একটা বড় সাইজের পাকা কলা। সমীরও তাই খেল। দুপুরে ওই লাঞ্চ করে অনেকেই।

বৈকাল নাগাদ পৌঁছলো সে। স্টেশনের ওদিকেই তিরিশ টাকায় একটা থ্রি বেডরুমও মিললো লজে। অবশ্য সঙ্গে দুই দক্ষিণী ভদ্রলোক কোন কোম্পানীর সেলসম্যানও রয়েছে। তবে এরা খুবই শান্তিপ্রিয় আর নির্বিরোধী। যে যার কাজ থেকে ফিরে কফি খেয়ে আবার কোথায় বের হয়ে গেল।

সমীরও বের হলো লজ থেকে ওই পদ্মনাভাইয়ার সেই আত্মীয় মিঃ রামানুজমের সঙ্গে দেখা করতে।

ছোট্ট শহর। মূলতঃ ওই বিশাল ফ্যাক্টরীকে কেন্দ্র করেই সবুজ পরিবেশে এই শহর গড়ে উঠেছে। দুচারটে লজ, বাজার, দোকানপত্র, খাবার হোটেল, কফি শপ্—এসবও আছে! ওদিকে টাউনশিপ। ঝাউ-নারকেল গাছের প্রাধান্যই বেশী। সাজানো কোয়ার্টার, সামনে বাগান। ওদিকে লেবারদের তিনতলা ব্যারাক মত। খেলার মাঠ, পার্ক—এসবও করেছে কোম্পানী।

সমীর খুঁজে খুঁজে মিঃ রামানুজমের বাংলোটা বের করে। সামনের বাগানেই গার্ডেন চেয়ারে বসে ছিলেন তিনি, চিঠিখানা পড়ে সমীরকে বসতে বলেন।

মিঃ রামানুজমও সামান্য অবস্থা থেকেই নিজের প্রতিভা, বুদ্ধি আর পরিশ্রমে আজ বড় হয়েছেন। তাই জীবনের লড়াইটাকে ভালো করেই চেনেন।

কফিও আসে। রামানুজম শুধোয়—তোমার জন্য কি করতে পারি?

সমীর এবার তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা জানাতে থাকে। বলে সে—তোমাদের কারখানার স্ক্রাপ আমি নিতে চাই।

রামানুজম বলেন—ওটা আমি ডিল করি না। আমার সেকসন-ইনচার্জই করেন। তুমি কাল দশটায় অফিসে এসো। ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তখন কথা বলো—কিছু করার থাকলে নিশ্চয়ই করবেন তিনি।

সমীর যেন আশার আলো দেখতে পায়। হাল্কা মনে লজে ফেরে। শহরের পথ নির্জন হয়ে এসেছে। ওদিকে ফ্যাক্টরীর চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হয়ে রাতের আকাশ ভরিয়ে তোলে। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল। তাই ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি চলেছে।

রাতে ফের কলকাতার কথা মনে পড়ে। এখন উমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া চলছে। সেই মেয়েটির ডাগর দুচোখ যেন দূর থেকেও তাকে কি আহ্বান জানায়। অনেক কথাই বলার ছিল তাকে। কিন্তু তাকে চিঠি লেখা যাবে না! তাই মাসীমাকেই পৌঁছানো সংবাদ ও এখানের কাজের খবরই দেয়। তবু উমা দেখবে এই চিঠি। সেইই তাকে এখানে চিঠি লিখবে। চিঠির মাধ্যমেই উমাকে নিবিড় করে কাছে পাবে সে।

মাসীমাকেই চিঠি লেখে সমীর, আজ নবুমামাকে ও হরিবাবুকে জানায় তার এই লজের ঠিকানা, কাজের খবরও দেয়। নবুমামাকে নির্দেশ দেয়—কাউল সাহেবের কাছে পেমেণ্ট নিয়ে যেন ওখানের কারখানায় পেমেণ্ট করে ওখানে স্ক্রাপ ঠিকমাত সাপ্লাই দিতে থাকে। এখানের মালের ব্যবস্থা হলেই ট্রান্সপোর্টে মাল যাবে।

ভোর হয়েছে। সমীরের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় এক বিচিত্র সুরে। কে যেন আর্তনাদ করছে। কোন সাংঘাতিক বিপদই ঘটে গেছে। সমীর ঘুম চোখে ওপাশের খাটের দিকে চাইতে চমকে ওঠে। মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছে—পা

দুটো ওপরে বোধহয় কড়িকাঠে লটকানো। হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে লোকটা ঝুলছে আর ওপাশে তারই সঙ্গী আর্তনাদ করে ওদের ভাষায় যেন কাঁদছে। তার ঘরেই এই সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। ভোরেই খুন করেছে কেউ, তারপর ওভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে। অন্যজন কান্নাকাটি করছে।

সমীর চমকে ওঠে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। ঘরে এই কাণ্ড, এরপর পুলিশী হাঙ্গামা হবে। ব্যবসা করতে এসে এভাবে বিপদে পড়বে ভাবে নি। ঘুমচোখেই সমীর এপাশের দরজা দিয়ে ছুটে বের হয়ে আসে।

নিচের কাউণ্টারে ভদ্রলোকও সদ্য ধূপ জেবলে দেওয়ালের তাকে রাখা গণপতি, মহালক্ষ্মী, তিরুপতিজীর মূর্তিতে আরতি করছে। সমীর ঢুকে বলে—মার্ডার! মার্ডার হয়ে গেছে ঘরে!

লোকটা চমকে ওঠে—হোয়াট! মার্ডার! ইন ইয়োর রুম?

আরতি রইল পড়ে। সেও বেয়ারা একজনকে নিয়ে সমীরের সঙ্গে ওই বিপুল বপু নিয়ে উপরে উঠে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখে ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। বলে—হোয়াট মার্ডার স্যার! দে ডুয়িং যোগা—শীর্ষাসনম্, এনাদার জেণ্টেলম্যান নট ক্রায়িং—রিডিং ভাগবতগীতা। নো ফিয়ার—দে অল রেলিজিয়াস পিপল।

সমীর দেখে সেই হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ কালো মুগুরমার্কা চেহারার ভদ্রলোক ঠ্যাং নামিয়ে মাথা তুলে এবার সিধে হয়ে দাঁড়ায়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিও গীতা পাঠ বন্ধ করে চাইল!

সমীরও নিশ্চিন্ত হয়।—তাহলে যোগব্যায়াম করছিলেন ওইভাবে? আর গীতাপাঠও হচ্ছিল। রিয়েলি সরি।

বিপদমুক্ত হতে হোটেল মালিক বলে—ও কে। নমস্কারম্—

সে চলে গেল। দুই মূর্তি এবার নীরবে নিচে নেমে গেল কফি খেতে। তারপরই বেরুতে হবে তাদের মার্কেটে ওদের কোম্পানীর মাল ক্যানভ্যাসের কাজে।

বের হয়েছে সমীর। কারখানার অফিসে যেতে হবে। অফিসটা শহরের অন্যপ্রান্তে। কারখানাকে প্রায় আধখানা পাক দিয়েই যেতে হবে বাইরে বাইবে। ঝকঝকে পথ। রিক্সা চলেছে শহর ছাড়িয়ে। একদিকে কারখানার দেওয়াল—ওদিকে বিরাট কর্মকাণ্ড চলেছে। তিন শিফ্‌টে কাজ হয় এখানে। খুবই চালু কারখানা।

এদিকে রাস্তা—তার পরেই ধানক্ষেত, আখের ক্ষেত। ওপাশে একটা আধমজা খাল। কারখানার নোংরা জল, আবর্জনা বড় নর্দমা দিয়ে বের হয় আর খালের পাশে ঢাই করে জমে আছে রবার স্ক্রাপ-এর স্তূপ। কেউ হাতই দেয় না। স্তূপাকৃতি ওই মাল কোন রকমে কারখানা থেকে ওখানে ফেলে দিয়ে কোম্পানী যেন দায়মুক্ত হয়েছে। নর্দমা দিয়ে ভেসে আসছে বাতিল রবারের স্ক্রাপ। যেন সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে সমীর। বলে ওঠে সে রিক্সাওয়ালাকে—রোকো। স্টপ—স্টপ।

হকচকিয়ে অটো রিক্সাওয়ালা ব্রেক কষে রাস্তার ধারে থামে, বোধহয় যাত্রীর কিছু পড়ে গেছে।

অটো থামতে সমীর লাফ দিয়ে অটো থেকে নেমে ওই খালধারের স্তূপের দিকে দৌড়লো ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে কাদাজল মাড়িয়ে। রিক্সাওয়ালাও এহেন কাণ্ড দেখে অবাক হয়। সাহেবের মাথা খারাপ কিনা তাই ভাবছে সে গভীরভাবে।

সমীর গিয়ে হাজির হয়েছে ওই ঢিবির উপর। পা যেন দেবে যাচ্ছে। হাতে করে তুলে নেয় কিছু স্ক্রাপ। একেবারে এক নাম্বার রবারের মালই। পা দিয়ে সরিয়ে দেখে মাটি নেই, সবই স্ক্রাপ। ওখানেই ওসব ফেলা হচ্ছে বহুদিন ধরে। প্রচুর মাল রয়েছে এখানে। যার কিছুমাত্র চালান দিতে পারলে তার অবস্থা বদলে যাবে।

অন্যকে এসব মাল দেবে না। নিজেরই কারখানা গড়তে পারবে আর এসব মাল পরিষ্কার করে মোল্ড করে নিজের কারখানাতেই সিট বানাবে।

স্বপ্ন দেখে সমীর ট্যাংরায় অনেকখানি জমি নিয়ে নিজেই কারখানা বানাবে। কাউল সাহেব তাকে দাবাতে চাইছে—কিন্তু এবার সে কাউল সাহেবের মালকেই বাজার থেকে হঠাবে। এতদূরে এসে সে যেন তার ভাগ্যের চাকাটার গতিপথ বদলাবার সূত্রই পেয়েছে।

রিক্সাওয়ালার ডাকে হুঁশ ফেরে—এ সাহেব।

সমীরের খেয়াল হয়। তাকে অফিসে যেতে হবে। সে এসে রিক্সায় উঠলো। বেশ বুঝেছে সমীর এখানে, ওই মাল কেউ ব্যবহার করে না। সুতরাং তাকে এসব পেতেই হবে।

মিঃ রামানুজম কথা রেখেছেন। সাড়ে দশটাতে এখানের অফিস চালু হয়ে যায় পুরোদমে। কলকাতার বাবুদের মত এরা ঢিলেঢালা নয়, কাজকে নিষ্ঠার সঙ্গেই করে।

মিঃ রামানুজমের চেম্বারে পৌঁছে যেতে তিনি তাঁর সহকারীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন সমীরের সঙ্গে।

মিঃ নায়ার অল্পকথার মানুষ। সমীরকে নিজের চেম্বারে এনে বসিয়ে ওর কথা শুনে অবাক হয়। বলে—এই স্ক্রাপের জন্য তুমি কলকাতা থেকে এসেছো? ও তো আমরা কারখানার বাইরে ফেলে রাখি। ওটা নিয়ে আমাদের সমস্যাই হচ্ছে। মাঠে শস্যের ক্ষতি হচ্ছে—পলিউশন হচ্ছে।

সমীর বলে—ওসব আমরা ক্লিয়ার করে দেব। এর জন্য কোম্পানীর কাছে কিছুই নেব না। তবে ওটা যে আমিই পরিষ্কার করবো এই বলে কোম্পানী আমাকে একটা নির্দেশনামা দেবে।

মিঃ নায়ার কি ভেবে বলে—পরিষ্কার করার ভার তোমাকেই দিতে হবে, এই তো?

—হ্যাঁ।

মিঃ নায়ার বলেন—তা দেওয়া যাবে। তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নয়। ধরো এক বছর।

সমীর ভাবছে কথাটা। অন্য কোন কোম্পানী কলকাতায় এসবের সন্ধান পেলে অনেক টাকা দিয়েই ওসব নিতে চাইবে। সমীর বলে--ওটা দুবছর করো। তারপর যদি ঠিকমত সাফ করি এ কাজের জন্য আমাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এটাও লেখা থাকবে।

মিঃ নায়ার জানে ওই আবর্জনা নিয়ে কেস কাবারিও হয়েছে। ওসব যদি এরা সাফ করে ভালোই হবে। মিঃ নায়ার সেইভাবেই একটা চিঠিও করে দেয় সমীরকে।

তারপর জিজ্ঞাসা করে—ওসব দিয়ে কি করবে।

সমীর আসল কথাটা ঠিক প্রকাশ করতে চায় না। বলে—ও দিয়ে আমরা চামড়া মিশিয়ে মোল্ড করে সস্তা ধরনের খেলনা, চটি, টুকটাক জিনিস তৈরী করি। কোন কোয়ালিটি জিনিস ওতে হয় না।

সমীর যেন জমিদারীর সন্ধানই পেয়েছে। কিন্তু সমস্যা হয় এত দূর থেকে ওসব মাল পাঠানোর খরচাও অনেক। এক ট্রাক মাল তবু পাঠাবে। সেখানে এর বাজার দর, কোয়ালিটি কেমন হয় সেটা জানতে হবে। তবেই এগোবে।

তারপর ওয়াগনে মাল পাঠালে খরচা কম পড়বে। মালও বেশী যাবে। অবশ্য হাতে সময় রেখে মাল পাঠাতে হবে। কারণ ওয়াগন যেতে তিন সপ্তাহ এক মাসই পড়ে যাবে।

মিঃ নায়ারকেই শুধোয় সমীর—এখানে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর কারো সঙ্গে যোগাযোগ আছে আপনার? এক ট্রাক মাল কলকাতায় পাঠাতে হবে ফর ট্রায়াল। ওদের রিপোর্ট এলে তখন মাসে বেশ কয়েক ট্রাক মাল যাবে। কিছু রেলেও পাঠাবো।

মিঃ নায়ার বলে—আমি ঠিক জানি না। আমার ভাগ্নে কলেজ থেকে সবে বেরিয়ে টুকটাক ব্যবসা করে। তার সঙ্গে কোন ট্রাকওয়ালার জানপহচান থাকতে পারে। তোমার লজে আজ সন্ধ্যায় ওকে পাঠাবো—হি মে কাম্ টু ইয়োর হেল্প।

সমীরও এখানের একজনকে তার পাশে চায়। এখানে সে সব সময় থাকতে পারবে না। তেমন একজন কাজের ছেলে পেলে তার ভালোই হয়।

বিশ্বাম্পা নাইডুকে দেখে সমীরের ভালোই লাগে। কালো—তবে খুব কালো নয়। বেশ ধারালো মুখ চোখ আর কথাবার্তাও ভালো বলে। ইংরাজী-হিন্দিও টুকটাক জানে। ছেলেটা একটা পুরোনো মোপেড নিয়ে এসেছে। তার কাকাই পাঠিয়েছে সমীরের কাছে।

বিশ্বাম্পা নাইডু তো সমীরের কথায় অবাক হয়। বলে—ওইসব ক্যাঁচড়া নিয়ে বিজনেস করবেন স্যার?

সমীর বলে—বাংলায় একটা কথা আছে ধুলো মুঠোয় ধরতে পারলে হাত

বিশেষে তা সোনায় পরিণত হয়। ভাগ্যে থাকলে ওই দিয়েই তোমার-আমার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে নাইডু।

ছেলেটা ভাগ্য মানে। তাই বলে—দেন লেট আস ট্রাই। শুনেছি কলকাতায় অনেক আজীব ঘটনাই ঘটে। ইট ইজ্ এ স্ট্রেঞ্জ প্লেস অ!

সমীর বলে—একটা ট্রাক চাই—কলকাতা যাবে ওই মাল নিয়ে, ফেরার সময় সে তার সুবিধামত অন্য মাল আনবে। আর কিছু লেবার চাই, ওই মাল তুলে ট্রাকে লোড করে দেবে। ওই মালের রিপোর্ট এলে তখন মাসে চার-পাঁচ ট্রাক মাল যাবে। দরকার হয় মাল তুলে রেল ওয়াগনেও পাঠাবো। তখনই পুরো দমে ফুল টিম নিয়ে কাজে নামতে হবে।

বিশ্বাপ্পাও কথাটা বোঝে। বলে সে—দ্যাটস্ রাইট। তাহলে ট্রাক দেখতে হবে? ও-কে। চলো।

ওর ওই ধ্যাড়ধেড়ে মোপেডটাতে দুজনে সওয়ারী হয়ে বের হয়ে পড়ে। শহরের আর এক প্রান্তে ট্রাকের আড্ডা। এখান থেকে বেশ কিছু মাল আনা নেওয়া হয়। নানা সাইজের টায়ার ও নিয়মিত ট্রাকে করে ভারতের বহু জায়গায় যাতায়াত করে। সুতরাং এখান থেকে কলকাতা যাবার ট্রাকের অভাব হয় না। তবে প্রথমবার যাচ্ছে এদের কাজে তাই ভাড়া কয়েকশো বেশী বলে। তবে বিশ্বাপ্পাও বেশ বলিয়ে-কহিয়ে তরুণ। তাদের সঙ্গে দরাদরি করে শেষ অবধি পরেও নিয়মিত ট্রিপ দেবার কথা বলে একটা রফায় আসে। কালই ট্রাক দেবে তারা।

বিশ্বাপ্পাই কোথা থেকে জন বিশেক লেবার এনে ওই স্ক্রাপের গাদা থেকে মাটি ধুয়ে বেশ ভালো মাল তুলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় আট টন মত মাল লোড করিয়ে বৈকালেই গাড়ি ছেড়ে দিল হরিবাবুর ঠিকানায়। বলা আছে মাল এলে এখান থেকে নবুমামা ওই মাল খালাস করিয়ে অন্য ট্রাকে কাউল সাহেবের কারখানায় ডেলিভারি দেবে। এই ট্রাককে ওর কারখানায় নিয়ে যাবে না—তাহলে হুঁশিয়ার কাউল সাহেব ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এদের মালের সূত্রের খবর পেয়ে যাবে।

তাতে সমীরের বিপদ হতে পারে। কাউল সাহেব এত মালের খবর পেলে নিজের ট্রাক পাঠিয়ে এখান থেকেই মাল নিতে থাকবে, তাতে সমীরের ব্যবসা চৌপট হতে পারে। অথবা অন্য কাউকে দিয়েই এ মাল তোলাতে পাঠাবে।

সমীর ট্রাক ছেড়ে যেতেই টেলিগ্রাম করে হরিবাবুকে ওই স্ক্রাপের রিপোর্ট টেলিগ্রাম করে জানাতে বলে। তাহলে সেইমত মাল পাঠাবে। মালের অভাব হবে না। তিন চারদিন অধীর আগ্রহে কাটায় সমীর।

এর মধ্যে সে বিশ্বাপ্পাকে নিয়ে এখান থেকে মাইল সত্তর দূরে অন্য এক বড় টায়ার কারখানাতেও গেছে। সেখানেও দেখে তারাও জঞ্জাল হিসাবেই সেই স্ক্রাপগুলোকে ফেলে রেখেছে। বিশ্বাপ্পা সঙ্গে থাকাতে সুবিধাই হয়।

ওরা আসলে কেরালার লোক। বিশ্বাপ্পা কেরলেই মানুষ, সেখানে রাবার বাগানও দেখেছে। সেখানে পাহাড়ের ঢালুতে প্রচুর রবার গাছের চাষ হয়।

গাছগুলোকে ডাল পালা ছড়াতে দেয় না। প্রুনিং অর্থাৎ আশপাশের ডালপালা ছেঁটে ফেলে গাছগুলোকে সোজা বাড়তে দেওয়া হয়। ওদিকে বৃষ্টি হয় প্রচুর। ফলে জল পায় গাছগুলো, গোড়াতে জল জমে না। বিশ পঁচিশ বৎসরেই গাছগুলো বেশ তাগড়া হয়ে ওঠে। তখন খেজুর গাছ কামানোর মত গাছের গুঁড়ির চার পাশের বাকল কেটে মুখমত করে গুঁজি লাগিয়ে দেয় আর তাতে একটা পাত্র ঝোলানো থাকে—সাদা দুধের মত রবারের আঁঠা ওতে পড়ে। সেগুলো ঘুরে ঘুরে বালতিতে করে সংগ্রহ করা হয়।

কারখানায় সেই আঁঠা ট্রেতে ঢেলে কিছু অ্যাসিড ও অন্য কেমিক্যাল দিয়ে রাখলে আঁঠাটা জমে ট্রের মাপে ক্রিম রংয়ের সিটে পরিণত হয়। সেগুলোকে হিট চেম্বারে পুরে হিট দিলেই আসল রবার সিটে পরিণত হয়। সেগুলোই আসল রবার। তার থেকেই বিভিন্ন মিশ্রণ মিশিয়ে বিভিন্ন তাপমাত্রায় নানা কিছু তৈরী হয়।

টায়ার কারখানাগুলো সেই রবার থেকেই এসব করে নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

রবার চাষ এখন দক্ষিণ ভারতে, ত্রিপুরাতেও শুরু হয়েছে ব্যাপকভাবে। রবার গাছের বীজ থেকে নার্শারিতে চারা তৈরী করা হয়, কিন্তু সেই গাছে ভালো রবার হয় না। মালয়েশিয়া থেকে রবার গাছের চারা আনা হয়, আমাদের দেশের চারার সঙ্গে সেই বাইরে থেকে আনা চারার গ্রাফটিং করে গাছ তৈরী করে চাষ করা হয়, সেই রবারের মান অনেক উন্নত ধরনের হয়।

সমীর রবারের ইতিহাসও শোনে। বলে—এই ব্যবসায় যদি থাকি। তোমার সঙ্গে রবার বাগান দেখতে যাবো কেরলে।

—সিওর। আমার গ্রামে নিয়ে যাবো। সমুদ্রের কাছেই। তোমার খুব ভালো লাগবে। মাও খুব খুশী হবে তোমাকে দেখে।

সমীরের বুকটা অজানতে কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে ওই মায়ের কথা শুনে। কতদিন হলো মা চলে গেছে তাকে ছেড়ে।

সমীর শুধোয়—তোমার মা আছেন ?

বিশ্বাম্পা বলে—মা ছাড়া আমার আর কেউ নাই। মাই আমার সব।

ওকে পরম ভাগ্যবান বলেই মনে হয় সমীরের।

ওখানের কোম্পানীতে ওকথা বলে সমীর। ওরাও চায় এই জঞ্জাল যদি কেউ সাফ করতে থাকে করুক। তারাও সানন্দে রাজী হয়ে যায়।

সমীর ওদিকের পরিক্রমা সেরে ফিরছে সেই লজে। ভেবেছিল এর মধ্যে কলকাতা থেকে উমার চিঠি আসবে। কিন্তু কোন চিঠিই আসেনি।

সমীরের মনে হয় মাসীমা কি চিঠি পারনি ? কে জানে ডাকবিভাগ মাঝে মাঝে এমন সব বিচিত্র কাণ্ডই বাধায়। কাউণ্টারের সেই রাবণের মত চেহারার লোকটা একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দেয়। হরি মুখুয্যে টেলিগ্রাম করেছে তার পাঠানো মালের রিপোর্ট দারুণ। এখানের মালের চেয়েও বহুগুণ সরেস। কাউল সাহেব কেন আরও দুতিনটে বড় বড় কোম্পানী ভালো দর দিতে চায়।

মাল তারা পেলেই নেবে—যতটা পারো মাল পাঠাও। দশ হাজার টাকার ড্রাফট আসছে।

সমীর আনন্দে বিশ্বাম্পাকে জড়িয়ে ধরে। বলে—বিশ্বাম্পা, যত পারো মাল পাঠাও। নাউ—তুমি আমার এখানের এজেন্ট। পার ট্রাক তোমার হাজার টাকা কমিশন—মাসে পাঁচ ট্রাক পাঠাও তো তোমার ক্লিয়ার পাঁচ হাজার। এই নাও আগেকার এক হাজার। নাউ জাম্প ইন ওয়ার্ক।

নাইডুও সিলভার টনিকের স্বাদ পেয়ে দেহেমনে যেন মত্ত হাতির বল পায়। বলে সে—ডোণ্ট ওরি বস্। সব ঠিক হ্যায়।

এবার সমীর-বিশ্বাম্পা দুজনে কাজে নামে। বিশ্বাম্পা নাইডুও কাজের ছেলে। এর মধ্যে সে ট্রাক কোম্পানীকে ফিট করেছে আর লেবারও তৈরী। তারা মাল তুলে ট্রাক লোড করছে। ট্রাক হিসাবে পেমেণ্ট।

এছাড়া সমীর এবার ওয়াগনে মাল পাঠাবার চেষ্টাও করছে। দুতিন ট্রাকের টাকা হাতে আসতে এবার এক ওয়াগন মাল লোড করার ব্যবস্থা করছে। এক ওয়াগানে চার পাঁচ ট্রাকের মাল যাবে আর খরচও অনেক কম পড়বে।

মাসখানেকের বেশী পার হয়ে গেছে সমীর এখানে এইসব ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিল। এখন যেন নেশার মধ্যে রয়েছে সে। কাজ আর কাজ। এই নিয়েই ব্যস্ত।

এখান থেকে মাল ঠিক মত পাঠাতে পারলে সে এবার কলকাতায় নিজেদের ফ্যাক্টরী করবে। ধাপে ধাপে উপরে উঠবে সে।

মনে পড়ে উমার কথা—তার কোন চিঠিও আসেনি। বারবার কলকাতা ফিরতে মন চায়। এখানের সাপ্লাই লাইন সে এর মধ্যে বেশ মজবুত করে গড়ে তুলেছে।

বিশ্বাম্পা সর্বদিকেই তুখোড়। তার নিজস্ব লেবার বাহিনী—আর এর মধ্যে স্টেশনেও একটা লাইন করেছে। মাসে দুখানা করে ওরাগন পাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে রেল অফিস থেকে। দরকার হলে তিন খানাও মিলবে রেক।

সমীর এবার ওখানেও একটা ব্যাঙ্ক একাউণ্ট করেছে আর ওই স্ক্রাপের ঢিবির পাশেই কাঠ টিন দিয়ে একটা ঘেরা শেড করেছে। মজুররা ওখানে বিশ্রাম করে, তার পাশেই একটা টেবিল চেয়ার নিয়ে বিশ্বাম্পা অফিসও বানিয়েছে।

সমীর প্রায় মাস দুয়েক পর কলকাতা ফিরছে। স্টেশনে নবুমামা গেছে। নবুমামার ভোল এখন বদলেছে। কাপড়-চোপড়ও সাফ-সুতরো। বগলে ছাতা। মামাকে দেখে সমীর এগিয়ে আসে।

—খবর সব ভালো মামা?

নবুমামা বলে—ভালো মানে? এক্কেবারে দারুণ ভালো। বাজারে হক্কলেই চমকে গেছে গিয়া।

—বাকী টাকা দিয়েছে মিঃ কাউল ?

সমীরের কথায় মামা বলে—ওডা দিমু দিমুই করছে, টিইপা টিইপা মাল ছাড়ছে। অথচ মাল নিবার জন্য হামলে পড়ছে। চলো ওর হিসাব দেখাইমু, বিশ হাজার বাকী রাখছে।

—তাই নাকি !

ওরা বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে যাবে, নবুমামাই একটা ট্যাক্সিকে থামায়।

সমীর বলে—ট্যাক্সি কেন ? এইতো মাল—

নবুমামা বলে—সারা জীবনটা কি দুঃখেই কাটাইবি ? এহন বিশ ট্যাকা ট্যাক্সি ভাড়া তুই দিতে পারস। না দিস আমিই দিমু। রাজ্যজয় কইরা ফিরছস। হরিবাবু প্রথমে ওখানেই তরে নিয়ে যেতে কইছে।

হরি মুখুয্যে ব্যবসা বোঝে। আর কাজের মানুষও চেনে সে। সমীর তখন দাদার দোকানে তামাক বেচতো। তখনই দেখেছে ওকে। ছেলেটার ব্যবহার ব্যবসা-বুদ্ধি আছে।

তাই জয়সোয়াল চলে যেতে হরিবাবু কি ব্যবসা করবে ভাবছিল। তার আগেই সে সেলস লাইনে সমীরের এলেমও দেখেছে। এবার সমীরের প্ল্যানিং, তার কর্মদক্ষতা দেখে অবাক হয়েছে হরিবাবু। দুমাসের মধ্যে বেশ কয়েক ট্রাক মাল এসেছে। তার থেকে এদের লাভও হয়েছে আশাতীত। আর বুঝেছে হরিবাবু সমীর অজানা অচেনা দক্ষিণ ভারতে গিয়ে যেভাবেই হোক সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে আর সেখান থেকে সোনাই তুলতে শুরু করেছে।

তাই হরিবাবুর মত বনেদী ব্যবসাদার সমীরকে ছাড়তে চায় না। এই ক'মাসে রবার লাইনের বেশ কিছু সম্ভাবনার খবরও জেনেছে হরিবাবু। তাই সমীরের মত ছেলেকে ভরসা করেই সে এই লাইনে নামতে চায়।

সমীর আসতে হরিবাবু এগিয়ে যায়। এখন তার দোকানের হালও বদলেছে। টায়ার টিউব ছেড়ে ওরা রবার সিটের কেনাবেচাও করছে।

হরিবাবু বলে—এবার নিজেদের কারখানা করার কথাই ভাবো সমীর। আমাদের কাঁচামাল থেকে আমরাই মাল বানাবো, বাজারে আমাদের নামও হয়েছে।

—কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার হরিবাবু ?

হরিবাবু বলেন—তার ব্যবস্থাও হবে। এখন দুদিন ট্রেনে এসেছো। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল হিসাব-কিতাব, কারখানার সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

দুমাস দেখেনি উমাকে। সমীর অনেক আশা নিয়েই ফিরছে। আসার সময় মাদ্রাজ থেকে একটা সিল্কের কাঞ্চীপুরম শাড়ি কিনেছে। গোলাবী রংটা উমাকে মানাবে সুন্দর। প্রায় আটশো টাকা দিয়েই জীবনে এই প্রথম শাড়ি কিনেছে। মাসীমার জন্যও কিনেছে শাড়ি। সমীর জানে উমা তার

পথ চেয়ে আছে। তবে সমীরও প্রথমে কথা কইবে না। দুমাসে একখানা চিঠিও দেয়নি উমা তাকে।

বাড়ি ঢোকার সেই গলিটা তেমনিই রয়েছে। বাড়িতে নিচেকার কারখানাও আছে। সমীরের মনে হয় তার গলার স্বর শুনে ছুটে আসবে উমা। মাসীমাও।

কিন্তু কেউ আসে না। ওদিকে চাইতে অবাক হয়। একটা বুড়ি ঝাঁটা দিচ্ছে—একটা মোটামত টাক-মাথা ভদ্রলোক সমীরকে দেখে।

মাসীমাদের ঘরগুলোয় এখন অন্য ভাড়াটে এসেছে। কারখানার ম্যানেজার ভানুবাবু এগিয়ে আসে।

—ফিরলেন সমীরবাবু, ক'খানা চিঠি রয়েছে আপনারই—

ও ড্রয়ার থেকে সমীরের লেখা মাসীমাকে সেই চিঠি দুখানা তুলে দিয়ে বলে—ওনারা তো কোথায় নিজেদের বাড়ি তৈরী করে চলে গেলেন তুমি যাওয়ার পরই। চিঠিগুলো তাই রেখে দিয়েছিলাম। ওদের দিতে পারিনি।

চমকে ওঠে সমীর। তার বুকটা যেন খালি হয়ে গেছে। শুধোয় সে—ওরা চলে গেছে?

—হ্যাঁ।

অস্ফুট কণ্ঠে সমীর প্রশ্ন করে—কোথায় গেছে?

ভানুবাবু বলে—তা তো জানি না মশায়।

তারপরই পরম দার্শনিকের মত বলে—এত বড় দুনিয়ায় কত লোক আসে যায়, কে কার খবর রাখে বলুন? চলে গেল—ব্যস, বাড়িওলা সাতদিনের মাথায় ডবল সেলামী নিয়ে কাদের বসিয়ে দিল। জানতেই পারলাম না।

ভানুবাবু চিঠিগুলো ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। সমীর দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। এতদিন ধরে ঘরটা বন্ধ ছিল। কয়েকটা নেংটি ইঁদুর হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। জানলাটা খুলে দেয় সমীর।

তক্তপোশটা খালি পড়ে আছে। ওই তক্তপোশেই বসে পড়ে সমীর। সব পরিশ্রম—এই জয়ও যেন তার কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে।

তার জীবনে সব হারানোটাই সত্যি, বাবা চলে গেছেন। তার মা দুমুঠো অন্নের জন্য তাকে ফেলে চলে গেছে—সংসারও তাকে ঠাঁই দেয়নি। দাদা-বৌদিদের কাছে সে অবাঞ্ছিত। বীণাও তাকে ফেলে চলে গেছে নিজের ঘরে। এই বিশ্বসংসারে সে এক নিঃসঙ্গ সৈনিক, ক্লান্ত বিপর্যস্ত, তবু একাই সে লড়াই করে চলেছে।

উমা এসেছিল তার অন্ধকার জীবনে এক ঝলক আলো, মরুভূমিতে এক পশলা বৃষ্টির সজলতা নিয়ে, কিন্তু সে রইল না।

সমীরের জন্য শুধু দুঃখ আর বেদনাই রয়ে গেছে। জীবনে পাবার কোন ভাগ্যই তার নাই।

কতক্ষণ বসে ছিল সমীর জানে না। হঠাৎ নবুমামার ডাকে তার চমক ভাঙ্গে। নবুমামা বলে—চানটান করোনি? আমি হোটেলে কইয়া আইছি, খাবার লই আসবো।

সমীর বলে—তুমি দোকানে যাও। আমি সন্ধ্যায় যাবো।

সমীরের সারা মন কি বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। উমাও হারিয়ে গেল। জীবনে শুধু কাজ আর কাজ। এছাড়া তার যেন করার আর কিছুই নাই। তবু কিছু করতেই হবে তাকে। নিজের জীবনে এছাড়া সব শূন্যতাকে ভোলার আর কোন পথই নাই।

কাউল সাহেব এতদিন কারখানা চালিয়েছে, ছোট অবস্থা থেকে এতবড় হয়েছে। তখন সে খেটেছে, ফাঁকি দেয়নি কাউকে। সমীরকেও সেইই লাইনে আনে। তাকে কাজ শেখায় নিজের কারখানায়, বাজারেও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

সমীর অবশ্য তাকে প্রচুর মাল দিয়েছে, কিন্তু কাউল সাহেব এবার বুঝেছে ছেলেটাকে আটকাতে হবে, না হলে ও তাকেই টেক্কা দেবে।

ওর প্রচুর মালের জন্য সামান্য কিছু টাকা দিয়ে বাকী টাকা ফেলেই রেখেছে। শুধু সমীরের টাকাই নয়—অনেক মহাজন, বড় পার্টির অ্যাডভান্স টাকাও নিয়ে এবার মিঃ কাউল গোপনে তার কারখানা বিক্রী করেছে, অবশ্য বিক্রী ঠিক করেনি। বেনামীতে ট্রানস্‌ফার করেছে তার এক বিশ্বস্ত আত্মীয়ের নামে। সেখানে নিজের ছেলেকে ম্যানেজার হিসাবে রেখে নিজে কিছুদিন কারখানায় আসছে না। এক দমকায় কয়েক লাখ টাকা হজম করে বসে পড়েছে মিঃ কাউল।

এতবড় খবরটাও গোপন রেখেছে তারা। হরিবাবুও জানে না। সেদিন বৈকালে সমীর হরিবাবুর ওখানে। দেখা যায় কাউল সাহেবের কাছে সমীরের প্রায় এক লাখ বারো হাজার টাকা রয়েছে। হরিবাবু বলে—বাকী টাকা আমি দেব। তুমি কারখানা তৈরী করো।

সমীরও তাই চায়। সে নবুমামাকে নিয়ে এসেছে ট্যাংরার দিকে।

নবুমামাও সন্ধানী, করিতকর্মা লোক। দু'একজন দালালকে সেও চেনে। তাদের নিয়েই ওদিকে একটা জায়গাও দেখে। রাস্তা থেকে একটু ভিতরে, তবে ট্রাক ঢুকবে। সেখানেই চৌদ্দকাঠা মত জায়গা আছে, এখন তাতে একটা ডোবা—কিছু ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে। কিছু খরচা করে মাটি ঘেঁস ফেলে ওটাকে সমতল করতে হবে।

জায়গার মালিক ওটা বিক্রী করবে না—তবে পঞ্চান্ন বছরের লীজ দেবে ন্যায্য টাকা পেলে।

সমীরও কথা দেয়। ওই টাকা দিয়ে জায়গাটা পেলে তারা কারখানা করবে। পঞ্চান্ন বছরে অনেক কিছু ঘটবে—আপাততঃ কারখানা গড়বেই।

সমীর তাই কাউল সাহেবের সন্ধানে তার কারখানায় এসেছে। এর আগেও সে এসেছে এখানে। কাজকর্ম চলছে ভালোই, ওদিকে অফিস ঘরে গিয়ে দেখে বেশ কিছু নতুন মুখ। সমীর তাদের চেনে না।

নবুমামা বলে—এগোর তো আগে দেখিনি।

—কাউল সাহেব আছেন ?

সমীরের কথায় নতুন ম্যানেজার বলে—তিনি তো আর এখানে নাই।

—মানে? অবাক হয় সমীর।

লোকটি বলে—সাইনবোর্ড দেখেননি?

নতুন বোর্ডটার দিকে চাইল সমীর। এ অন্য কোম্পানীর নাম লেখা।

লোকটা বলে—উনি এ কোম্পানী বিক্রী করে চলে গেছেন।

—সেকি।

নবুমামা বলে—দুসপ্তাহ আগে মাল দিছি।

—তারপরই এই কোম্পানী আমাদের বিক্রী করে চলে গেছেন।

সমীর বলে—আমার বাকী টাকা তাহলে আপনারাই দেবেন। এত এত মাল দিয়েছি। তার চালান-বিলও আছে।

লোকটা বলে—উনি সব দেনা পাওনার টাকাও নিয়ে গেছেন। ওঁর কাছে যান, টাকা উনিই দেবেন। আমরা আইনতঃ নির্দায় অবস্থাতেই কোম্পানী কিনেছি তাঁকে সব দেনার টাকা ক্লিয়ার করে। তার কাগজপত্রও আছে, দরকার হলে আদালতেই তা দেখাবো। আপনা আসুন।

সমীরের পায়ের তল থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। এতগুলো টাকা মারার জন্যই কাউল সাহেব তাকে বেশী টাকা দেয় নি। হাতে রেখেছিল। এবার সবটাই জলে গেছে সমীরের।

একা সমীরই নয়—আরও দুতিনজন পাওনাদার আসে। তাদেরও এই একই কথা বলে ওই লোকগুলো।

অন্য পাওনাদাররাও হুমকি দেয়—কোর্টে যাবো। কারখানা কি করে চালাও দেখবো।

সমীর সরে আসে। খিদিরপুর অঞ্চলে কাউল সাহেবের বাড়িতেও আসে। এর আগেও এসেছে এখানে।

কিন্তু কাউল সাহেব এবাড়ি বিক্রী করে নাকি উত্তরপ্রদেশের কোন গাঁয়ে তার দেশে চলে গেছে। তার খবরও কেউ দিতে পারে না।

লোকটা তার এতদিনের ব্যবসা বাড়িঘর ছেড়ে প্রভূত টাকা কামিয়ে নিয়ে গায়েব হয়ে গেছে। সমীর ঘামছে। তার সব আশা স্বপ্ন আজ চুরমার হয়ে গেল। যখন সে পায়ের তলে মাটি পেতে চলেছিল সেই সময়ই ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আবার পথের ভিখারী হয়ে গেল।

তার অদৃষ্টই তার সঙ্গে বারবার এমনি নিষ্ঠুর রসিকতাই করেছে। মাও হারিয়ে গেছে। বীণা-উমারাও আজ তার জীবন থেকে সরে গেছে।

নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলা তার এত কিছু তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ক্লান্ত বিধ্বস্ত সমীর ফেরে হরিবাবুর অফিসে।

কি হলো? হরিবাবু শুধোয়।

সমীর সব ব্যাপার জানিয়ে বলে—আবার পথেই নামলাম হরিবাবু, কাউল সাহেব সর্বস্ব মেরে চলে গেছে। আমি আজ নিঃস্ব। কারখানার জমিও দেখলাম, কিন্তু বরাতে ওসব নাই। হবে না।

হরিবাবু চুপ করে কি ভাবছেন। সে ব্যবসা বোঝে। ক'মাসেই সেও সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। বেশ বুঝেছে এই কারখানা বিক্রীর ব্যাপারে কাউল সাহেবের কোন বিশেষ মতলব আছে। যাই থাকুক। ওতে তাদেরই লাভ হবে। কারণ সমীরের মাল ওরা পাবে না। ওদের খরিদ্দাররাই আসবে তাদের কাছে। এই ব্যবসায়ে লাভই হবে তার।

হরিবাবু বলে—এত ভেঙ্গে পড়ছো কেন সমীর। যে সাপ্লাই লাইন পেয়েছো—তাতেই তোমার এ ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। কারখানাও হবে।

—কি করে হবে ? সমীর বলে কাতর স্বরে—টাকা কোথায় ?

হরিবাবু বলে—আমি টাকা দেব।

—আপনি !

—হ্যাঁ। জমিটা নাও, শেড করো, যন্ত্রপাতি বসাও। সব টাকা আমার। তুমি কাঁচামাল দেবে—কাজ দেখবে, মার্কেটিংও যতটা পারো দেখবে। দশ আনা আমার তুমি ছ' আনার পার্টনার। রাজী ?

সমীর ভাবতেই পারে না এটা ঘটবে। বার বার মনে পড়ে মায়ের কথা। মাই বলতো - সৎপথে পরিশ্রম করবি, যত বিপদই আসুক সব কেটে যাবে। তুই একদিন মস্ত লোক হবি।

মস্ত হবে কিনা জানে না। তবে বিপদের মেঘ কেটে আলোর মুখ সে দেখেছে বার বার। হরিবাবু বলে—কালই চলো, জায়গাটা দেখে ওর মালিকের সঙ্গে লেখাপড়া করে নিই। জায়গাটা পেলেই কাজও এগিয়ে যাবে।

সমীর বলে—তাই চলুন।

হরিবাবু বলেন—কোম্পানী গড়তে হবে। ফ্যাক্টরীর নাম দিয়েই আমাদের পার্টনারশিপ দলিলও তৈরী করতে হবে। কাগজকলমে একটা কিছু থাকা দরকার। নাহলে তুমি ভাববে যে কোনদিন আমি না হয় আমার ছেলেরা তোমাকে হটিয়ে দেবে। বুঝলে পয়সাই মানুষকে বদলে দেয়। পয়সার লোভ খুব সাংঘাতিক জিনিস হে।

সমীর সেটা বুঝেছে। নাহলে যে কাউল সাহেব যেচে তাকে এই লাইনে এনেছিল, ব্যবসা শিখিয়েছিল, সেই লোকই তাকে সর্বস্বান্ত করে গেল কেন ?

অধীর এখন কোন কলেজের অধ্যাপক—আর তার স্ত্রী মায়াও এখন নিজেই একটা কেজি স্কুল খুলেছে। অধীর অবশ্য এখন ওই অধ্যাপনা ছাড়াও রাজনীতি করতে শুরু করেছে। দেখেছে এই রাজনীতি করেই এখন সহজেই সমাজের মাথায় উঠে জনতার ঘাড়ে পা দিয়ে দাপিয়ে চলা যায়। তাতে কলেজে না গেলেও মাইনে পায় আর সমাজসেবার নাম করে নিজের আখের গোছানো যায় সহজেই।

এই এলাকায় এখন তারই প্রতাপ। অধ্যাপনা শিকেয় তুলে সে এখন এই এলাকায় রাজত্ব করছে। সেই সুবাদেই মায়াও বোন স্কুলের শিক্ষিকার

খাতায় নাম রেখে নিজের ওই স্কুলের ব্যবসা করে। এবার নাকি এখানের কর্পোরেশন ইলেকসনেও দাঁড়াবে।

অধীরের দলবলও কম নয়। আদায়পত্রের কাজটা তারাই করে। কিছুটা তারা রাখে বাকীটা বস্‌কে দেয়।

এদিকের জলা জমি বুজিয়ে এখন ছোট বড় অনেক কারখানাই হচ্ছে। বাড়ি ঘর বসতি কল-কারখানা গজাচ্ছে।

ফলে তাদের দল এসে সেখানে হামলা করে—পাঁচ-দশ হাজার টাকা দিতে হবে। মাসে মাসেও প্রণামী চাই। তাদের দলের লোকদের কাজ দিতে হবে। এমনি নানা বায়না করে তারা।

প্রতিপক্ষ জোরদার হলে মাঝে মাঝে মারপিট বোমবাজী এসবও হয়।

সমীর হরিবাবুদের কারখানার কাজ শুরু হয়েছে। ইদানীং সমীরের মালও ঠিকমত আসছে। বিশ্বাম্পা মাদ্রাজ থেকে এখন ভালোই কাজ করছে। ছেলেটা খুবই কাজের আর বিশ্বাসী।

সমীরদের কারখানার বাউণ্ডারী ওয়ালটা উঠেছে। এখন মাল ওখানেই রাখছে। ওখান থেকেই সাপ্লাই দেয় বাজারে।

সেদিন ন্যাপার সঙ্গে দেখা। এখন ন্যাপারও উন্নতি হয়েছে। মটরবাইক ছেড়ে জিপেই চড়ে। তবু ন্যাপা বদলায়নি এতটুকু।

এদিকেও সে আসে। ন্যাপা সমীরকে দেখে জিপ থামিয়ে নেমে আসে। জিপে তার চ্যালারাও দেখছে।

ন্যাপা বলে—গুরু এখানে?

সমীর কারখানার শেড তৈরী করার কথা ভাবছে। তাই মিস্ত্রীকে দেখাতে এসেছিল জায়গাটা।

সমীর খুশী হয়—তুই!

ন্যাপা বলে—ব্যাটা ন্যাপা সব্বঘটে কাঁঠালি কলা গুরু। এখানেও আসতে হয়। একটা ছোট মোট কারখানা - দুটো লেদ বসিয়েছি।

সমীর খুশী হয়—বাঃ!

ন্যাপা বলে—ছেলেগুলোকে কাজ দিতে হবে তো। তা তুমি এখানে?

সমীর জানায়—একটা রবারের কারখানা করছি একজনের সঙ্গে এইখানে। সবে শুরু করেছি।

ন্যাপা বলে—তোমার পাশেই আছি গুরু। ভালোই হলো—আর শোন—ভুক্কার পার্টির লোকজন চাঁদা চাইতে এলে হটিয়ে দেবে। শালারা কেবল খেতেই আছে—দেবে না।

সমীর এর মধ্যেই দেখছে ওই দলের দু' একজনকে। তাদের লীডারের নাকি অল্প পয়সায় মন ভরে না। থোক টাকা দিতে হবে।

ন্যাপা বলে তাহলে এসে গেছে শালারা? ওদের লীডার নাকি মস্ত পণ্ডিত। ন্যাপার পেটে কালির আঁচড়ও নাই তা জানো গুরু। পোস্তায় আলু-রাঙ্গানো পার্টি। শালাদেরও রাঙ্গিয়ে দেব বেশী বেগড়বাই করলে। চাঁদা

দেবে না—তারপর যা করার আমি করবো।

ন্যাপার এলেম সম্বন্ধে সমীরের সন্দেহ নেই।

তাই বলে—ঠিক আছে। তাহলে শেড তৈরী করি?

—আলবৎ করবে।

ন্যাপা বলে—এই খাই খাই স্বভাবের জন্য ব্যাটারা দেশ থেকে কলকারখানা সব উঠিয়ে দেবে। তাই ঠিক করেছি ওদের বাধা দেবই। এতগুলো লেবারের ভাত মেরে দাদাগিরি করবে তা হতে দেব না।

সমীর তার কারখানার কাজ শুরু করেছে। শেড উঠেছে—যন্ত্রপাতিও আসছে। ফার্নেস বসাতে হবে। হরিবাবুই ঘোরাঘুরি করে। সরকারী পারমিশন-লাইসেন্স সব যোগাড় করেছে। সমীর খাটছে দিনরাত।

বিশাপ্পার মালও আসছে প্রচুর। তাই নগদ টাকাও হাতে আসছে, সেসবই ঢালছে কারখানা তৈরীর কাজে। তার স্বপ্ন ওই কারখানা তৈরী করা। নিজেরা রবার সিট বানাবে। সেরা রবার সিট। সমীর দেখিয়ে দেবে কিছু করতে পারে সে।

সেদিন কাজ চলছে একটা জিপ এসে থামে।

চার পাঁচজন ছেলে নামে। পরনে জিনস্, হাতে বালা। কারো গলায় চেন, মুখে দাড়ি। চোখগুলো লালচে। লম্বা চুলে তেল দেবার সময়ও তাদের নাই।

সর্দার মত একজন এগিয়ে এসে বলে—কার কারখানা হচ্ছে রে?

সমীর এগিয়ে আসে—কেন?

—এখানে ইঁট গাঁথলে গেলে মন্টাদের সেলামী দিতে হয়, মন্টার গুরুকে পেন্নামী দিতে হয় জানো না? সেদিনও বলে গেছি। কথা কানে যায়নি।

অন্যজন বলে—কিচাইন্ করোনা বস্—এই যে মশায় দশ হাজার টাকা দিতে হবে। না হলে—

সমীর শুনছিল ওদের কথা।

ওদিকে মিস্ত্রী লেবাররাও চুপ করে গেছে। সমীর শুধোয়—না দিলে?

দাড়িওলা ছেলেটা বলে—দাদার হুকুম দশ হাজার আভি দিতে হবে, না হলে কাম বন্ধ!

লেবারদের ধমকায়—চলে আয়, কাজ হবে না। আমার হুকুম—

এমন সময় ন্যাপায় জিপটা এসে ঢোকে আর ন্যাপার ছেলেরাও এর মধ্যে পজিসন নিয়ে সামনের দুজনকে শাসায়—ফোট রে!

এবার ঘুরে দাঁড়ায় এদের লীডার। একটা ছোরা বের করে একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই মুহূর্তে ন্যাপার সপাটে লাথি খেয়ে সেই প্রভু শূন্যে একটা চক্কর দিয়ে ওদিকে রাখা লোহার অ্যাঙ্গলের উপর ছিটকে পড়তেই কপালটাই ফেটে যায়। রক্ত পড়ছে। অন্যরা এগিয়ে আসতে তাদেরও উত্তম-মধ্যম ধোলাই দেয় ন্যাপার দল।

ওরা এমনি বাধা পাবে তা ভাবেনি।

এবার নিজেরাই জিপে উঠে পালাতে যাবে! ন্যাপা বলে—তোর দাদাকে বলবি এটা আমার গুরুর কারখানা, এখানে যেন খাপ খুলতে আসে না। আজ ছেড়ে দিলাম—ফের এলে আর ফিরে যেতে হবে না। লাশ বানিয়ে দেব সবকটাকেই।

ওরা চলে যেতে সমীর বলে—ওদের এইভাবে মারলি।

ন্যাপা বলে—যে পুজোর যে মন্তর। নাহলে এখানে টিকতে পারবে না। জমানা বদলে গেছে।

—ওরা যদি কিছু করে?

সমীরের কথায় ন্যাপা বলে—করলে ওদের দাদাকেও চিনি, তাকেও চমকে দেব! ন্যাপার গুরুর কারবারে হাত দিতে এলে হাতখানাই খুলে নোব। ওসব ভেবো না—কাজ করো।

আবার কাজ শুরু হয়।

কিন্তু ওই দলবল জানে সহজে মাটি ছাড়লে তাদের দিন শেষ হয়ে যাবে। তাই সেই রাতেই তারা ফিরে আসে আর নাইট গার্ডকে বেঁধে রেখে কারখানা থেকে দামী যন্ত্রপাতি একটা ভ্যানে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার মালই চলে গেছে।

সকালে এসে কাণ্ড দেখে সমীর চমকে ওঠে।

বেশ বোঝে এ কাদের কাজ। এভাবে চোট করলে এখানে কারখানা গড়াই যাবে না। কোন কাজ করতে গেলে পদে পদে এমনি বাধা আসবে তা ভাবেনি।

হরিবাবুও এসেছে। সে বলে—পুলিশে খবর দাও।

ন্যাপাও এসে হাজির হয়।

সমীর বলে—দ্যাখ, ওদেরই কীর্তি। যন্ত্রপাতি সব নিয়ে গেছে। কারখানা আর হবে না ন্যাপা।

ন্যাপা কি ভাবছে। হরিবাবুর কথায় বলে সে—পুলিশে খবর দিতে হয় দ্যান। কিছুই হবে না। গুরু, চলো একবার আমার সঙ্গে!

—কোথায়? সমীর শুধোয়।

ন্যাপা বলে—ওদের দাদার কাছে। একটা ফয়সল্লাই করতে হবে। এভাবে যা খুশী তাই করবে? কারখানা হলে কতজনের রুজিরুটি হতো—তা হতেও দেবে না? লুট করবে? চলো—

সমীর আজ বুঝেছে সহজে কিছু করা এখানে যাবে না। এক শ্রেণীর সুবিধাভোগীরা সমাজের উপরতলায় বসে কিছু পোষা গুণ্ডাই পুষেছে দলবাজির নাম করে। তারাই সর্বস্ব লুট করে নিতে চায়।

ন্যাপার জিপটা এসে একটা বিলাসবহুল এলাকায় ঢোকে। নতুন শহর গড়ে উঠেছে এখানে। সাজানো পথ, সুন্দর সুন্দর বাড়ি। এখানের মানুষরা যে সমাজের উপরের থাকের তা দেখলেই বোঝা যায়।

ন্যাপা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে ভিতরে যায়। সমীর চলেছে তার পিছু পিছু। বাইরে দুতিনটে দামী নতুন গাড়ি—পাশে সেই জিপটাও রয়েছে। অর্থাৎ ওই গুণ্ডাবাহিনী এরই আশ্রিত, এর জিপেই ঘোরে সেটা বোঝা যায়।

ন্যাপা বলে ওদিকে বসা এক ভদ্রলোককে—এভাবে এত লোকের ভাত মারবেন ?

ভদ্রলোক কাগজ পড়ছে। মুখটা আড়াল করা।

ন্যাপা গর্জে ওঠে—কাল আপনার ছেলেরা এর কারখানার যন্ত্রপাতি তুলে এনেছে। কেন ?

পাশে বসা একজন চামচাই হবে, সে বলে—চাঁদা দেয়নি, উল্টে ছেলেদের মেরেছো তুমি ! জানো—দাদা তোমাকে পুলিশে দেবেন।

ন্যাপা এবার পকেট থেকে ফস্‌করে চেম্বারই বের করে।

—আবে তার আগে তোকে আর তোর ওই দাদাকেই ফুটিয়ে দিয়ে যাবো। ন্যাপাকে চিনিস না—

এবার খবরের কাগজ পড়ে যায় ওই দাদার হাত থেকে—সামনে উদ্যত রিভলবার দেখে বিবর্ণ হয়ে গেছে নেতাও।

—ইয়ে—এসব কি।

—দেখতেই পাচ্ছেন। মাল বের করতে বলুন—নাহলে।

সমীর ঘরে ঢুকেই সামনে তারই মেজদাদা অধীরকে দেখে অবাক হয়ে বলে ওঠে সে—মেজদা।

অধীরও সমীরকে দেখেছে—তুই ! এখানে সমীর ?

ন্যাপা সব ব্যাপারটাই দেখে। সেও অবাক হয়। শুধোয় সমীরকে—চেনো গুরু ওকে ?

সমীর বলে—আমার দাদা। মেজদা—

ন্যাপা বলে—সেকি ! ওই রাঘব বোয়াল তোমার দাদা গুরু ? এ্যাঁ—তুমি মাইরী তাহলে দৈত্যিকুলের পেহ্লাদ। কি স্যার—

অধীর বলে—হ্যাঁ, আমার ভাইই। ছোট ভাই।

ন্যাপা বলে—তা আপনি এত পণ্ডিত, দেশের লোককে সৎ হতে বলেন, ভাই ভাইয়ের মত ভাষণ দেন, আর নিজের ভাইকেও দেখেননি ? গুরুকে উপোস দিতে হয়েছে, দুটাকা রোজে পোস্তায় আলু রাঙাতে হয়েছে, গাড়ি ধুতে হয়েছে। জানেন স্যার ? ফিরেও দেখেননি। যাক্ গে—না দেখুন ক্ষতি নাই। সেই ভাই কষ্টে সৃষ্টে একটা কারখানা করছে ধার দেনা করে সেখানেও আপনার চাঁদার জুলুম করবেন—না দিলে চল্লিশ হাজার টাকার মাল লুট করাবেন স্যার। বাঃ বাহারে দাদা মাইরী !

অধীর বলে—আমি এসবের কিছুই জানি না।

ন্যাপা বলে—এই না হলে ন্যাতা ! এবার যখন জানলেন মাল ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করুন।

অধীর ন্যাপার নাম ভালোই জানে। তার ছেলেদের কাজটা তার নির্দেশেই ঘটেছে, কিন্তু সমীর—তার ছোট ভাই পথেই যে ঘুরতো সে কারখানা করছে জানতো না। এবার কিছু করা দরকার। তাই বলে অধীর—বসো। দেখছি।

পরক্ষণেই হাঁক পাড়ে--কে আছিস চা দে।

ন্যাপা বলে—চা ফা থাকুক। ওর মালগুলো যেন বৈকালেই ফেরত পাই। না হলে আবার আসবো।

সমীরের দিকে চেয়ে বলে ন্যাপা—কি গুরু, তুমি বসবে? চা খাবে নাকি?

দাদার এই নতুন পরিচয় পেয়ে সমীর চমকে উঠছে। এতদিন দাদাকে সে স্বার্থপরই ভাবতো, এতবড় ভণ্ড সুবিধাবাদী তা জানত না। আজ তার নতুন পরিচয় পেয়ে চমকে উঠেছে সমীর। বলে সে—না। আজ বসার সময় হবে না।

অধীর জানে এবার সমীরকে তার দরকার হবে। ন্যাপা—তার দলের ছেলেদের হাতে আনতে পারেনি। এবার সমীরের মাধ্যমে সেই চেষ্টাই করতে হবে। তাহলে ওই এলাকায় একছত্রের মালিক হবে সে। তাই অধীর বলে—তুমি ভেব না। আমি দেখছি। মালপত্র ঠিক পৌঁছে যাবে। সমীর, এদিকেই তো কারখানা করছিস শুনে খুব খুশী হলাম। একদিন তোর কারখানা দেখতে যাবো। তুইও আয়—আজ তোর বৌদি বাড়িতে নাই। দেখা হলে সেও খুশী হবে।

ন্যাপা বলে—মালগুলো পাঠান, আমরাও খুশী হই স্যার। চলো গুরু।

সমীরকে নিয়ে বের হয়ে আসে ন্যাপা।

সমীর চুপ করে কি ভাবছে। মানুষকে টাকা-প্রতিষ্ঠার লোভ কোনখানে নিয়ে যায় সেটা দেখেছে আজ। তার দাদা যে এইভাবেই এবার পায়ের তলে মাটি পেতে চাইবে তা ভাবেনি।

ন্যাপা বলে—বলিনি গুরু, জমানা বদলে গেছে। ভালো ভেবে খেটে কিছু করার হ্যাপা অনেক। তবে মনে হয়—ভাই বলেই হোক, আর ন্যাপার জন্যই হোক ওর দলবল আর তোমাকে ঘাঁটাবেন না!

সমীর বলে—তা সত্যি। তবে ভাইয়ের জন্য কোন মমতার বশে নয় রে, মনে হয় তোর ওই চেম্বারের ভয়েই আর কিছু বলবে না। যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর।

ন্যাপা ঠা-ঠা করে হাসতে থাকে।

—যা বলেছো গুরু। বলিনি জমানা বদল গিয়া—

যে কোন কারণেই হোক সমীরের কারখানা তৈরীতে আর কোন বাধা আসেনি। সমীর কয়েক মাসের মধ্যেই কারখানায় বয়লার বসিয়েছে। আর হরিবাবুও নানাভাবে সরকারী বিভাগের ছোট বড় অফিসারদের খুশী করে কাগজপত্র ঠিক করে ইনস্পেকশান করিয়ে এবার মাল তৈরী শুরু করেছে।

কটা মাস সমীরের কোনদিকে কেটেছে জানে না। এবার সমীর ন্যাপার দলের দুতিনজন ছেলেকেও নিয়েছে। এই এলাকার কিছু ছেলে এর আগে কাউল সাহেবের কারখানায় কাজ করতো তাদেরও এনেছে। কাজ-জানা লোক তারা। ফলে প্রোডাকশনও ভালোই হয়।

কারখানায় পেয়েছে প্রশান্তবাবুর মত একজন রবার টেকনোলজিস্টকে। প্রশান্তবাবু কাউল সাহেবের কারখানাতে ছিল দীর্ঘ আটবছর। ওখানে কাজ করেছে। কাউল সাহেবের বিশ্বাসী লোক। ওইই কাউল সাহেবের কারখানার মালের মান উন্নত করে, আর বাজারেও কাটতি বাড়ায়।

কিন্তু কাউল সাহেব তার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটিব টাকাও মেরে দিয়েছে। প্রশান্ত জানে কারখানার নামই বদলেছে মাত্র! বহুজনকে ফাঁকি দেবার জন্য কাউল সাহেব এই করে অন্যত্র গা ঢাকা দিয়ে আছে। তার টাকাও মিলবে না। আর নতুন ম্যানেজার এসে তার উপরও কথা বলতে শুরু করে। তারা চায় দিনরাত প্রোডাকশন হবে, কিন্তু লেবারদের ঠিক পয়সা দেবে না।

এদিকে কাঁচামালের যোগান দিত সমীরই। সেও আর ওদের মাল দেয় না। সব মাল নিজেদের শেডে এনে তোলে আর বাকী কিছু মাল অন্য পার্টিকে দেয়। ফলে কাউল কোম্পানীর প্রোডাকশনই বন্ধ হয়ে আসছে।

সেইসব বুঝেই প্রশান্তবাবু এসেছে সমীরের কাছেই। সমীরের রাগ রয়েছে ওই কাউল কোম্পানীর উপর। তারও এত টাকা বেমালুম মেরে দিয়েছে। ওই কোম্পানীকেও সে উচিত শিক্ষাই দেবে।

তাই প্রশান্তবাবুকে তার দলবল সমেতই নিয়ে এসেছে সমীর তাদের কারখানায়। আর তাদের প্রোডাকশনের মানও অনেক ভালো।

কারখানা চালু হতে চলেছে। সেদিন পূজাপাঠের আয়োজন করে নবুমামাই। হরিবাবুও প্রেসের লোকজনদের এনেছে, এর মধ্যে বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। বেশকিছু মানী লোকদেরও আমন্ত্রণ করে এনেছে।

হরিবাবু তাদের অভ্যর্থনা করছে, নবুও ব্যস্ত। ন্যাপা ও তার দলবল রয়েছে। সমীর ন্যাপাকে ভোলেনি।

হরিবাবুও বলে—তোমার ওই চ্যালাদেরও বলো।

অতিথিদের মধ্যে হঠাৎ মেজদা অধীরবাবুকে দেখে সমীর একটু অবাক হয়। প্রেসের লোকজন সমীরের ছবি তোলে—আজ সামান্য অবস্থা থেকে সে রবার ব্যবসায়ে একটা নতুন সূচনা আনতে চলেছে। স্ক্রাপ—বাতিল বলে যাকে ফেলে দেওয়া হতো, আজ সমীর প্রশান্তবাবুরা সেই বাতিল জিনিসকেই পুনরুদ্ধার করে কাজে লাগাচ্ছে সার্থক ভাবে।

মিটিং-এ মন্ত্রীদের দু' একজনও এসেছেন। মিটিং শেষে অতিথিদের আপ্যায়ন করে বিদায়পর্ব চলছে। সমীর আজ খুশী। তার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। আজ মায়ের কথাই মনে পড়ে বার বার। মা থাকলে আজ সেইই সব থেকে খুশি হতো।

সিঁড়ির তলায় গুমোট গরমে অনাহারে অর্ধাহারে নানা গঞ্জনা সয়ে যে ছেলেটা বাড়ির লোকদের কাছে বাতিল হয়ে গেছল আজ সেই-ই নিজের উদ্যমে কারখানা করেছে, বেশ কিছু পরিবারের মুখে অন্ন যোগাচ্ছে।

—সমীর !

কার ডাকে চাইল সমীর। দেখে সামনে দাঁড়িয়ে ছোটদা—যে এর আগে তাকে কোনদিন মানুষ বলেও ভাবেনি। মাকেও দেখেনি। অসহায় মা তাকে ফেলে রেখে নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য চলে গেছল।

সেদিনও তার লোকরাই সমীরের কারখানাই তুলে দিতে চেষ্টা করেছিল টাকার দাবী করে। ন্যাপাই উদ্ধার করে ওসব।

অধীর বলে—খুব খুশি হয়েছি রে। এখন সামনে আর বড় কাজ। এগিয়ে যেতে হবে। যদি কোন কিছুর দরকার হয়, আমার কাছে আসবি। উপর মহলে যোগ থাকলে কম কাজ করেই অনেক বেশী মুনাফা আমদানী করতে পারবি।

সমীর দেখছে অধীরকে। লোকটা সব সময়ই শুধু যেভাবে হোক ডবল রোজগারের কথাই ভাবে। সমীরও জানে ইদানীং নানা অসাধু উপায়ে বিশেষ স্থানে পূজা দিয়ে ডবল রোজগার করা যায়। তবে ভাগ দিতে হয় অন্ধকারের জগতের অনেককে।

সমীর সেই পথে যেতে চায় না। তাতে দিনরাত ওদের গোলাম হয়েই থাকতে হয়।

সমীর বলে—যেটুকু করেছি সৎভাবে খেটে করেছি। নিজে ঠকেছি বার বার। তবু কাউকে ঠকাবার কথা ভাবিনি ছোড়দা। নিজে খাটতে পারি—নিজে খেটেই যেটুকু পাই তাতেই খুশী থাকবো। ওভাবে কাউকে ঠকিয়ে—কাউকে পূজো দিয়ে টাকা রোজগার করার দরকারও নাই। একলা মানুষ—পথ থেকেই উঠেছি—দরকার পড়ে আবার পথেই ফিরে যাবো।

অধীর দেখছে ওকে। বলে ক্ষুণ্ণস্বরে—দিন বদলেছে রে। এখন টিকে থাকতে গেলে এসব করতেই হবে।

সমীর বলে—ওসব না করে টিকে থাকা যায় কিনা দেখি !

অধীর বলে—বড়দার খবর জানিস ?

সমীর ওই অঞ্চলেই থাকে। অনেকদিন ওদিকে যায় নি। তবে দেখেছে হরিবাবুদের পাড়ার দোকানটা এখন অন্য লোকে কিনে সেখানে বিরাট স্টেশনারী দোকান করেছে।

সমীরের ও নিয়ে কোন কৌতূহলও নেই আর সময়ও নাই। সেখানের সম্বন্ধে রয়েছে তার তিক্ত যন্ত্রনাময় অভিজ্ঞতাই। মাও চলে গেছে ওই বাড়ি থেকে—আর ফেরেনি। বড়দা-বৌদিদের জন্যই মাকে হারিয়েছে সে।

সমীর বলে—আমারও সময় নাই, অনেকদিন কলকাতার বাইরে ছিলাম, ওদের কোন খবরও জানি না।

অধীর বলে—আমার কাছে গেছল। মনে হলো ভালো নেই। চলি—

অধীর চলে যায়।

সমীর এখন নতুন জগৎ নিয়ে ব্যস্ত।

কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিশ্বাম্পাও এসেছে দক্ষিণ ভারত থেকে। সেও খুশী। সমীর তাকে সব দেখায়। বলে—ওদিকের মাল আরও চাই নাইডু।

বিশ্বাম্পা নাইডু বলে—পাবে। অন্য কোম্পানীর সঙ্গেও কথা বলেছি। আমার মনে হয় তুমিও চলো। এবার আমাদের দেখাদেখি অনেকেই ওদিকের স্ক্রাপ আনার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় কোম্পানীদের সামান্য কিছু রয়্যালটি দিয়ে ওদের স্ক্রাপ তোলার পারমিশান করানো ভালো। তাতে আমাদেরই একচেটিয়া ব্যাপার থাকবে। সাপ্লাই-এর জন্য ভাবতে হবে না। চাই কি এখানের কোম্পানীদেরও বাড়তি মাল সাপ্লাই দিয়ে বাজারের উপর নিজেদের কনট্রোল রাখতে পারবে।

হরিবাবু কথাটা শুনে বলে—তাই করে এসো সমীর। বিশ্বাম্পা ঠিকই বলেছে। এছাড়া ব্যবসা ভালো চললে নিজেরাই আরও ভালো কোয়ালিটির রবার করবো। বড় বড় কোম্পানীরা ভালো দাম দিতে রাজী।

সমীরও স্বপ্ন দেখে শুধু কুড়োনো বাতিল রবারই নয় তারা কোয়ালিটি রবার প্রোডাকশন করবে। তেমন পয়সা এলে নিজেরাই রবার বাগান ইজারা নেবে কেরলে।

সে পরের কথা। এখন একটা ধাপ তাকে উঠতে হবে। ওই টায়ার কোম্পানীদের সঙ্গে চুক্তিই করবে সে। তাই বলে—ঠিক আছে। চলো কিছুদিন আবার তোমার মুলুকে ইডলি ধোসা সম্ভরমই খেয়ে আসি।

নবুমামা বলে—তুমি এহন যাও, পরে আমিও যাইমু। একেবারে রামেশ্বরম তীর্থ সাইরা আসুম, কন্যাকুমারীতাও যামু।

হরিবাবু বলে—কারখানা তো চালু হয়ে গেছে, এদিকটা ক'দিন আমি সামলে নেব। ওই কাজটা করে এসো।

সমীর আবার বের হয়ে পড়ে। তাকে যেন কাজের নেশায় পেয়েছে। কারখানা আরও বাড়াতে হবে তাকে। আরও আরও উপরে উঠতে হবে তাকে।

কাগজে সমীরের ছবি—তার পরিশ্রম উদ্যমের কথা লেখা হয়েছে। পথের থেকে উঠে এসে আজ সে কিছু করার চেষ্টা করছে।

সুবীর এখন বেশ ডামাডোলের মধ্যেই রয়েছে। ভেবেছিল দুটো দোকান ভালোই চলবে। তার ছেলে প্রবীরও তার পাশে এসে দাঁড়াবে। ব্যবসাতে দুইজনে খেটে তাদের আখের গুছিয়ে নেবে।

রীনাও তাই চায়। সে চায় টাকা—নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না রীনা। তাই সামান্য একমুঠো অন্ন বাঁচাবার জন্য শাশুড়ীকে চিরকালের জন্য সরে যেতে বাধ্য করিয়েছে।

আর সংসারের অন্নদাস হয়েছিল সমীর, অন্তত রীনা তাই ভাবতো। তাকে সুবীর দোকানেই লাগায়। দেখেছে সুবীর ছেলেটা খুবই কাজের।

ব্যবসা বোঝে। খরিদ্দার এলে তাকে যে ভাবেই হোক মাল গছাবেই। ফিরে যেতে দেবে না। তাই তার ওই লোকসানের দোকানকেই লাভের দোকানে পরিণত করেছিল।

কিন্তু ওই রীনাই সমীরকে তাড়িয়েছিল। সুবীর সমীরের কথা ভাবেনি! তবে জেনেছিল তার নিজেরই ক্ষতি করলো রীনা ওকে তাড়িয়ে। কারণ হাঁড়ির তলানি কড়কড়ে ভাত আর মাত্র একশো টাকা হাত খরচায় অমন কর্মচারী কোনদিনই মিলবে না।

রীনা কথা শোনেনি। তার ছেলে প্রবীর এর মধ্যে ক্লাশ এইটে দুবার গড্ডান দিয়ে এখন পাড়ার লীডার সেজে মস্তানি করে। সিগারেটও ধরেছে। সমীর এ নিয়ে তাকে বলেছিল একদিন বন্ধুদের সামনে।

প্রবীর বলে—তোমার পয়সায় তো এসব খাই না, তোমার বলার কি আছে। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে।

সমীর তারপর থেকে প্রবীরকে আর কিছু বলে না। কিন্তু প্রবীরই কাকাকে দাবিয়ে রাখার জন্য কাকার নামেই দোকানের ক্যাশ চুরির অপবাদই দেয়।

রীনাও ওই চুরির কথা শুনে পতিদেবতাকে বলে—দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছো তুমি। তোমার ভাই যে চুরি করে দোকান সাফ করছে তা জানো?

সুবীরও স্ত্রীর কথায় অবাক হয়। ঘরপোড়া গরু সে। তার কর্মচারীরা সকলেই চুরি করে সুতরাং সমীর যে করবে না এমন কোন কথা নাই। তাই নজরও রাখে সুবীর ভাইয়ের উপর। কিন্তু চুরির কোন প্রমাণ পায় না।

সমীরও বৌদির কথাগুলো শুনেছে। তার মনে হয় অন্য কোথাও কোন কাজ পেলেই চলে যাবে সে। তাই তখন ওই তামাকের দোকান ছেড়ে হরি-বাবুদের টায়ার, টিউব বিক্রীর কাজই নিয়েছিল।

বৌদিই বলে—আমার খাবে, আমার বাড়িতে থাকবে আর অন্যত্র কাজ করবে? তবে সেখানেই যাও। এখানে পড়ে থাকতে লজ্জা করে না?

সমীর সেইদিনই বের হয়ে এসেছিল এ বাড়ি থেকে।

তারপর রীনা ওই বাড়িঘর নতুন করে সাজিয়েছে। প্রবীর বার দুয়েক চেষ্টা করেও মাট্রিক পাশ করতে পারেনি। রীনা দুতিনটে মাস্টার রেখেছিল। কিন্তু প্রবীরের তখন পড়ায় আর মন নেই।

বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব জুটেছে। তাদের সঙ্গে সিনেমা-রেস্তোরাঁয় যায়। ওর পয়সাতেই খায় তারা। দু'একদিন ভাগ্য ফেরাতে রেসের মাঠেও যেতে শুরু করে। ভাগ্য ফেরে না—তবে প্রবীরের যাতায়াতই বাড়ে রেসের মাঠে।

সুবীর ছেলেকে দোকানে বসিয়েছে। ওই বিডন স্ট্রীটের দোকান সে দেখে আর সুবীর বড়বাজারের গদি সামলায়। ক্রমশঃ রেসের কড়ি যোগাতে বিডন স্ট্রীটের দোকান লাটে তোলে প্রবীর। মহাজনদের গদিতেও দেনার অঙ্ক বাড়তে থাকে, পাওনাদাররা বাড়িতে এসে হানা দেয়। বাধ্য হয়ে ওই দোকান বিক্রী করে দেনা শোধ করতে হয়।

প্রবীর তখন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আরও কিছু বদভ্যাস ধরেছে। সুবীরও বুঝতে পারে বিপদের গুরুত্ব। কিছু বলার উপায় নাই ছেলেকে।

রীনাই ফুঁসে ওঠে—একটা মাত্র ছেলে—তাকেও হাতখরচা পঞ্চাশ একশো টাকা দিতে পারো না ?

রঞ্জনা এবার ম্যাট্রিক দেবে। তার বিয়ে থা দেবার কথা ভাবছে সুবীর। কিন্তু তার ব্যবসাতেও মন্দা চলেছে। প্রবীর মাঝে মাঝে বড়বাজারের গদি থেকেও টাকা তুলে নিয়ে যায়। ফলে পাওনাদারদের তাগাদা বাড়ে।

সুবীর বলে—এভাবে চললে সর্বনাশ হবে। মেয়েটার বিয়ে-থা দেব কি করে ?

রীনা বলে—একটা ছেলেকেও মানুষ করতে পারো নি. একটা মাত্র মেয়ে, তারও বিয়ে দিতে পারো না—এ কেমন বাবা ?

সুবীর আজ বুঝেছে সমীর পাশে থাকলে তাকে এভাবে বিপন্ন হতে হতো না। কাজের ছেলেটাকেই সে তাড়িয়েছে রীনার কথায়, তাতেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

সমীরের খবরও জানে না। মা নেই, মেজভাই অধীর এখন নাকি বড় নেতা হয়েছে। অন্য বাড়ি করেছে। স্কুল চালাচ্ছে মায়া-অধীর। তারা ভালোই আছে।

সমীরের খবরও জানে না।

রঞ্জনা এখন ম্যাট্রিক দেবে। পড়াশোনায় সে ভালো। আর দাদার মত বাইরে হৈ চৈ করে না। ছেলেবেলা থেকেই সে ছোটকাকা-ঠাকুমাকে দেখেছে। তার শিশুমনে তাদের সম্বন্ধে বেশ কিছু করুণ, বেদনাদায়ক স্মৃতিই রয়ে গেছে।

দেখেছে মা বাবা ওদের কিভাবে অবহেলা করেছে। রঞ্জনার শিশুমনে বিশেষ করে মায়ের সম্বন্ধে একটা নীরব ঘৃণাই রয়ে গেছে। সিঁড়ির নিচে পড়ে থাকতো ওরা। নিচের ঘর খালি পড়ে থাকতো, ফ্যান ছিল, সেখানে ওদের থাকার হুকুম ছিল না। গরমে কষ্ট হতো ঠাকুমার। রঞ্জনাই ছোট্ট পাখা নিয়ে বাতাস করতো। দেখতো ওদের খাওয়া।

রঞ্জনা বলতো—ঠাকুমা, আমি দুবেলা দুধ খাই। এখন থেকে একবার খাবো—তুমি আমারটা খাবে বৈকালে। আমি চুপি চুপি এনে দেব। মা জানতেও পারবে না।

ঠাকুমা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতো—না রে পাগলী। বড়দের দুধ খেতে নাই। ছোটরাই দুধ খায়।

কাকুকে দেখতো ভাত ডাল আলুসেদ্ধ ছাড়া আর কিছু পেত না। রঞ্জনা মাছ আনতো মাকে লুকিয়ে। কাকু খেত না।

ঠাকুমা চলে গেল, কাকুকেও মা যাতা বলে তাড়ালো। কাকু যাবার আগে ওকে আদর করে যায়।

—ভালো থাকিস মা।

আর কতদিন দেখেনি কাকুকে। বড়দা বলে—কাকু একটা বাজে।

রঞ্জনার মনে সে সব স্মৃতি হয়ে আছে। এবার ম্যাট্রিক দেবে সে। এর আগে দেখেছে দাদার বেলার বাড়িতে দুতিনজন মাস্টার আসতেন। তাকে মাস্টার দেবার সাধ্য আর সুবীরের নাই। এমনিতে রোজগার কমে গেছে।

তাই নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি। সে রকম মাছ মাংস সন্দেশ দই এসবও আসে না। রীনার শাড়ি গহনাও জোটে না তেমন।

রীনা বলে—সর্বস্ব ওই সর্বনাশা ভাইই চুরি করে নিয়ে গেছে।

সুবীর জানে এসব সর্বনাশের মূল কে। প্রবীর এখন দোকান থেকেও টাকা তুলে নেয়, গোপনে মাল বেচে। মহাজনের দেনা বাকী পড়েছে এইভাবে।

সুবীর বলে—ভাই ছিল লক্ষ্মী, তাকে দোষ দিও না।

—তাহলে আমিই অলক্ষ্মী। ফুঁসে ওঠে রীনা।

সুবীর বলে—তোমার ছেলেকে সামলাও। ওর জন্যই না পথে বসতে হয়।

রীনা ছাড়ার পাত্রী নয়। বলে—ছেলেরই যত দোষ?

বাড়িতে অশান্তির ঝড় ওঠে। রঞ্জনার বিশ্রী লাগে। তার জ্ঞান হয়েছে। সেইই বলে—মা, বাবার কথা শোনো। দাদাকে একটু বুঝে সমঝে চলতে বলো।

রীনা মেয়েকেই বলে—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। তুই থাম।

রঞ্জনা এ নিয়ে কোন কথাই বলে না। বেশ বুঝেছে এ সংসারে শনিই ঢুকেছে।

পড়ছে সে। রঞ্জনা হঠাৎ সেদিন সকালে কাগজটা দেখে চমকে ওঠে। ছবিটা খুবই চেনা। তার ছোটকাকার ছবি। সেইসঙ্গে বেশ বড় করে বের হয়েছে তার উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কারখানা, তাদের প্রোডাকশনের খবর। সমীর সম্বন্ধে অনেক খবরই ছেপেছে তারা।

রঞ্জনা চমকে ওঠে। তাদের আপনজনের ছবি ছেপে এখন কাগজেও খবর বের হয়। ছোটকাকা ক'বছরেই এখন বদলে গেছে। চেহারায় এসেছে ব্যক্তিত্বের ছাপ।

রঞ্জনা কাগজটা নিয়ে উপরে বাবার ঘরে যায়। বলে সে—দ্যাখো বাবা, ছোটকাকার ছবি বের করেছে, কত কি লিখেছে কাগজে।

সুবীরও দেখে কাগজটা।

রীনা বলে—কাগজওয়ালাদের খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই, ওই হতচ্ছাড়ার সম্বন্ধে লিখছে? দ্যাখো ডাকাতি খুন টুন করেছে বোধ হয়। জানতাম—এবার এখানে না পুলিশ আসে।

প্রবীর বিজ্ঞের মত বলে—আজকাল ব্যাঙ্ক ডাকাতি খুব হচ্ছে। কত লাখ টাকা মেরেছে রে?

রঞ্জনা বলে—ওসব নয়। ছোটকাকা রবারের কি সব তৈরীর কারখানা করেছে। দ্যাখ না—কত প্রশংসা করেছে। পথের মানুষ মাথা তুলেছে আকাশে—

সুবীর বলে—তাইই। দ্যাখো, বলিনি ও একদিন ঠেলে উঠবেই। জীবনে ও কাউকে ঠকায় নি, তাই ঈশ্বর ওকেও ঠকান নি। আজ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—

প্রবীর বলে—ওসব সবাই পারে। একবার একটা বাজী ট্রিবলটোট যদি মারতে পারি আমিও একটা কারখানাই গড়বো।

রীনা ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে—তাই করো ঠাকুর।

সুবীরের সারা দেহমন জ্বলে ওঠে। বলে সে—থামবে তোমরা? মা ব্যাটায় যা শুরু করেছো লোকে এবার ছিঃ ছিঃ না করে।

সুবীর আজ খুশী হয়। ভয়ও হয় নিজের চোখের সামনে যেন অন্ধকার অতল একটা খাদের ছবিই ভেসে ওঠে।

উমারাও অনেকদিন সমীরের খবর জানে না। উমার বাবা বাইরে বাইরে বদলির চাকরি করেছে। রিটায়ারেব আগে তাই কলকাতার শহরতলীর ওদিকে মধ্যমগ্রামের কাছে দুই বন্ধু মিলে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু করেছিল।

বাসুদেববাবু বহরমপুরে থাকতো চাকরির জন্য আর শ্যামলী মেয়ে উমা আর ছেলে রবিকে নিয়ে কলকাতায় থাকতো তাদের পড়াশোনার জন্য।

মাঝে মাঝে বাসুদেববাবু কলকাতার বাসায় দু'একদিনের জন্য এলেও বাড়ি তৈরীর কাজে দিনভোর মধ্যমগ্রামে বন্ধুর বাড়িতে থাকতো।

বাড়ি তৈরী হয়ে যেতে শ্যামলীও এবার শুভদিন দেখে নিজেদের বাড়িতে চলে আসে ছেলে মেয়েকে নিয়ে। বাসুদেববাবুও রিটায়ার করে এসে এবার মধ্যমগ্রামে থিতু হয়।

শ্যামলীদের কলকাতার বাসা ছেড়ে চলে আসাটা ঘটে হঠাৎই। ওই অন্ধকার গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকতে শ্যামলীর মন চায় না। বাড়ি তৈরী করে তালা দিয়ে ফেলে রাখলে বেদখলও হতে পারে।

তাই বাড়ি তৈরী হতেই ওরাও চলে আসতে মনস্থ করে। তার স্বামী বাসুদেববাবুও এসে পড়েন। তিনি বলেন—এখানে আর অভাবে থাকবে কেন? সামনেই শুভদিন। ওইদিনই আমরা নতুন বাড়িতে চলে যাবো।

উমা এবার পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করলে ওখানের কলেজেই ভর্তি হবে। আর ছোট ছেলেকেও ওখানের স্কুলেই দেবেন।

উমা খবরটা শুনে চমকে ওঠে। এখানে এতদিন ছিল, বন্ধুবান্ধবও এখানে সবাই। আর সমীরের কথা মনে পড়ে। সমীরের চিঠি আসেনি—তার মাদ্রাজের ঠিকানাও জানে না।

উমার মনে হয় ওরা যেন তাকে জোর করে সমীরের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। বলে উমা—মা, এখনই চলে যাবে? ওদিকে তো এখনও পথঘাট তেমন হয়নি। বর্ষায় জলও জমে; স্কুল কলেজও দূরে।

বাসুদেববাবু বলেন—তবু নিজেদের বাড়ি। খোলামেলা—গাছগাছালি আছে। এই পচা গুদামে তো আমার দমবন্ধ হয়ে আসছে। আলো হাওয়া নেই—ভাপসা গরম। জলও সামান্য। সেখানে নিজের বাড়িতে তবু জল-আলো হাওয়া পাবো। মাসে মাসে ভাড়াও দিতে হবে না।

উমার মা শ্যামলীও বলে—তাই চলো বাপু। এখানে আর ভালো লাগছে না।

ওরা উমার কথাটায় কোন গুরুত্বই দিল না। তাই ওরা হুটপাট করেই চলে গেছে এবাড়ি থেকে।

উমার সারা মনে কি শূন্যতা জাগে। এখানে সঙ্গী বন্ধুও কেউ নাই। একা একাই দিন কাটে। তার মনে পড়ে সমীরের কথা। কোথায়—কত দূরে রয়েছে সমীর উমা তা জানে না।

জীবনে ওই তার প্রথম পুরুষ। উমার কুমারী মনে সেইই এনেছিল এক নতুন চেতনার জগতের খবর যেখানে আছে নানা বর্ণসৌরভে ভরা এক অনুভূতি, যার নাম প্রেম। তার জীবনে প্রথম প্রেম ব্যর্থই হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সমীর।

ভেবেছিল উমা এ বাড়িতে আসবে একদিন। কিন্তু আসা আর হয়নি। ওখানে নতুন কলেজে ভর্তি হতে হবে—কিছু নতুন বাড়িও উঠছে। দুচার ঘর মানুষ আসছে।

বাবাও রিটায়ার করে চলে এসে এখন বাড়িতে রয়েছেন। উমা কলকাতায় একা আসার সুযোগও পায় নি।

দিন মাস বছর কেটে যায়। সময় বসে থাকে না। সে জলপ্রবাহের মত আপন গতিতে বয়ে চলে। উমা কলেজে ভর্তি হয়েছে।

এদিকে এখনও শহরের মজবুত থাবাটা জমিয়ে বসে নি। নতুন বাড়ি উঠছে, নতুন মানুষজন আসছে বাড়িতে। তবুও আশপাশে গাছগাছালি—এদিক ওদিকে এখন কিছু সবুজ ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, আমবাগান রয়েছে।

আমের বোলের মিষ্টি সুবাস ওঠে—ভোরে পাখিদের কলরবও শুরু হয়। উমা ক্রমশঃ এই জগতের সঙ্গে মিশে গেছে।

মাঝে মাঝে ঝরা বকুলের গন্ধের সঙ্গে মনে পড়ে চৈত্রশেষের ক্লান্ত দিনে সমীরের কথা। এত লোকজনের ভিড়ে সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

শ্যামলী-বাসুদেববাবু এবার মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছে। মেয়েও বড় হচ্ছে। বিয়ে-থা দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতে হবে। তাই দু-এক জায়গায় পাত্রের খোঁজও করছে। বাসুদেববাবু বন্ধুবান্ধবদের ও কলকাতায় তার জানাশোনা অনেককেই পাত্রের সন্ধান করতে বলেছেন।

বিরাট চাকুরে—বিশাল ধনী পাত্রে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য সামর্থ্য তার নেই। স্বাবলম্বী সৎ পরিশ্রমী ছেলে তার চাই, যে নিজে খেটে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এমন একটি একটি ছেলে হলেও তার চলবে।

দু এক জায়গায় দেখতেও গেছেন তিনি। কিন্তু ছেলে পছন্দ হলেও তাদের

দাবীর যা বহর তাতে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। ওদের টাকার লোভে বাসুদেববাবু সায় দিতে পারেন নি।

শ্যামলী বলে—সুপাত্র, টাকা তো চাইবেই।

—তাই বলে একেবারে ফর্দ মিলিয়ে দিতে হবে সব? এ তো লোভী মানুষেরই লক্ষণ—অমন পাত্রে মেয়ে দিলে কোনদিন তোমার মেয়ে সুখী হবে না। আমি চাই সৎ—নির্লোভ পাত্র।

—তাহলে খোঁজো! কবে পাও দ্যাখো সেই মনের মত পাত্র।

বাসুদেববাবুর এক বন্ধু এখনও সরকারী শিল্পবিভাগে কাজ করে। গোবিন্দ হালদার দেখেছে ইদানীং ওই সমীরকে। ছেলেটা তার ফ্যাক্টরীর ব্যাপারে তার বিভাগে আসে নানা দরকারে।

সৎ কর্মঠ ছেলে। এর মধ্যে সামান্য অবস্থা থেকে এখন নিজের রবার মোল্ডিং, প্রসেসিং কারখানা করেছে। তার কারখানার মালেরও খুব কাটতি। সরকারী অর্ডার তাকে গোবিন্দবাবুই পাইয়ে দেন।

নবুমামাও আসে এখানে। সমীর এখন কাজের জন্য মাদ্রাজ-কেরালায় প্রায় যাতায়াত করে। এখানে থাকলে সমীর নিজে আসে গোবিন্দবাবুর কাছে। তার কাছে সমীর কৃতজ্ঞ।

সরকারী বিভাগে এখনও বেশকিছু সৎ লোক আছে। অবশ্য তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমেই আসছে। আজকের কর্মীদের অনেকেই কাজ করার থেকে ঘুরে ঘুরে অকাজ করার আর সেইসব করে টুপাইস রোজগার করে নিজেদের আখেরই গোছাতে ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু গোবিন্দবাবু তাদের মত নন। তিনিই সমীরকে উৎসাহ দেন। —বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে ভিন প্রদেশ থেকে কাঁচামাল এনে ব্যবসা করছো, লড়াই করে দাঁড়াতে চাইছো—তোমাকে দেখে তাই ভালো লাগে হে। এখানের বাজার দখল করো। চাই কি ওই মাদ্রাজ-কেরালাতেই যেখানে কাঁচামাল এত রয়েছে—সেখানেই ফিনিশড মাল বানাবার ব্যবস্থাও করো। তাহলে ট্রানস্‌পোর্ট কম দিয়েই কম দামে মাল এ বাজারে—ভারতের অন্য স্টেটেও দিতে পারবে। ওদিকে লেবারও সস্তা।

তারপর গোবিন্দবাবু গলা নামিয়ে বলেন—তারা কম 'ইনকিলাব' করে হে, আমাদের এখানের মত বচন, ভাষণ আর আমাদের দাবী নিয়ে এত গলা তোলে না, কাজ করে পয়সা চায়।

সমীরও ভাবছে কথাটা। গোবিন্দবাবুর কথাটা মনে ধরে। ওখান থেকে ট্রাকে-ওয়াগনে রাশি রাশি কাঁচামাল এনে এখানে মাল তৈরী করার থেকে এখানে কিছু করে বাকীটা ওখানেই করলে প্রোডাকশন খরচাও অনেক কম পড়বে।

সমীর বলে—দেখি। এখানের কারখানা চালু রাখতেই হবে।

—তা তো রাখবেই। তোমার সাপ্লাই অর্ডারটা করিয়ে রেখেছি।

সমীর বলে—অনেক ধন্যবাদ।

ওই লোকটি কিছুই নেয় না। তাই সমীর ওকে শ্রদ্ধা করে।

এই গোবিন্দবাবুই সেদিন বাসুদেববাবুকে কথাটা বলেন—একটি ভালো ছেলে আমার সন্ধানে আছে হে। নিজের পরিশ্রমে দাঁড়িয়েছে। ট্যাংরার দিকে একটা রবারের কারখানা করেছে। খুবই ব্রাইট ছেলে। কাগজেও তার ফ্যাক্টরীর কথা অনেক লিখেছে।

বাসুদেববাবু কলকাতায় এলে গোবিন্দবাবুর অফিসে আসেন। কথাবার্তাও হয়, সংসারের কথা। গোবিন্দবাবুই বাসুদেবকে কাগজটা দেখায়।

বাসুদেববাবু সমীর সম্বন্ধে লেখাটা—তার কারখানার ব্যাপারেও পড়েন। একটা সম্ভাবনা আছে ছেলেটির মধ্যে।

বাসুদেব বলে—ও কি বিয়ে করতে রাজী হবে?

গোবিন্দবাবু বলে—কেন হবে না? তবে তোমার মেয়ে বললে বি এ পড়ছে, ছেলেটি তো ম্যাট্রিক পাশ করার সুযোগও পায় নি। খুবই গরীব। পড়া ছেড়ে দিনমজুরী করেছে বাঁচার জন্য—আজ এখানে উঠেছে।

বাসুদেব বলে—ছেলেটি আমার পছন্দ হে। জীবনের পাঠশালায় ও অনেক পাঠ নিয়েছে। আর ব্যবসা ওর রক্তে। দেখবে ও আরও বড় হবে। আমার অমত নাই—বাড়ির অমতও হবে না এ ছেলের ব্যাপারে।

গোবিন্দবাবু বলেন—তাহলে আমি বলে কয়ে দেখি যদি ছেলেটিকে রাজী করাতে পারি।

সমীর মাদ্রাজ-কেরালা থেকে ফিরেছে। এখন সেখানের কোম্পানীর সঙ্গে তার একটা চুক্তিও হয়েছে। তাদের স্ক্রাপ নেবে, কিছু টাকাও বার্ষিক দেবে রয়্যালটি হিসাবে।

কারণ এখান থেকেই কাউল কোম্পানীই খোঁজখবর নিয়ে সেখানে গেছল, সমীর হঠাৎ সেখানে একটা লজে মিঃ কাউলকে দেখে বহুদিন পর।

সমীরকে দেখে কাউল সাহেবও ঘাবড়ে যায়। লোকটা তারই নয় অনেকের অনেক টাকা মেরে কোম্পানীর নামই বদলে এত দিন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তার মতলব এখান থেকে সেই সব মাল পাঠাবে।

সমীর বলে—এতগুলো টাকা মেরে দিলেন মিঃ কাউল?

কাউল উল্টে বলে—ওই ভাইপোই আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে সমীর। ওই কোম্পানী দখল করে নিল মিথ্যা দেনার দায়ে।

সমীর বলে—আর সেই কোম্পানীর হয়ে আপনি মাল নিতে এসেছেন এখানে? এটা কি বিশ্বাস করার মত কথা?

কাউল সাহেব ধরা পড়ে গেছে।

সমীর বলে—কাজটা ভালো করেন নি। টাকা তো মারলেনই আবার এখানেও মাল নিয়ে আমাকে ভাতে মারতে চান।

কাউল সাহেব বলে—কারবার করতে গেলে এসব করতে হয়।

—না। এসব করে ব্যবসা হয় না। জোচ্চুরি করে ব্যবসা করা যায় না।

কাউল সাহেব বলে—দেখা যাক।

সমীর এমনি কিছু খবর আগেই পেয়েছিল বিশ্বাম্পার মারফৎ।

বিশ্বাম্পাই বলে—কাউল সাহেব বলে একজন এসেছিল খবর নিতে। আমিই তাকে ভরসা দিয়েছি মাল পাইয়ে দেব।

—সেকি! অবাক হয় সমীর।

বিশ্বাম্পা বলে—তোমার এক লাখ টাকা ও মেরেছিল।

—হ্যাঁ।

বিশ্বাম্পা বলে—তুমি খেল দ্যাখো বস। বিশ্বাম্পা নাইডু তোমার টাকা উসুল করে দেবে।

কাউল সাহেব বিশ্বাম্পাকেই হাতে আনতে চায়। টাকা দিয়ে সব কাজই করায় তারা। বিশ্বাম্পাও বলে কাউল সাহেবকে—তোমার অর্ডার হয়ে যাবে সাহেব। ওরা এক লাখ টাকা চায়। জানোই তো আজকাল ওসব না পেলে কেউ কাজই করে দিতে চায় না। তুমি লাখ লাখ টাকার মাল পাবে জলের দামে। ওদের দেবে না?

কাউল সাহেব জানে কিছু দিতেই হবে। তবু দর করে—ওদের রাজী করাও কিছু কমে।

নগদ এক লাখ টাকাই দেয় বিশ্বাম্পাকে। মিঃ কাউল শুধোয়—অর্ডার কবে পাবো? ওই সমীর যেন মাল না পায়। তুমি এখন থেকে আমার হয়েই কাজ করবে বিশ্বাম্পা। দুহাজার টাকা মাসে দেব—

বিশ্বাম্পা ওর টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে বলে—অর্ডার পাবে দু একদিনের মধ্যেই। বেফিকির থাকো।

তারপরই বিশ্বাম্পা এসে হাজির হয় সমীরের কাছে। বলে—অ্যাপেলো টায়ারের পারমিট তো পেয়েছো, চলো প্রিমিয়ারের পারমিটও পেয়ে যাবে আজই।

—কিন্তু টাকা? সমীর বলে টাকা তো তুলিনি। ব্যাঙ্কও বন্ধ।

বিশ্বাম্পা বলে—ওর জন্য ভেব না। আগে পারমিট তোলো, না হলে ফেউ লেগেছে। বিপদ হবে।

ওকে সেই মোপেডে বসিয়ে নিয়ে গেল সোজা ওই কোম্পানীর অফিসে। বিশ্বাম্পা সেখানে এর আগেই ফোন করে রেখেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্যাশে জমা দিয়ে রসিদ দেখাতে সেখানেও সমীরের নামে স্ক্রাপ ডেলিভারির অর্ডারটা পেয়ে যায়।

সমীর বলে—টাকা কোথায় পেলে? শোধ দিতে হবে তো?

হাসে বিশ্বাম্পা। বলে—বাংলায় বলে না যার শিল তারই নোড়া, তারই ভাঙ্গবো দাঁতের গোড়া। তাই করেছি। এই নাও বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা।

—মানে?

—মিঃ কাউল তোমার এক লাখ টাকা মেরেছিল। ওটা ফেরৎ এনে এখানেই দিলাম পঞ্চাশ, বাকী পঞ্চাশ ওই ক্যাশ।

—কি বলছো ?

বিশ্বাম্পা বলে—ধরো তাই। আমি ওটা ওদের লোকদের ঘুষ দিতে হবে বলে ওর কাছ থেকে নিয়েছি।

—তারপর ?

—বলবো সার, টাকা খেয়েও ওরা বেইমানি করে সমীর কোম্পানীকেই পারমিট দিয়েছে। আমি কি করবো ?

—সেকি !

হাসে বিশ্বাম্পা। বলে—ওর সঙ্গে বেইমানি করা পাপ নয় বস্।

কাউল সাহেব আশা করে বসে আছে, সেই সব মাল পাবে। সমীরের কারখানাকে বসিয়ে দেবে। আবার সেই রবারের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করবে।

বিশ্বাম্পা আর আসে না। ছটফট করে সাহেব। শেষে নিজেই বের হয় মিঃ কাউল বিশ্বাম্পার সন্ধানে।

দেখে ওই স্ক্রাপ ইয়ার্ডে লোকজন দিয়ে সমীর মাল লোড করাচ্ছে ওয়াগনে, বিশ্বাম্পাও রয়েছে।

কাউল সাহেব অটো থেকে বিশ্বাম্পার কাছে এসে এবার রুক্ষ কঠিন স্বরে বলে—এটা কি হচ্ছে ? আমার পারমিট কি হলো ?

বিশ্বাম্পা এবার মাথায় কপালে হাত চাপড়ে ইংরাজী তামিল মিশিয়ে বিচিত্র টানে বলে—ভেরি সওরি কাউল সাহেব। অলো আর ভেরি ব্যাড ম্যান। টেকিং মানি নাথিং ডুয়িং। সমীরবাবু ম্যানেজড—গট পারমিট। বাট্ আই ট্রায়েড ফর ইউ আপন গডঅ—বিলিভ মি—

কাউল সাহেব ব্যাপারটা বুঝেছে। গর্জে ওঠে সে—কলকাতা হলে তোমাকে এর জবাব দিতাম।

বিশ্বাম্পা বলে—কলকাতায় যে পাপ করেছিলে এখানে তারই প্রায়শ্চিত্ত করে গেলে মিঃ কাউল।

—এভাবে ঠকালে ?

কাউল সাহেবকে এবার সমীরও উচিত শিক্ষা দেবে। লোকটা এখানেও তার সর্বনাশ করতে এসেছিল। সমীর বলে—ব্যবসায়ে এরকমই হয় আপনিই কাল বলেছিলেন। বিশ্বাম্পা তাইই করেছে মিঃ কাউল।

কাউল সাহেব বুঝেছে সমীকে ঠকিয়ে সে ভুল কাজই করেছে, তাই এইভাবে শূন্য হাতেই তাকে ফিরতে হলো। ব্যবসা করতে গেলে সমীরের মালই নিতে হবে তাকে।

বিশ্বাম্পা বলে—এবার রবার গার্ডেন একটা লীজ নাও বস্। এখানেই প্রসেসিং কারখানা করো।

সমীর বলে—তাই ভাবছি বিশ্বাম্পা। এবার ফিরে এসে ওই গার্ডেনই দেখতে যাবো কাজিকোডোর ওদিকে। কারখানার জায়গাও দেখে রাখো।

—তাই হবে বস্।

সমীর জানে এখানের সরকারও তাকে লোন দেবে, তার কলকাতার বিজনেসের উপর। সেখানের সরকার, মন্ত্রীদের রেকমেনডেশন দরকার। তার ছোটদা অধীরবাবুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু সমীর দাদাদের কোন সাহায্যই নেবে না।

কলকাতায় ফিরে সে গোবিন্দবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা বলতে গোবিন্দ-বাবু বলেন—নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হবে। সরকার এটুকু করবে না? আমি করে দেব। চা খাও।

তারপরই কথায় কথায় বলে গোবিন্দবাবু—বিয়ে থা করো এবার।

চমকে ওঠে সমীর—বিয়ে। আস্তানা বলতে একটা গুদাম ঘর—আশ্রয় বলতে ওই কারখানার শেড। টিকে ধরাবার জমিনও নাই। বিয়ে করবো? একটা মেয়েকে এনে রাখবো কোথায়? খাওয়াবো কি?

গোবিন্দবাবু বলেন—খাওয়াবার মালিক কি তুমি হে? তোমার অন্ন কে যোগায়? সেই উপরওয়ালা। তাঁর ইচ্ছা না হলে এখানে উঠতে? এখনও আলুই রং করতে ছোকরা।

কথাটা সমীরও মানে। গোবিন্দবাবু বলেন—কথায় আছে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। তোমার ভাগ্যে সবটা নেই—অন্য একজন এলে হয়তো দিনই বদলাবে। আরও বড় কিছু হবে।

সমীর বলে—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু মেয়ে তো কেউ আমায় দেবে না। লেখাপড়ায় তো দিগ্‌গজ—পেশার শুরু আলু রং করা, গাড়ি ধোয়া থেকে—এসব শুনলে কেউ মেয়ে দেবে?

গোবিন্দবাবু বলেন—দেখা যাক। ওটার ভার আমার উপরই ছেড়ে দাও।

নবুমামাও সঙ্গে ছিল। সে ইদানীং সমীরের ব্যবসার এদিকটা সামলায়। এখন তারও সেই চিমটে শ্রীঅঙ্গে জেল্লা এসেছে। বিড়ির বদলে সিগ্রেট ধরেছে। পায়ে পামসু—টায়ারকাটা চটি আর বাজারের রেডিমেড হাফশার্টও এখন বাতিল। তার পোশাকও এখন বেশ দামী।

নবুমামা বিয়ের কথা শুনে ঠিক খুশী হয়নি। নবুমামার স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা ভয়ানক আতঙ্কই রয়েছে। ইদানীং নবু সেই বস্তির ঘর ছেড়ে নতুন বাসা নিয়েছে গড়পারের ওদিকেই।

গিন্নী তাই আপাততঃ কিছু শান্ত, কারণ এখন নবুমামা ভালোই রোজগার করছে।

নবুমামা জানে সমীর বিয়ে থা করলে এবার সংসারে মন দেবে। ব্যবসার কাজে এখানেই বেশী থাকবে নতুন বউয়ের টানে। নবুমামা সেটা যে কোন কারণেই হোক ঠিক চায় না।

তাই বলে—বিয়ে। বুঝলে গিয়া বাবাজী, বিহা কইরাই নিজের কপাল পোড়াইছি। কথায় কথায় এডা করবা না, ওডা করবা না, সিংহরাশি পুরুষেরেও ভেড়া বানাই দেয়। তুমিও হেইটা করবা?

সমীর বলে—তাই তো ভাবছি।

—হঃ। যা করবা ভাইবা চিন্তা করবা।

সমীরের মনে পড়ে উমার কথা। বীণা কবে এসেছিল মনে পড়ে না। সে চলে যেতে সমীর দুঃখই পেয়েছিল। উমা তারপর এসেছিল তার জীবনে। এতবড় পৃথিবীতে তারা কোথায় হারিয়ে গেল। আজ সে নিঃসঙ্গ, একা। দিনরাত ব্যবসা—মাল তৈরী, কারখানা এই নিয়েই রয়েছে।

হরি মুখুয্যেও চায় সমীর এইভাবে এদেশ ওদেশ ঘুরে তার জন্য কাঁচামাল আনুক। সে এখন ভালো ব্যবসাই করছে।

নবুমামাই হরিবাবুকে খবর দেয়—সমীর বিহা করতি চাই।

অর্থাৎ ঘর বেঁধে থিতু হতে চায়। এখানে তারাই কারখানা চালাচ্ছে—মাল বিক্রী করছে। সমীরকে যা দরকার টাকার, তা অবশ্য দেয়। কিন্তু কোথায় একটা অন্তরালের ব্যাপার আছে সেটাও যেন বুঝেছে সমীর।

সব কাঁচামাল এণ্ট্রি করাও নাই। অর্থাৎ দু'এক চালান মাল বাইরেই পাচার হয়ে যায় কোম্পানীর খাতায় না ঢুকে। প্রোডাকশনের হিসাবে আর বিক্রীর হিসাবে এবং স্টকের মালের হিসাবেও গোলমাল দেখে।

সমীর বলে—ওদিকে রবার বাগান কিনতে হবে, ওখানেই অন্য একটা ফ্যাক্টরী বানাতে হবে, টাকার দরকার।

হরিবাবু নবুমামার দিকে চাইল।

নবুমামা বলে—একখান কারখানা লইয়াই হিমসিম খাইত্যাছো বাবাজী। লেবার প্রবলেম-প্রোডাকশন লই নাকদম হইছি? আবার একখান কারখানা বানাবা?

—ওটা কেরলেই বানাবো। কাঁচামাল নয়—ফিনিশড মালই আনবো ওখান থেকে। লাখখানেক টাকা লাগবে—বাকী ওখানের সরকারই দেবে।

হরিবাবু বলে—সেখানে কে দেখাশোনা করবে?

—তার জন্য লোক আছে।

হরিবাবু বলে—দেখি কি করা যায়।

ওদের যেন ঠিক মত নেই এই ব্যাপারে সেটা বুঝেছে সমীব।

বাসুদেববাবুকে গোবিন্দবাবুই ওই সমীরের খবর দেয়। সই কথাই বলে তার সম্বন্ধে। বাসুদেববাবুর এই যেন মনোমত পাত্র। শ্বশুর শাশুড়ি ননদের ঝামেলা নেই। ছেলেটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলেন—একবার দেখা যায় না ছেলেটিকে? ওর কারখানার ঠিকানা তো জানো। চলো, দেখে আসি!

সমীর সেদিন কারখানায় কাজ দেখছে। ওদিকে ফার্নেসে মাল গলিয়ে প্রয়োজনমত কেমিক্যাল দিয়ে ওই গলন্ত মালকে রিফাইন করে ডাইসে ঢালা হচ্ছে। গরমে ঘামছে সে।

এমন সময় গোবিন্দবাবুর সঙ্গে আর এক সৌম্যদর্শন ভদ্রলোককে কারখানার অফিসে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়।

সমীর এগিয়ে আসে। বাসুদেববাবু দেখছেন ছেলেটিকে। গরমে ঘামছে সে। পরনে প্যান্ট, মাথায় একটা টুপি, আর গেঞ্জি পরা। বলিষ্ঠ পেটা চেহারা। মুখে একটা সারল্য। চোখ দুটো উজ্জ্বল। যেন জীবনযুদ্ধের সার্থক এক সৈনিক।

বলে সমীর—আসুন গোবিন্দবাবু।

গোবিন্দবাবু পরিচয় করিয়ে দেন—ইনি আমার সিনিয়ার বাসুদেববাবু।

নবুমামাও এসেছে। সে জানে কখন কি করতে হয়। সে এর মধ্যেই কোল্ড ড্রিংকস আর মিঠে পান আনিয়েছে।

—নিন স্যার। যা গরম পড়েছে। ওদের পানীয় এগিয়ে দেয়।

সমীর বলে—আমার মামা। কারখানা দেখাশোনা করেন।

নবুমামা এবার ভাষণ শুরু করে—ও তো বাইরে বাইরে ঘোরে। এখানকার সব ঝামেলা পোয়াতে হয় আমারেই। ছোট থেকে মানুষ করছি—

গোবিন্দবাবু বলেন—এবার গার্জেনের বাকী কাজটাও করুন। সংসারী করুন ছেলেটাকে। ওঁর একটি মেয়ে আছে।

বাসুদেব বলে—যদি পছন্দ হয় আমি রাজী।

নবুমামা বলে—প্রজাপতির নির্বন্ধ হইলে নিশ্চয়ই হইব। সব তাঁরাই ইচ্ছা।

বাসুবাবু বলেন—তাহলে এই রবিবার দেখতে আসুন।

গোবিন্দবাবুই ওদের ঠিকানাপত্র দিয়ে বলে—সমীর, আমিও থাকবো। দ্যাখো যদি পছন্দ হয়। তাহলে শুভকাজ হতে পারে। নবুবাবু, তাহলে ওই কথাই রইল।

নবুমামা ভাবছে। বলে আমতা আমতা করে—ঠিক আছে।

বাসুদেব বাড়িতে এসে পাত্রের কথা বলতে তার স্ত্রী সব শুনে বলে—ছেলেটা তো ম্যাট্রিক পাশও নয়। তোমার মেয়ে বি-এ পড়ছে। ওই মুখ্যু ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে?

বাসুদেববাবু বলে—ম্যাট্রিক কেন এখন বি-এ, এম-এ পাশ করে কত ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। এ কোথা থেকে কোথায় উঠেছে দ্যাখো। নিজে কাজ জানে। ব্যবসা বোঝে। মাদ্রাজ-কেরালাতেও নিজেদের অফিস করেছে, কারখানাও করবে। সেখান থেকে মাল এনে নিজে এখন কারখানা চালাচ্ছে, যা রোজগার করে কম নয়। কত লোকের অন্ন যোগাচ্ছে—তোমার মেয়েকেও দুমুঠো খাওয়াতে পারবে সে। আমার পছন্দ হয়েছে ছেলেটিকে। দেখবে জীবনে ও আরও অনেক উন্নতি করবে। এমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বাসুদেববাবুর স্ত্রীও শোনে স্বামীর কথাগুলো। তারও স্বামীর উপর বিশ্বাস আছে। তবু মায়ের মন—মা চায় তার মেয়ে শুধু উপার্জনক্ষম, সৎই নয়, শিক্ষিত ছেলের হাতে পড়ে।

কথাটা শোনে উমাও। তার ছোট ভাই রবিই খবর দেয়—বাবা তোর জন্য পাত্র দেখে এসেছে। এই রবিবার তোকে দেখতে আসবে তারা। ছেলেটার নিজের কারখানা আছে।

উমা শুনে চমকে ওঠে। তাকে সেজেগুজে গোমরা মুখ করে পরীক্ষা দিতে বের হতে হবে। কার হাতে পড়বে জানে না। মায়ের কথাতেই বুঝেছে ছেলেটি কোন পাশটাশই করেনি। মিস্ত্রীই বলা যেতে পারে।

উমার মনে পড়ে বার বার সমীরের কথা। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্নই দেখেছিল উমা। সব হারিয়ে গেল। তাকে যেতে হবে কোন লেখাপড়া-না-জানা এক অশিক্ষিত মিস্ত্রীর ঘরে।

উমা মাকে বলে—এখানে বিয়ে করবো না মা। লেখাপড়া জানে না—

মাও এটাকে সমর্থন করে। কিন্তু স্বামী তাদের আসতে বলেছে, এই রবিবার তারা আসবে। অতিথিদের অসম্মান করতে পারে না সে।

মা বলে—ওরা আসছে, তুই আসবি ওদের সামনে।

—না।

মেয়ের জেদ দেখে মা বলে—তোর বাবার মুখ রাখ মা। ওরা চলে গেলে আমি তোর বাবাকে বুঝিয়ে বলবো। ওখানে বিয়েতে আমারও মত নাই।

আমাদের মেয়েদের নিজেদের বিশেষ কিছু করার হাত নেই। প্রতিবাদ যদিওবা করে তা ক্ষীণ। আর পুরুষদের কাছে সেই প্রতিবাদও অর্থহীন হয়ে ওঠে নিজেদের স্বার্থে।

তাই উমার আপত্তিটাও বাসুদেববাবু কানে তোলে না। বাসুদেববাবু বলে—আমি সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মা মেয়েতে এসবের কিছু বোঝ না। তাই বলছি—এ বিয়েতে মত দাও। আখেরে ভালোই হবে। তোমার মেয়ে সুখী হবে।

পাত্রপক্ষ আজই আসবে। বাসুদেববাবু তাদের আপ্যায়নের জন্য যথা-সাধ্য আয়োজনও করেছেন। সকাল থেকেই উমার মুখে যেন মেঘ নেমেছে। শ্যামলীদেবীও খুশি নয়। তবু সে ঠিক করে রেখেছে তেমন মনোমত না হলে কিছুতেই ওখানে সে মেয়ের বিয়ে দেবে না।

তবু উমাকে ওর মধ্যেই সাজগোজ করাতে হয়। পাশের বাড়ির দু'একজন মহিলাও এসেছেন। বিয়ে বা কনে দেখার ব্যাপারে মেয়েদের আগ্রহ একটু বেশীই।

বৈকালে ট্যাক্সিটা এসে থামে ওদের বাড়ির সামনে। নবুমামাও সেজেগুজে নামছে। জানালা দিয়ে দেখছে উমা-শ্যামলীও। দু'একজন আসে এদিকে ট্যাক্সিতে। অনেকের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। ছুটির দিন তারা বাড়ি তৈরীর তদারকি, দেখভাল করতে আসে। তাদেরই কেউ হবে।

কিন্তু গাড়ি থেকে সমীরকে নামতে দেখে এবার চমকে ওঠে উমা। শ্যামলীদেবীও।

শ্যামলীদেবী বলে—সমীর না? এদিকে কোথায় এসেছে?

উমা বের হয়ে যায়।

—এ্যাই।

সমীরও উমাকে দেখে এগিয়ে আসে। কতদিন পর দেখছে তাকে। এখানেই হারিয়ে যাওয়া উমার দেখা পাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

—উমা। তুমি! মাসীমা?

সমীর প্রণাম করে শ্যামলীদেবীকে।

সমীর বলে—এখানেই বাড়ি করেছেন? বাড়ি করে এই হতভাগাকে একেবারে ভুলে গেলেন মাসীমা?

শ্যামলীদেবী বলে—না বাবা। তা তুমি এখানে? বাড়ি করছ নাকি?

নবুমামা এবার বলে—আর বলবেন না? এক ভদ্রলোক গিয়ে ধরেছেন—সমীরকে তার মেয়েকে দেখতে হবে। বিয়ের ব্যাপারে ঝুলোঝুলি। আমাদের মত নাই। তবু ভদ্রলোকের কথা ফেলতে পারলাম না, আসতে হলো।

পকেট থেকে চিরকুট বের করে বলে নবুমামা—চেনেন একে? নতুন বাড়ি উঠছে, কেউ কাউকেই চেনে না। এখান ওখানে ঘুরছি। হ্যাঁ—বাসুদেববাবুর বাড়ি—

এমন সময় বাসুদেববাবুও দোকান থেকে মিষ্টির প্যাকেট হাতে রিক্সা থেকে নামছেন। সমীরদের দেখে এগিয়ে আসেন।

—এসে গেছো বাবাজী। চলো—ওগো—

স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করাতে যাবেন তখন শ্যামলীদেবী বলে—থাক। সমীরকে আর চেনাতে হবে না। এসো বাবা।

উমা তখন ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকেছে। সারা মনে তার এক অজানা খুশীর সুর ওঠে। এতদিন পর সমীর ফিরে এসেছে তার জীবনে।

বাসদেববাবুও অবাক হন। স্ত্রীকে বলেন—চেনো, আগে তো বলোনি?

শ্যামলীদেবী বলে—ওই ছেলেকেই যে দেখেছো তা তো জানতাম না। সত্যি ভালো ছেলে গো। তোমার কথাই সত্যি।

বাসুদেববাবু বলেন—দেখো, মানুষ চেনার ক্ষমতা আমার আছে। ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনকে চিনেছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, ওকে কেউ দমাতে পারবে না। তোমার মেয়ে যদি ওইভাবে দুঃখকষ্ট সহ্য করে ওর মত জীবনে লড়তে পারে, সেও একদিন সুখী হবেই। কি, আর অমত নেই তো?

শ্যামলীও আর অমত করতে পারে না।

বাসুদেববাবু শুধোন—তোমার মেয়ের? সে তো মুখ ভার করে বসেছিল।

শ্যামলী বলে—এখন দেখে বুঝতে পারছ না? ওর অমত নেই। দুটিকে মানাবেও ভালো।

সমীরও এতদিন পর আবার উমাকে খুঁজে পেয়েছে। তার মনেও একটা অজানা ভয়ই ছিল। কি জানি কেমন মেয়ে হবে। নবুমামা তো বিয়ের নামে তাকে নিদারুণ ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল।

এখন সেই ভয় কেটে গেছে সমীরের। মনে হয় এ যেন সেই অদৃশ্য ঈশ্বরেরই বিধান। তাই এই রকম নাটকীয়ভাবে তাকে খুঁজে পেয়েছে সে এতদিন পর। তাই সেও অমত করে না।

নবুমামা ব্যাপার দেখে কিঞ্চিৎ তাজ্জবই হয়ে গেছে। এই উমাকে সে এর আগে দু' একবার দেখেছিল সমীরের বাসায়। ওই বাড়ির অন্যদিকে ভাড়া থাকতো ওরা। মেয়েটা তখনই আসা যাওয়া করতো। ওই বয়সে অমন অল্প-স্বল্প রং ধরাই স্বাভাবিক। তারপর চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়ে যায়।

কিন্তু তা তো হয়ই নি। বরং দেখাশোনার পর ওদের রং যেন আরও জমেই উঠেছে। সমীরও মাসীমাকে পেয়ে খুব খুশী।

নবুমামা তখন বাইরের মানুষ। ওদের কথাই শুরু হয়—আর থামে না। নবুমামা অবশ্য পেটভরেই জলযোগ করে।

বাসুদেববাবু শুধোন—মেয়ে পছন্দ হয়েছে?

নবুমামা ঘড়েল ব্যক্তি। সে এসেই ব্যাপারটা দেখে বুঝেছে এখানে আর ডাল গলবে না। না হলে তার মতলবই ছিল এটা ওটা বলে নাহয় গিয়ে জানাবে ইত্যাদি বলে কাটিয়ে দেবে।

এখন হাওয়া উল্‌টো দিকে বইছে এটা বোঝার মত এলেম তার আছে।

নবু তাই বলে—নাহঃ কন্যা সুন্দরী—লজ্জাশীলা—সুলক্ষণাই।

—তাহলে পাঁজি তো রয়েছেই, শুভদিন ধার্য করি? অবশ্য যদি অনুমতি দেন।

নবু এবার শেষ মোচড়টা মারার চেষ্টা করে।

—মানে দেনাপাওনাদির ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনার ছিল। কি বাবাজী—

এবার সমীর বলে—ওসব কোন কথার দরকার নাই মামা। পণ দেবার মত পাত্র আমি নই। সুতরাং দেনাপাওনার কথা থাক।

নবু অবশেষে হাল ছেড়ে দেয়।—তুমি যহন কইছ তহন থাউক। তয় বেইমশায় মাতুল বিদায়—নমস্কারী ইত্যাদি কিন্তু দিতি হইব। সমীর কইতে পারছে না—বড় লাজুক কিনা? গয়দের শাড়ী নমস্কারী চাই। নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নিতে চায় নবু।

বাসুদেববাবু বলেন—তার জন্য ভাবতে হবে না।

শুভদিন ধার্য হয়ে গেল সমীরের বিয়ের।

হরিবাবু সব শুনে বলে—তাহলে সমীর সংসারী হতে চললো?

নবু সেই খবরই এনেছে।

নবু বলে—একেবারে ফিট হয়েই ছিল, আমি কি করুম হরিবাবু। তয় ওর শ্বশুর কিন্তু ওই গোবিন্দবাবুর বন্ধু। আমাদের ব্যবসার সব খবরই জানে গোবিন্দবাবু। অর্ডারও পাইয়ে দেয়।

—তাহলে তো ভালোই হলো। আরও অর্ডার পাওয়া যাবে।

হরিবাবুর কথায় নবু বলে—যদি ওই শ্বশুর ওই সমীরের ব্যবসাপত্র দেখতি শুরু করেন। সমীর তো বাইরেই থাকে, কেরলেও কারখানা করার মতলব আছে। ওখানেই বেশীর ভাগ সময় থাকবো। শ্বশুর যদি নাক গলায় সব জাইনা ফেলব না ? অর শ্বশুর ঘড়েল ব্যক্তি।

হরিবাবুর এবার খেয়াল হয়। হরিবাবু নবু দত্তকে দিয়ে কারখানার বেশ কিছু লাভ—মায় কাঁচামাল নিয়মিত সরায়। অবশ্য নবুকেও ভাগ দিতে হয় কিঞ্চিৎ। সমীর কাজ, প্রোডাকশন, কাঁচামালের যোগান, ইদানীং কেরলের কারখানা নিয়ে ব্যস্ত।

তার ভিতরের খবর জানার সময় নাই। কিন্তু আর কেউ এলে জেনে ফেলবে। প্রচুর টাকা সরে গেছে। কাঁচামালের অর্ধেকই এরা সমীরের আগেকার কাউল সাহেবের কারখানায় দেয় আর সে টাকা নিজেরাই সরায়।

হরিবাবু বলে—তাহলে কি করা যায় ?

নবুবাবু বলে—বিহা তো হউক। বাসুদেববাবু ওরে কারখানার মালিক ভাইবা বিহা দিছে, মাইয়াটাও দেহি সমীরের চেনা। লভটভও আছিল। বিহা হউক তারপর ব্যবস্থা করা যাইব।

সমীর এসবের কোন খবরই জানে না। উমা ফিরে এসেছে তার জীবনে। এতদিন ছন্নছাড়ার মতই ঘুরেছে সে। এবার মন চায় একজনকে ভালোবেসে ঘর বাঁধতে। তাই সে কারখানার কাছাকাছি একটা বাসার সন্ধান করে।

ন্যাপা খবরটা পেয়ে ছুটে আসে জিপ নিয়ে। ন্যাপা এখন তার লোহার কারখানা ভালোই চালু করেছে। আর এই অঞ্চলে এখন তার দলেরই নাম ডাক বাড়িয়েছে। লোকের বিপদ আপদে তাকে পাশে দাঁড়াতে দেখা যায়। কারখানার কর্মচারীরাও খুশি। অবশ্য কাজে ফাঁকি দিলে ন্যাপা বাপবাপান্ত করে—চড় ঘুঁষিও চালায়, আবার মাইনে বোনাসও ঠিক মত দেয়। লাভ করলে জোর খাওয়ায় স্টাফদের।

ন্যাপা সমীরের বিয়ের খবর শুনে ছুটে আসে।—আয় ব্যস। গুরু, বিয়ে করছো ! তাহলে কচ্চিভোর খাওয়া হবে। বিয়েতে কোন আয়োজনের কমতি হলে চলবে না। ন্যাপা মরে যায় নি গুরু।

ন্যাপা চেপে বসে। চাও আসে। সমীর তার নিঃস্ব জীবনে এই একটি তরুণকে পেয়েছে পরমবন্ধু হিসাবে। জীবনের চরম দুর্দিনে এ পাশে এসেছিল। তাকে লড়াই করতে শিখিয়েছিল। বলতে গেলে সে ন্যাপার গুরু নয়—ন্যাপাই তার গুরু।

ন্যাপা বলে—দাদা বৌদিদের বলবে কিন্তু।

সমীর কথাটা ভাবে নি। ন্যাপার কথায় বলে—তুই বলছিস ?

ন্যাপা বলে—আমি ন্যাড়া তাল গাছ, ডালপালা নাই। সড়ক ছাপ। তুমি তো তা নও গুরু। দাদা বৌদিরা আছে। সমাজে নামডাকও আছে

তাদের। সামাজিক কাজে তাদের ডাকতে হবে বৈকি।

সমীর ভাবছে কথাটা। বলে—আজ মা নাইরে। মাকে তো পেলাম না। কোথায় হারিয়ে গেলেন চিরকালের জন্য।

ন্যাপা বলে—তিনি যেখানেই থাকবেন তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। অন্যায় তো কিছু করোনি। তবে গুরু, জিন্দেগীর লড়াই এখনও থামেনি তোমার! তোমাকে আরও উপরে উঠতে হবে। দ্যাখো বৌদির ভাগ্যের জোরে তোমার নসীবটা ফেরে কিনা।

সমীর বলে—বৌদি তো আসবে। তা আসবে কোথায়? সস্তায় একটা বাড়িফাড়ি দ্যাখ এদিকেই।

ন্যাপা বলে—এই কথা।

কি ভেবে বলে—আপাততঃ একটা বাড়ি হবে গুরু। পাকা দেওয়াল টিনের চাল। দুখানা ঘর বাথরুম পায়খানা সবই আছে। ভাড়া—ধরো ব্যাটাকে বলে শতখানেক টাকাতেই রাজী করাবো।

—কোথায়?

—চলো না দেখেই আসবে। খুব দূরে তো নয়, একটু ওদিকে।

এদিকে এখনও অনেক পাকা বাড়ি ওঠেনি। এখনও ডোবা পুকুর রয়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু জমিতে কিছু ঘরবাড়ি। তাদের অধিকাংশই আধপাকা গোছের। তবে এখনও ফাঁকা কিছু আছে।

একটা মাঠের ওদিকে কয়েকটা বাড়ি। পাকা দেওয়াল—টিনের চাল। তবে বেশ আলো বাতাস আছে।

ওদের কারখানা থেকে বেশী দূরেও নয়। বাড়ি থেকে একটা রাস্তা এসে বড় রাস্তায় উঠেছে। সেখানে দোকান বাজার কিছু বসে।

জায়গাটা ন্যাপারই এলাকা। বাড়িওয়ালাকে তাই সেলামী দিতে হয় না। তিন মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়িটাই নিল সমীর।

বাড়িওয়ালাকে চুনকাম করাবার আলাদা খরচা দিতে বাড়িওয়ালা বলে—আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই সব করিয়ে দেব।

উমা এসেছে তার নতুন সংসারে। সমীর ঘর বেঁধেছে। বিয়েতে বড়দাদা বৌদি রঞ্জনাও এসেছিল। প্রবীর একবার এসে ঘুরে গেছেল। তার নাকি কি জরুরী কাজ আছে। এসেছিল ছোটদা অধীর মায়া ও তাদের দুই মেয়েকে নিয়ে।

এতদিন পর তারা দেখছে সমীরকে। অবশ্য সমীরের ভাড়া বাড়িটা দেখে তারা খুশীই হয়। মনে মনে রীনা ভাবে তাদের মত বাড়ি করতে পারেনি সমীর। একটা আধ পাকা বাড়ি—টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরেই রয়েছে। অবশ্য বাসুদেববাবু পণ না দিলেও তার মেয়েকে খাট, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, সোফা এসবই দিয়েছেন আর অলঙ্কারও কম দেননি।

উমা এমনিতে সুন্দরী, শ্রীময়ী। তার মুখে একটা লক্ষ্মীশ্রী আছে। বেনারসী শাড়িতে তাকে যেন লক্ষ্মীপ্রতিমার মতই দেখায়।

রঞ্জনা বলে—মা, কাকীমাকে একেবারে লক্ষ্মীর মত লাগছে!

রীনা চাপা স্বরে বলে—লক্ষ্মী। আর এত প্রশংসায় কাজ নাই। কেমন লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়েছে পরে বুঝবে।

মায়াও দেখছে উমাকে। সেই সমীর যাকে তারা ফেলে চলে এসেছিল, সংসারের যে ছিল অন্নদাস, বোঝা, সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, বিয়ে করেছে।

বড়দা সুবীরও এসেছে। আজ সমীরের অবস্থা কিছুটা বদলেছে। জানে কঠিন পরিশ্রম করে এটুকু করেছে সমীর। সুবীরবাবুর ভয় হয় এবার ভাই তাকে না টেক্কা দেয়। ওই ভাইকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ সে দাঁড়াতে চলেছে—সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, কিন্তু সুবীর তার ছেলেকেই বিশ্বাস করতে পারে না। বহু টাকা সে জলে দিয়েছে, এখনও তেমনি বেপরোয়া খরচে আর উদ্ধতই রয়ে গেছে।

তাকে টাকা না দিলে রীনাই ছেলের হয়ে ঝগড়া করে। এভাবে টাকা দিতে দিতে একটা দোকান গেছে, বড়বাজারের দোকানও প্রায় যেতে বসেছে দেনার দায়ে।

প্রবীর ব্যবসা করল না, ব্যবসাকে ডুবিয়ে দিল। সুবীর ভাবে রঞ্জনার বিয়ে দেবে কি করে।

এই আনন্দের দিনে তারা আসে নিমন্ত্রিতের মত, চলে যায় খেয়ে দেয়ে লৌকিকতা সেরে।

উমা সবই দেখে। এমনিতে সে খুবই বুদ্ধিমতী। কথা কম বলে—দেখে সব। সে শুনেছে বড়দির মন্তব্যগুলো। তার স্বামীর কাছে ওদের নির্মম ব্যবহারের কথা শুনেছে। আজ দেখেছে তাদের। উমা তাদের চোখে উপেক্ষা আর অবহেলাটাকেও দেখেছে।

শুধু রঞ্জনাকেই ভালো লাগে তার। মেয়েটা বেশ হাসিখুশী, সহজেই সকলকে আপন করে নিতে পারে। উমাকেও আপন করে নেয়। কলেজে পড়ছে।

উমা বলে—বাড়ি তো চিনে গেলে, এসো কিন্তু।

রঞ্জনা বলে—আসবো কাকীমা।

সমীরের বিয়ে উপলক্ষ্যে বিশ্বাম্পাও এসেছে কেরালা থেকে। এখন সমীরের কাছের মানুষ সে। এনেছে দক্ষিণের দামী শাড়ি। ন্যাপা তো সর্বঘটে কাঁঠালী কলা। নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন—তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা সব সেইই করছে। তার সঙ্গে বিশ্বাম্পারও এর মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। আড়ালে দুজনে দুচার পেগ গিলেছেও।

উৎসব শেষ হয়। অতিথিরা চলে গেছে। রাত নামে। বাইরের প্যাণ্ডেল জনহীন—সানাই-এর সুর থেমেছে।

আজ উমা আর সমীর এখন দুজনে একা। সমীর তার আগেকার আনা সেই কাঞ্জিভরম শাড়িটা বের করে।

—এটা।

উমার প্রশ্নে বলে—এটা সেদিন এনেছিলাম তোমার জন্যই, এসে দেখি তোমরা চলে গেছো। শাড়িটা রয়ে গেছল—আজ তোমাকে দিলাম। উমা, জীবনের লড়াই-এ পাশে আজ তোমায় পেয়েছি—একা লড়াই করে আজ ক্লান্ত।

উমা বলে—আমি তোমার পাশেই থাকবো। সুখ দুঃখে আজ আমরাই দুজনে সঙ্গী।

রাত নামে। তারাকিনী রাত্রি।

সমীর বলে—আজ বার বার মায়ের কথাই মনে পড়ে। মা চলে গেল। আজ থাকলে কত খুশী হতো। তুমি তো তাকে দেখতেই পেলে না।

—মায়ের ছবি নাই ?

ম্লান হাসি হাসে সমীর। বলে—সংসারে দাসীবাঁদীগিরি করতে যার জন্ম, ছেলেদের কাছে যে শুধুমাত্র বোঝাই, তার আবার ছবি কে তুলে রাখবে উমা। আমার মনেই সেই ছবিটা রয়ে গেছে মাত্র।

উমা বলে—তবু যেখানেই থাকুন—আজ আমাদের তিনি নিশ্চয়ই আশীর্বাদ করবেন।

দমকা হাওয়া বয়—রাতের গরমের মাঝে ওই হাওয়াটুকু যেন কি প্রশান্তি আনে, মনে হয় ওটুকুই বোধহয় মায়ের হাতের শীতল স্পর্শ।

এবার সমীরের দায়িত্ব বেড়েছে। আর সে একা নয়। এবার ব্যবসাতে আরও মন দিতে হবে—নতুন করে ব্যবসাপত্র বাড়াতে হবে। কেরালায় কারখানা গড়তে হবে সমীরকে।

বিশ্বাম্পার হিসাবে খুবই মাথা। ব্যবসাও বোঝে। সমীর দেখে অফিসের হিসাবনিকাশ, খাতাপত্র সব এলোমেলো হয়ে আছে। হরিবাবু কারখানায় এসে কিছুক্ষণ বসে চলে যায়, নবুমামাই অফিসের কাজ দেখে।

সমীর বলে—খাতাপত্র, হিসাব-নিকেশ এখন সব বাকী।

নবু বলে—লোকজন নাই। একা মানুষ—আর কেরানীবাবুদেরও নানা কাজের চাপ অনেক বেশী।

সমীর বলে—বিশ্বাম্পা ক'দিন আছে. ওইই খাতাপত্র ঠিক করে দেবে।

সমীর ওকেই অফিসে বসিয়ে দেয়। নিজেও কারখানাতে থাকে। দেখা-শোনা করে।

নবুমামা এবার প্রমাদ গণে। সে এর মধ্যে হরিবাবুকেও খবরটা দেয়—সমীর তার লোকজন নে হিসাবনিকেশ দেখত্যাছে।

হরিবাবু ক'বছরে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে নানাভাবে। নবুমামাও কিছু মেরেছে। এত দিন ধরে দুজনেই কারখানার সিংহভাগ লুটেছে।

হরিবাবু বলে—তাহলে তো মুস্কিল হে।

নবু বলে—আপনার চেয়ে বিপদ আমারই হইব। আমিই সবকিছুতে সই করছি, আপনি তো ধরাছোঁয়ার বাইরে—

হরিবাবু বলে—থামবার চেষ্টা করো। ততদিনে একটা মতলব বের করা যাবে।

নবু দত্ত এমনিতে অনেক কৌশলী লোক। সে প্রকাশ্য সংগ্রামে না গিয়ে এবার সমীরের বাড়িতে এক সকালে এসে হাজির হয়। চোখ মুখ উস্কোখুস্কো।

উমা ওকে বসতে বলে, চাও দেয়।

নবুমামা বলে—সমীরকে ডেকে দাও বৌমা। গত রাতে—

সমীরও এসে পড়ে। নবু দত্ত তখন গত রাতের দেখা সেই বিচিত্র স্বপ্নটার কথাই বলে—বুঝলে বাবাজী, স্বচক্ষে দ্যাখছি, দ্যাখো এহনও গায়ে কাঁটা দিতাছে। দিদি—তোমার মারে দেখলাম।

সমীর শোনে ওর কথা। নবু দত্ত বলে—দিদি কইছে বারো বছর পার হইছে, শাস্ত্রে কয় ইয়ার পরই নিরুদ্দেশ ব্যক্তিরেও মৃত কইয়া তার পিণ্ডদান করতি হয়। আমার পোলারা আমারে জ্যান্তেও খাতি দেয় নি, মরণের পর কি পিণ্ডদানও করবে না ওরা? এই আমার সন্তান! অতৃপ্ত আত্মা হই ঘুরতি হইব? ওগোর ক' নবু—

উমার চোখে জল নামে। স্তব্ধ সমীর। মায়ের ছবিটা আজও তার চোখে ভেসে ওঠে। চলে যাবার আগে মা শেষবারের মত তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে গেছল। সে যে আর কোনদিন ফিরবে না, তাও জানায় নি।

উমা যেন সেই বিদেহী আত্মার হাহাকার শোনে। সেও আজ এ বাড়ির বৌ, সমীরের মা তারও মাতৃতুল্যই।

উমা বলে—না, মামাবাবু, আপনি পুরোহিতকে ডাকুন। তাঁর বিধানমত ও শ্রাদ্ধাদি করবে, মাতৃদায় আর কেউ না মানুক ও মানবে। মায়ের কাজ ওইই করবে।

সমীর উমার কথায় বলে—তাই হবে।

নবু পুরোহিতও ফিট করে রেখেছে। সেই বিধান দেয় দশদিন অশৌচ পালন করতে হবে, হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি। এবং তারপর প্রায় ফিট তিনেক লম্বা একটা ফর্দও ধরিয়ে দেয় মায়ের পারলৌকিক কাজের জন্য।

নবু অভয় দেয়—টাকার জন্য ভাবতি হইব না।

সমীরকে ক'দিন ওইসব ছুতোয় ঘরে আটকে রেখেছে নবু দত্ত। সেও ওদিকে ব্যস্ত।

কিন্তু বিশ্বাম্পা তার চেয়েও কাজের লোক। সে এখানের মালের হিসাব—তার বিক্রীর টাকার অঙ্ক, মাদ্রাজ থেকে তার পাঠানো মালের হিসাব। অর্ডার সাপ্লাই—পারচেজ এসব খাতাই কেরানীবাবুকে বলে বের করে তার কাজ করে চলেছে।

নবু এদিকে সমীরের মাতৃদায় থেকে উদ্ধার পাবার কাজে ব্যস্ত।

বাসুদেববাবুও আসেন। সুবীর-অধীররাও মায়ের কাজের খবর পেয়ে নিয়ম রক্ষার জন্যই এসেছে। তারা মাতৃদায় স্বীকারও করে নি। মা তাদের মন থেকে মুছে গেছে।

আজ দীর্ঘ বারোটা বছর সমীরের জীবনে অনেক উত্থান পতন এনেছে। মা যেন এতদিন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই মিশিয়েছিল। আশা করেছিল মা বেঁচে আছে। যে কোন সময়ই মা ফিরে আসবে।

কিন্তু আজ সে নিজেই স্বীকার করে নিল মা তার নেই। তার উদ্দেশ্যে আজ সে পিণ্ডদান করে, মায়ের অতৃপ্ত আত্মা শান্তি পাক।

ওঁ মধুঋতু মধু বাতা
ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মধুনক্তো চ পৃথিবীঃ
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—

আকাশ বাতাস মধুময় হোক—সিন্ধুবারি মধুক্ষরণ করুন—। পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হোক—শান্তি নামুক সর্বত্র বিশ্বচরাচরে। ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—

সমীর আজ মাকে যেন শেষ বিদায় জানায়। দুচোখে তার জল নামে। আজ—এতদিন পর সত্যই সে মাতৃহীন হল।

উমা দেখে সমীরকে। আজ যেন সে নিঃসঙ্গ। আজ উমাকে তার দরকার বেশী করে।

ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থাদিও ছিল। ওসব পালা চুকে যায়। সারাদিনের পর সমীর ক্লান্ত। উমা এক গ্লাস সরবৎ আনে।

—দিনভোর কিছু খাওনি। এটা খাও।

সমীর বলে—উপোস তখন অনেক দিয়েছি উমা। ও অভ্যাস আমার আছে। মাকেও আজ হারালাম।

উমা বলে—মা বাবা কি চিরকাল থাকেন? আমি তো ওদের থাকতেও ছেড়ে এসেছি তোমার ঘরে। তুমি এভাবে ভেঙ্গে পড়লে আমি কি করবো?

সমীর চাইল উমার দিকে। সেও আজ সমীরের সঙ্গে উপবাসী রয়েছে। সমীরও খেয়াল করে নি। এবার বলে—ভেঙ্গে পড়িনি উমা। আজ সব হারিয়ে তোমাকে পেয়েছি। এইটুকুই আমার সব। তুমি কিছুই তো খাওনি—

উমা বলে—তুমি খাও, তারপর আমি খাবো। ওঠো—রাত হয়ে এলো।

সমীর ভাবেনি যে এতদিন ধরে ওই লোকটা যাকে বস্তি থেকে তুলে এনে অন্ন দিয়েছিল সেই নবুমামা তার এতবড় সর্বনাশ করে এসেছে।

বিশ্বাম্পা এর মধ্যে নিজের কাজ করে গেছে। আর যা হিসাব সে বের করেছে তাতে দেখা যায় কয়েক লাখ টাকাই এদিক ওদিক হয়ে গেছে। ফলে ক্যাশও নাই। আর বর্তমানে কোম্পানী কোনমতে চলেছে। যে কোনো মুহূর্তেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

যেদিক থেকে যত কাঁচামাল এসেছে এখানের খাতায় তার অর্ধেকেরও এন্ট্রি নাই। খাতায় এক তৃতীয়াংশ জমা হয়েছে, তার থেকেই ফিনিশড মাল হয়েছে আর তার বিক্রীর সবটাকাও খাতায় নাই। খরচও অনেক বেশী করে দেখানো হয়েছে।

সমীর চমকে ওঠে—এখন কি হবে ?

নবু দত্ত এত করেও সর্বনাশটাকে আটকাতে পারেনি।

সমীরও সব হিসাবপত্র টেনে বের করে। আর ওই বিরাট চুরিটা ধরে ফেলেছে।

হরিবাবুও সব খবরই পায়। সেই-ই এসব করিয়েছিল নবুকে কিছু ভাগ দিয়ে। এবার হরিবাবুই নিপাট ভালো মানুষ সেজে বলে—সেকি ! নবু এসব করেছে ? ওকে বিশ্বাস করে কারখানার সব ভার দিয়েছিলাম, আর সেই-ই কিনা এতবড় সর্বনাশ করলো ? বেইমান !

নবু দত্ত চমকে ওঠে। তার বলারও কিছুই নাই। সেও কিছু পেয়েছে।

হরিবাবু গর্জায়—পুলিসে দাও ওকে।

সমীর বলে—তাতে কোনকিছুই সুবিধা হবে না। সমীর আরও বলে—এখনও কারখানা চালু রয়েছে, এরপর চলবে কি করে ?

হরিবাবু সাবধানী লোক। যা লোটার তা সে লুটেছে। আর কোন মধু এখান থেকে পাবে না। নবুকে সমীর তাড়াবেই।

হরিবাবু বলে—কারখানা তুলে দেব। জমির দাম আছে এখন, জমিও বেচে দেব। আর চোর পুষতে পারব না। ও ব্যবসাতেও আর কাজ নাই। আমাকে রেহাই দাও—

এক কথায় হরিবাবু সরে যেতে চায় এবার।

কিন্তু এই কারখানা সমীরের বিন্দু বিন্দু ঘাম রক্ত দিয়ে গড়া। এই ছিল তার স্বপ্ন। তাকে গড়ে তুলেছে। বাজারে এখন সুনামও হয়েছে তাদের মালের। দক্ষিণের কাঁচামালের ভাণ্ডার সমীরের হাতে। সে এই সময় তুলে দিবে। পিছু হঠে যেতে পারবে না। এর অপমৃত্যু তার কাছে নিজের মৃত্যুর মতই।

হরিবাবু বলে—যদি কেউ কেনে বেচে দাও তাকে এইসব। এ ব্যবসায়ে আমি আর নাই।

সমীর কি করবে ভেবে পায় না। নবু দত্ত ওই হরিবাবুর কথায় এবার ভয় পায়। খাতায় কলমে নবুই দায়ী। সেই-ই আইনতঃ তছরুপ করেছে এসব।

সমীর বলে—এইভাবে আমার সর্বনাশ করলে নবুমামা ?

নবুমামা কিছুই বলতে পারে না। তার ভয় হয় হরিবাবু হয়তো পুলিসেই খবর দেবে। পুলিসও তাকে ছাড়বে না। তাই আপাততঃ সেও কারখানায় আসা ছেড়ে দিয়েছে। গা ঢাকা দিয়ে ঘুরছে।

সমীরের সামনে অন্ধকার নেমে আসে। বার বার তার সামনে এইভাবে বিপদই এসেছে। এক-পা দুই-পা এগিয়েছে তো নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সে

আবার ছিটকে পড়েছে সেইখান থেকে। কাউল সাহেব তাকে ঠকিয়েছে, এবার এরাও।

আগে এত দায়-দায়িত্ব তার ছিল না। এখন বিয়ে করেছে। উমাও সবই শোনে। সমীর যেন ভেঙে পড়েছে।

বলে সমীর—পথের মানুষ আবার পথেই নেমে গেছি উমা। এত কষ্ট, এত চেষ্টা করে কারখানা করলাম, সব এইভাবে শেষ হয়ে গেল? এত পরিশ্রম জলে গেল আমার। এখন কি হবে? নিজের জন্য ভাবি না—তোমাকে ঘরে এনে কি সর্বনাশের মাঝে ফেললাম উমা!

উমা বলে—আমার জন্য কেন এত ভাবছো! দুজনের ভাগ্য এখন একসঙ্গে বাঁধা পড়েছে? যতই দুঃখকষ্ট আসুক তাকে সইবো। আবার সব গড়বে নতুন করে।

—কিন্তু কি করে গড়বো উমা? হাতে পয়সাও নাই। বাসা চালাবো কি করে জানি না। তুমি বাবার ওখানে যাও। আমি দক্ষিণেই যাবো। কাঁচামাল বিক্রী করেই জীবন কাটাতে হবে।

উমা বলে—যত কষ্টই হোক আমার ঘর ছেড়ে যাবো না। তুমি আবার সব করতে পারবে—

—ওই কারখানা হরিবাবু বিক্রী করলে আমি কিছু পাবো। তাই দিয়েই মালই যোগান দেব আবার।

উমা বলে—না। ওই কারখানা তুমিই কিনবে—

—টাকা!

—কারখানার ছ' আনা তোমার। পুরো দামের দশ আনা দিতে হবে। ওই বড় কোম্পানী যাদের এতদিন কাঁচামাল দিচ্ছ তাদের কিছু দিতে বলো। বাকী যেভাবে হোক যোগাড় করতে হবে।

সমীর উমার দিকে চাইল। ওর কথায় যেন আশার আলো দেখে সমীর।

এবার তার মাথা কাজ করতে থাকে। দু' তিনটে বড় বড় কোম্পানীকে সে দীর্ঘদিন ধরে কাঁচামাল যোগান দিয়ে আসছে। তাদের কাছেও প্রায় হাজার পঞ্চাশের উপর বিল বাকী।

সমীর পরদিনই যায় তাদের কাছে। ওদেব পারচেজ ম্যানেজাররাও তার পরিচিত। সমীর তাদের তার অবস্থাটা জানাতে তারা বলে—আপনার পেমেন্ট এই সপ্তাহেই করে দেব। আর অ্যাডভান্স ধরুন হাজার তিরিশ করে দিতে পারি।

সব মিলিয়ে লাখ দেড়েক প্রায় এখানেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাকী আরও টাকা চাই।

হরিবাবু কুল্যে হাজার পঁচিশ টাকা দিয়েছিল সমীরকে অতীতে। আর কারখানার জন্য পরে আরও পঞ্চাশ হাজার মোট পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়েছিল। সে টাকা আগেই ফেরৎ পেয়ে গেছে। আর নবুমামার মারফৎ এই ক' বছরে সে লাখ তিনেক টাকা বেশী পেয়েছে তার লভ্যাংশের চেয়েও।

এবারও সেই কারখানা বিক্রী করে বেশ কয়েক লাখ টাকা পেতে চায় হরিবাবু। কারখানা কেনার জন্য খরিদ্দারও এসেছে তার কাছে। তারা চার লাখ টাকা ক্যাশ দিতে চায়।

এর মধ্যে ন্যাপাও খবর পেয়ে গেছে। ন্যাপাকে উমাই খবরটা পাঠায়। উমা দেখেছে ওই একটি লোকই সমীরের প্রকৃত বন্ধু। চরম দুঃখের দিনে সেই এসেছে সমীরের জীবনে। এখনও তার পাশেই আছে।

ন্যাপা সব শুনে বলে—সমী, ওই নবুমামা, মানে তোর শকুনি মামাকে ফুটিয়ে দিই বল!

সমীর বলে—মূল তো ওই হরিবাবুই! ও তো দু' নম্বর আর ফুটিয়ে কি হবে? এখন কি করা যায় তাই বল?

ন্যাপা বলে—উমা ঠিকই বলেছে। আমার বোনের বুদ্ধি আছে রে।

ন্যাপা উমাকে বোনই বলে। উমাও চিনেছে ওই বেপরোয়া ন্যাপাকে—বাইরে ওর প্রকৃতিটা রুক্ষ। কিন্তু অন্তর ওর প্রীতিরসে ভরা।

ন্যাপা বলে—বুঝলি, মা বাবা বোন এসবের স্বাদ কখনও পাইনি। ব্যাটা ভগবান ওসব কেড়ে নিয়ে শেষে চক্ষুলজ্জার খাতিরে এই বোনটাকেই পাঠিয়েছে।

উমা তাই ন্যাপার উপরও ভরসা করতে পারে।

ন্যাপা বলে—ওই কারখানা তুই কিনে নিবি। একা তোর হবে ওটা।

সমীর স্বপ্ন দেখে কারখানাটা তারই হবে।

ওদিকে নবুমামাও বসে নাই। হরিবাবুর কথামত সেও আবার গোপনে কারখানা বিক্রীর ধান্দা করছে। এখন কারখানা তাদের চালু রয়েছে, তাদের মালের সুনাম আছে। তাই নবুমামা দুটো পার্টির সঙ্গে কথা বলেছে।

একজন চার লাখ—অন্য জন সাড়ে চার অবধি উঠেছে।

হরিবাবু তাদের বলে—টাকার অঙ্ক কিছুটা কম দেখাতে হবে।

একজন পার্টি বেশ চালাকই। সে বলে—পার্টনারকে ফাঁকি দিতে লাগবে? ঠিক হ্যায় হোয়াইট দিব তিন, এক ব্ল্যাকে।

ওটা আরও বাড়ানো যায় কিনা তাই দেখছে তারা। রফা হয় সাড়ে চার লাখেই। সেইমত একটা খসড়া ডিডও তৈরী করা হয়।

সমীরও বসে নেই। এই ক'দিনে সে এখান ওখানে ঘুরে অনুনয় বিনয় করে পার্টিদের কাছ থেকে লাখ দেড়েক টাকা যোগাড় করেছে। কিন্তু এতে হবে না। আর অন্ততঃ হাজার পঁচাত্তর চাই। দু' লাখের কমে কিছু হবে না। তারপর ফ্যাক্টরী চালাতে আরও নিদেন পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার। কোন মতেই সে টাকার যোগাড় করতে পারে না।

উমাই বলে—আমার গহনা যা আছে নাও, কারখানা বাঁচাতেই হবে।

সমীর বলে—তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি উমা, তোমার শেষ সম্বল ওই গহনাগুলো নেব?

উমা জানে ওই কারখানা সমীরের প্রাণ। সারা জীবনের সঞ্চয় পরিশ্রম দিয়ে সে ওটা গড়েছে। আজ অন্যের শয়তানিতে সে সবও যেতে বসেছে। সমীর যেন উন্মাদের মত হয়ে গেছে।

উমা বলে—কারখানা থাকলে আবার ওসব হবে। না হলে তোমার সর্বস্ব যাবে আর আমি গহনা পরে বসে তাই দেখবো? এ হতে পারে না। এসব তুমি নাও—যা টাকা পাও দ্যাখো। যেভাবে হোক কারখানা রাখতেই হবে।

ওদের সংসারে আসছে নতুন অতিথি। আজ তাতে খুশি হবার মত মানসিক অবস্থা নাই সমীর উমার, সমীরের সামনে বার বার বিপদের-দুঃখের-সব হারানোর করুণ ছায়াই ঘনিয়ে এসেছে।

সমীর বলে—কেন এই হতভাগার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়ালে উমা?

উমা বলে—তোমাদের মহাদেব তো হতদরিদ্র—উমার তার জন্য কোন দুঃখ ছিল না।

সমীর বলে—ওসব পুরাণের কথা। পুরাণের কথা আজকের সংসারেও পুরোনো হয়নি। দেখবে উমার অদৃষ্ট এত খারাপ নয়। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ন্যাপাও ভাবছে কথাটা। সে এই ব্যাপারে খুবই রেগে আছে। হরিবাবুকে সে চেনে। ওই লোকটা আগেও জয়সোয়ালকে ঠকিয়েছিল, সমীরের কমিশনও দেয়নি। তবু সমীর ওর টাকা নিয়েই ব্যবসা শুরু করেছিল। আর নবুমামাকে ও তুলে এনে বাঁচার পথ দেখিয়েছিল। আজ তারাই সমীরের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে।

উমাও এসেছে সমীরের জীবনে। এই বিপর্যয় থেকে সমীরকে উদ্ধার করতেই হবে। তারপর সে ওই হরিবাবুকেও দেখবে।

সেদিন ন্যাপা এসেছে সমীরের বাড়িতে। উমা কয়লার উনুনে আঁচ দিয়ে রাঁধছে। ন্যাপা দেখে ওদের আজ তরকারী বলতে পোস্তু চড়চড়ি আর ডাল। ব্যস—আর কিছুই নাই।

উমা মাছ খেতে ভালোবাসে। মাছ কেনা, তেল কেনার সামর্থ্যও নাই সমীরের। এখন তার কারখানার আয়ও গেছে। দিন চলাই ভার। তবু উমার মুখে অভিযোগের এতটুকু ছায়া নাই। বলে সে—ন্যাপাদা, এখানেই দুপুরে খাও। তবে আজ আমাদের নিরামিষ। ডাল আর পোস্তু চড়চড়ি—

ন্যাপা বলে—ঠিক আছে। রান্না কর। আসছি। সমীর কোথায়?

উমা বলে—সে তো টাকার জন্য পাগলের মত ঘুরছে, কি হবে জানি না দাদা। এসে পড়বে।

ন্যাপা বলে—আসুক, আমিও আসছি, ওকে থাকতে বলবি। জরুরী কথা আছে ওর সঙ্গে।

ন্যাপা ফিরে আসে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই। সমীরও ফিরেছে। ন্যাপা একটা রুই মাছ আর কিছু বাটা মাছ আনে। বলে—বেশ ভালো করে রাঁধ।

উমা দেখছে। তার চোখে জল আসে। কদিন তাদের মাছও আসেনি। কোনমতে চলছে তাদের।

ন্যাপা বলে—হাঁ করে দেখছিস কি? তোর দাদাকে তো কোন ব্যাটা পথে বসায় নি রে। অবশ্য ন্যাপাকে পথে বসালে সে ব্যাটাকে স্বর্গের টিকিট কাটিয়ে দেব। আমি সমীর নই।

এমন সময় হরিবাবুর জিপ এসে থামল বাইরে। দেখে সমীর। হরিবাবু একজন দলিল লেখককে নিয়েই নামছে।

ন্যাপার মুখটা শক্ত হয়ে ওঠে। সমীর অবশ্য হরিবাবুকে বসায়:

—কি ব্যাপার।

হরিবাবু বলে—কারখানা বিক্রীর ব্যবস্থাই করেছি। আর চালাবো না। পড়ে থাকলে দামও পড়ে যাবে। তিন লাখ টাকা দাম দিতে চায় নগদ। ভাবছি বেচে দেব। অবশ্য তোমার ছ আনার যা হিস্যা তা দিয়ে দিচ্ছি। দলিল তৈরী করে এনেছি, পার্টির নাম লিখে নিতে হবে. তুমি সইটা করে দেবে—ব্যস টাকা পেয়ে যাবে।

উমা যেন চরম মৃত্যুদণ্ড শুনছে।

সমীর বলে—কারখানা অন্য কাউকে বিক্রী করতে দেব না।

—মানে? হরিবাবু বলে ওঠে—পড়ে পড়ে নষ্ট হবে? আমার এত টাকা ঢুকেছে। এত লোকসান গেছে—এ টাকাও পাবো না? বিক্রী করতেই হবে।

এবার ন্যাপা বলে—বিক্রীই করবেন, তবে অন্য কাউকে নয়, ওই সমীরকেই।

—সমীর কিনবে কারখানা?

ন্যাপা বলে—যদি কারখানা করতে পারে—সেখানে বছরের পর বছর আপনি লুট করতে পারেন, ওকে ফাঁকি দিতে পারেন, তবে কেন ও কারখানা কিনতে পারবে না? অবশ্য আপনার টাকা আপনি পাবেন।

হরিবাবু গর্জে ওঠে—যদি না দিই?

এবার ন্যাপা তার প্যান্টের পকেট থেকে ধাতব বস্তুটা বের করে। ওটা দেখে চমকে ওঠে হরিবাবু।

—মানে। ওটা?

সমীর কি বলতে চায়। ন্যাপা বলে—চুপ করে থাকো গুরু। আমাকে কথা বলতে দাও।

—হরিবাবু, এটা ছ'ঘরা চেম্বার। এতে ছ'টা গুলি পোরা আছে। এর একটাই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। সহজে এসব বের করি না। দলিলে তিন লাখ টাকায় বিক্রী করছেন, আপনার দশ আনার টাকা আজই পাবেন এখানেই, নিয়ে ওই সমীরের নামে বিক্রী দলিল করুন। অনেক খেয়েছেন—আর নয়। ওর জিনিস ওকে ফিরিয়ে দিন। আমিও চাই না সামন্যের জন্য সাংঘাতিক কিছু হোক। সমীর দেড় লাখ তোর কাছে আছে আন—ওকে দে।

—বাকী টাকা।

হরিবাবু আর্তনাদ করে। ও চেনে ন্যাপাকে। ওকে বিশ্বাস নেই। অনায়াসে গুলি করে দিতে পারে, তাহলে জানটাই চলে যাবে বেঘোরে, টাকা ভোগ করাই হবে না।

এই কারখানা থেকে সে অনেক টাকাই লুটেছে। ধরা না পড়লে আরও লুটতো। এখন আর তা হবে না।

তাই যা পায় তাই নিয়েই সরে যেতে চায়। হরিবাবু বলে—বাকী টাকার কি হবে?

ন্যাপা বলে—কারখানা চালু হবার ছ'মাসের মধ্যে তিন কিস্তীতে বাকী টাকা সমীর শোধ করে দেবে।

হরিবাবু বলে—যদি না দেয়?

ন্যাপা বলে—ও আলাদা কাগজে লিখে দেবে আর সে টাকা দেবার দায়িত্ব রইল আমার। সেই টাকা ছ'মাসের মধ্যেই পাবেন।

হরিবাবু আমতা আমতা করে—তিন লাখ বড় কম দাম হলো?

সমীর বলে—অন্য কাউকে বিক্রীর বেলায় ওটা কম ছিল না, ন্যায্য দামই ছিল। আমার বেলায় বলছেন কম দাম?

ন্যাপা বলে—হরিবাবুর দুনম্বরী যেটা তোমাকেও ফাঁকি দিত, সেইটাই চলে গেল, না হরিবাবু? নিজের জালেই জড়িয়ে পড়লেন স্যার। যাক্ গে—খুশি মনে সই করুন। ও বেচারার দিকটাও ভাবুন স্যার।

হরিবাবু এভাবে কাজ সারতে এসে এমনি লোকসান দিয়ে কারখানা বিক্রী করতে বাধ্য হবে তা ভাবে নি। কিন্তু ন্যাপাকে চেনে সে। তাই আর কোন কথা না বলে ওই টাকা নিয়েই সই করে দেয়।

ন্যাপা বলে—তাহলে আজ শুভদিন, রেজেস্ট্রীও হয়ে যাক।

হরিবাবু মুখ বোদা করে গাড়িতে উঠলো। ন্যাপা যেন ওকে বলির পাঁঠার মতই নিয়ে চলেছে রেজেস্ট্রী অফিসে।

আজ সমীরের জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। সর্বস্ব তার বাঁধা পড়েছে, উমার গহনাও। বাজারে দেনাও করেছে। তবু আজ নিজের হাতে গড়া কারখানাকে বাঁচিয়েছে সে।

বৈকালে সমীর উমাকে ও ন্যাপার দলবলকে নিয়ে কারখানায় ঢোকে। কদিন বন্ধ ছিল কারখানা। উঠানে ঘাস আগাছা জন্মেছে। মেসিনপত্র পড়ে আছে।

লেবাররাও খবর পেয়ে এসেছে। তারাও খুশী। আজ কারখানার যেন রাহুমুক্তি ঘটেছে।

উমা পুজোর আয়োজন করে। আজ সেও স্বামীর মুখে হাসি দেখেছে। তার সর্বস্ব দিয়ে সে সমীরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

শাঁখ বাজে—আজ বরণ করে ভূমিদেবতাকে, যন্ত্রদেবতাকে উমা। তাঁরা

যেন প্রসন্ন হন। এই মাটি—এই কারখানা যেন তাদের কাছে আজ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে।

বাসুদেববাবু ব্যাপারটা কিছু জেনেছিলেন। ভেবেছিলেন উমা সমীরও আসবে তাঁর কাছে এই কঠিন বিপদে সাহায্যের জন্য।

শ্যামলীদেবীও খবরটা শুনে আতঙ্কিত হয়। বলে সে—সেকি! ওই কারখানা দেখেই উমার বিয়ে দিলাম, ওখানে কিন্তু সেই কারখানাই যদি না থাকে তাহলে ওদের কি হবে? উমার বরাতে কি শেষে এই সর্বনাশই লেখা ছিল? তুমি জেদ করে ওখানে বিয়ে দিলে, এখন মেয়েটার কি দশা হবে?

বাসুদেববাবুও ভাবনায় পড়েন। বলেন—ঠিক এমনি হবে ভাবিনি উমার মা। দেখি কি হয়।

বাসুদেববাবু নিজেই আসেন খবর নিতে। তিনিও চিন্তায় পড়েন। উমা তাঁকেও জানায়নি। সমীর না হয় জামাই, পরের ছেলে। কিন্তু উমাও কি পর হয়ে গেল যে তাকেও জানাতে সঙ্কোচ বোধ করে।

বাসুদেব এসে দেখেন উমা সেদিন খুব ব্যস্ত। বাবাকে দেখে প্রণাম করে।

— এসো বাবা।

বাসুদেব মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন। মুখে হাসির আভাই ফুটে আছে। পুজোর আয়োজন করছে। উমা বলে—এসে ভালোই করেছ বাবা।

—বাবাকে তো জানাসনি তোদের এত বড় বিপদের কথা? কারখানাই নাকি বিক্রী হয়ে যাচ্ছে?

উমা বলে—তোমার জামাইই কারখানা কিনেছে বাবা।

বাসুদেববাবু খুশি হন—সত্যি।

—হ্যাঁ। আজ পুজো দিচ্ছি। চলো তুমিও। ও ওখানেই আছে, দেখা হবে।

বাসুদেববাবুও কারখানায় এসেছেন। সমীর বলে—তোমাদের কারখানায় কিসব গোলমাল হচ্ছে শুনে এলাম।

সমীর বলে—ওসব গোলমাল মিটে গেছে বাবা। আমিই কারখানা কিনে নিলাম।

বাসুদেববাবু বলেন—শুনে নিশ্চিন্ত হলাম বাবা।

উমার দিকে চাইলেন। দেখেন উমার গায়ে গহনাও তেমন নেই। উমাও বাবার ওই চাহনির অর্থ বোঝে। সেইই বলে—বাবা কারখানার আমিও পার্টনার। গহনাগুলো বন্ধক রেখেই টাকার যোগাড় করেছি। কারখানা চললে ওসব আবার ফিরিয়ে আনবো বাবা।

বাসুদেববাবু আজ খুশী হয়েছেন। সমীরের উপর বিশ্বাস তার আছে। তাই বলেন—ও তোদের ব্যাপার মা—আমি কি বলবো। তোরা যা ভালো বুঝিস কর।

ন্যাপাই বলে—মেসোমশাই, কারখানা সমীর তো নিল। ওকে বাইরে

বাইতে ঘুরতে হবে বেশী। এখানে লেবার টেবার কাজকর্ম আমিই সামলে দেব। উমাও বসবে কারখানায়, কিন্তু জানেন তো হিসাবপত্র, মাল চালান, সেলস্ এসব কাজের জন্য লেখাপড়া জানা বিশ্বাসী লোক দরকার।

সমীর বলে—এসব কাজ নবুমামা করতো, সেই হরিবাবুর পাল্লায় পড়ে আমাদের ডুবিয়ে গেছে। এখন এ কাজের জন্য ভালো ছেলে দরকার।

ন্যাপা বলে—তোকে তো সামনের সপ্তাহেই যেতে হবে বাইরে। যতদিন লোক না পাস ততদিন মেসোমশাইই বসুন। ওঁর মত লোক থাকলে ভালোই হবে। সরকারী মহলেও জানাশোনা—

সমীর বলে—উনি যদি বসেন তাহলে তো ভালোই হয়।

উমা বলে—তাই বসো বাবা।

বাসুদেববাবু বলেন—সমীর তুমি বিশ্বাসী কাজ-জানা লোকের সন্ধান করো। আমার বয়স হয়েছে। এতদিন সরকারী চাকরির জোয়াল টেনে আর পারছি না। কোনমতে দুচার মাস সামলে দেব। কিন্তু বেশীদিন তো শক্তিতে কুলোবে না।

সমীর বলে—তাই বসুন। পরে দেখা যাবে।

এবার সমীর এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। এতদিন বাইরে গেছে তার কোন পিছু টানই ছিল না। সামান্য পয়সা পেয়েছে, টিকিট কেটে উধাও হয়েছে ভাগ্যের সন্ধানে।

এই করে সে ওই কাঁচামালের সন্ধান পেয়েছিল, দূর দক্ষিণের কোন লজে পড়ে থেকেছে, ওখানের কোন হোটেলে ওদের খাবার সেই আতপের পিণ্ড ভাত—লঙ্কা আর সবজি, সঙ্গে তেঁতুল মেশানো ডাল অর্থাৎ সম্ভরম্ খেয়েছে, সঙ্গে বড়জোর কাঁচকলা সেদ্ধ। আর ঘোলের জল।

এইভাবে মাল পাঠিয়েছে, তার বেশীর ভাগই গেছে হরিবাবু আর নবু-মামার গ্রাসে। সে খেটেই মরেছে। জীবনে ভোগবিলাসের মুখও দেখেনি।

এক একজন মানুষের ললাটলিখন বোধহয় এমনিই। তারা খেটে খেটেই সারা হয়, আর তাদের পরিশ্রমের ফায়দা লোটে অন্যরা।

এবারও সমীরকে বেরুতে হবে দক্ষিণে। মাল সাপ্লাই-এর টাকা শোধ দিতে হবে। ওদিকে হরিবাবুর কিছু দেনা এখনও রয়েছে।

নিজের সংসারের খরচা আছে। উমা মা হতে চলেছে। এ সময় সমীরের যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু উমাই বলে—দরকার পড়লে মায়ের ওখানে চলে যাবো। তুমি ভেব না। তোমার কাজে যাও।

সেই অভাব কষ্ট যেন সমীরকে তাড়া করে ফিরছে। টাকার দরকার। এখানেও কিছু টকো রেখে যেতে হবে। মাদ্রাজেও তার টাকা চাই। কারখানা থেকে নেবার উপায়ও নাই। উমার সব গহনাও বাঁধা পড়ে আছে। নিরাভরণা উমার দিকে চেয়ে বলে সমীর—খুব সুখে রেখেছি তোমায়? যা ছিল তাও কেড়ে নিয়েছি।

উমা বলে—না গো। আমার কোনো অভাবই নাই।

—কিন্তু টাকা তো চাই!

শেষ অবধি কিছু টাকা হঠাৎ এসে যায়। বিশ্বাম্পাই একটা পঁচিশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠিয়েছে। বলেছে এখানের দু' একটা কোম্পানীও তাদের মত মাল পাঠাতে শুরু করেছে। কাঁচামাল তাদের কাছ থেকেই নিতে হচ্ছে, এখানেও সাপ্লাই-এর একটা লাইন খুলেছে—এলে কথা হবে। সেই হিসাবের কিছু টাকা পাঠিয়েছে।

উমা বলে—বলিনি, ঠাকুরই আমাদের সহায়। এবার যাবার ব্যবস্থা করো।

সমীর বলে ন্যাপাকে—ন্যাপা, ও রইল। কারখানাতেও আসিস সময় পেলে।

ন্যাপা বলে—তোকে ভাবতে হবে না। তুই যা। ওদিকেও বেশ মজবুত করে শিকড় গাড়তে হবে।

উমার চোখে জল। সে জানে লোকটাকে এইভাবে ছেড়ে দিতেই হবে। প্রদীপের শিখাকে আঁচলের তলে ঢাকা যায় না। নিঃস্ব অবস্থা থেকে সে কারখানা গড়ে আবার পথের ফকিরই হয়েছিল।

তার আত্মীয়-বন্ধুরাই বার বার আঘাত দিয়েছে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে তার। তবু আবার নিঃস্বতার মাঝেও মাথা তুলেছে, আবাব জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার লড়াই-এ নেমেছে।

আবার বেশকিছু লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। হার মানে নি।

উমা মনে মনে এই মানুষটির জন্য গর্বিত। তার লড়াইয়ে সহযোগীই হবে সে। উমাও নিজেব সুখ শান্তি ত্যাগ করে ওই মানুষটিকে এগিয়ে দেবার ব্রতই নেবে।

সমীর চলে গেল কয়েকদিন পরই মাদ্রাজ মেলে তার নতুন কর্মক্ষেত্রের দিকে। উমা প্রণাম করে বিদায় দেয়—সাবধানে থেকো। আমার জন্য ভাবনা করে নিজের কাজের ক্ষতি করো না। চিঠি দিও।

বিশ্বাম্পা কলকাতার কারখানার কিছু ইতিহাস জেনে গেছল। দেখেছে সে একটা মানুষের সব পরিশ্রম কি করে তারই আত্মীয় বন্ধুরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। গোপনে তারা চোরের মত চুরিই করেছে।

সমীর ট্রেন থেকে নামতেই দেখে বিশ্বাম্পাকে।

—ওয়েলকাম বস্! চলো।

এবার স্টেশনের বাইরে এসে দেখে সমীর একটা জিপ দাঁড়িয়ে। তাতে নাম লেখা করুণাময়ী রাবার ওয়ার্কস। রেজিঃ অফিস কলকাতা। রিজিওন্যাল অফিস—কাজিকোড।

সমীর অবাক হয়। তার নতুন কোম্পানীর নাম। মায়ের নামেই ওই কারখানা করেছে সে। আর সেই নাম এখানে দেখে অবাক হয়।

বিশ্বাম্পা বলে—বস্, তোমাকে না জানিয়ে কোম্পানীর নামে ওই জিপটা

কিনেছি। পুরোনো মাল—গুড কনডিশন, সস্তায় পেলাম নিলাম। এখন কাজ বেড়েছে ওটার দরকার।

কলকাতায় তার স্বজাতি বন্ধুরা—আপনজন তাকে ঠকিয়েছে। কোম্পানীকে ঠকিয়ে নিজেরা সর্বস্ব আত্মসাৎ করেছে। এ পরদেশী হয়েও তাকে কপর্দকও ঠকায় নি, বরং কোম্পানীকে তার মতই ভালোবেসেছে।

সমীর বলে—খবু ভালো করেছো নাইডু, আমি খুব খুশী হয়েছি।

বিশ্বাম্পা তাকে শহরের বাইরে ওই ফ্যাক্টরীর ওদিকে বিশাল স্ক্রাপ ইয়ার্ডে নিয়ে আসে। ওর ওদিকে এখন নতুন বসত গড়ে উঠেছে।

সেখানেই দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে রীতিমত বোর্ড লাগিয়েছে কোম্পানীর। দু' একটা ট্রাকও রয়েছে।

ওদিকের ঘরে নেয়ারের খাটিয়া পাতা—টেবিল চেয়ারও রয়েছে এদিকের ঘরে। ওটা অফিস ঘরের মত। টাইপরাইটার, ক্যালকুলেটরও এসেছে। রীতিমত অফিস করেছে সে।

বিশ্বাম্পা বলে—লজের ভাড়াও বেঁচে যাবে বস। ওদিকের ঘরে থাকতে পারবে। বাথ-টয়লেটও আছে। আর এই কেশবন অফিসের কাজ করে, এই তোমার খাবারও বানিয়ে দেবে।

কেশবন বলে—আমি বাঙ্গালী খানা পকাতে পারি। অন্নম—ডাল—চোড়চড়ি, পোস্তা—

হেসে ফেলে সমীর—পোস্তা অবধি পেঁাছে গেছিস? ওখানেই তো আমার কাজের হাতে খড়ি রে।

কেশবন হাঁ করে চেয়ে থাকে। কালো গোলগাল চেহারা। বলে সে—মছলির ঝুল, উইথ মাস্টার্ড ভি বানাতে শিখলো।

—কোথায় শিখলি।

বিশ্বাম্পা বলে—এখানের ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বাঙ্গালী—তার বাড়িতে ওর দাদা কাজ করে, ও যেতো মাঝে মাঝে।

ওকেই আনলো। ভেরি গুডঅ বয় স্যার—হার্ড ওয়ার্কিং। কঠিন পরিশ্রম করাটা সমীরের রক্তে। তাই পরিশ্রমী লোকদের সে ভালোবাসে।

এর মধ্যে কেশবন চা করে এনেছে, সঙ্গে বিস্কুট। বলে—বাঙ্গালীরা চাই বেশী পসন্দ করে স্যার। আপনি স্নান করে নিন। খানাও রেডি। দুদিন ট্রেনে গেছে, টেক রেস্ট।

সমীরও বেশ ক্লান্ত। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। চিঠিখানা লেখে উমাকে। তারপর স্নান করতে যায়।

বিশ্বাম্পা বলে—চিঠি পোস্ট করে দিচ্ছি—আপনি খেয়ে দেয়ে রেস্ট নিন। বৈকালে কথা হবে।

অধীর-মায়া সমীরের বিয়েতে গেছল। অধীর দেখেছে সমীর নিজে ফ্যাক্টরী করেছে। মনে হয় ভালোই চলছে। মায়ার সেটা মোটেই ভালো লাগেনি।

ওইদিন রীনাও এসেছিল। অনেকদিন পর দুই জায়ের দেখা হয়। দুজনেই যেন ঠিক খুশী নয়। সমীর ছিল তাদেরই দয়ার প্রত্যাশী। ছেলেটাকে তারা এঁটো পাতার মত আঁস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছিল, শাশুড়ীকেও দেখে নি। যে যার নিজেদের সংসার ভবিষ্যৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

সেই এঁটো পাতার মত বাতিল ছেলেটা আজ খবরের কাগজের আলোচনার পাত্র, এই এলাকায় নিজের কারখানা করেছে। এবার বিয়ে থা করে সংসারী হতে চলেছে, তাদের এসবে কোন ভূমিকাই নাই। সমীর সব নিজেই করেছে।

মায়া বলে—তাহলে সমীর এখন সমীরবাবু, পেটে কালির আঁচড় নাই শিল্পপতি হতে চলেছে?

রীনা বলে—তাইতো দেখছি মায়া। তোর ভাসুর বলে—আমাদের প্রবীরও বড়বাজারের নামী বিজনেসম্যান হবে। এসব কারখানার মিস্ত্রী হয়ে লাভ কি।

মায়া বলে—তা সত্যি। ও বলে কি জানো দিদি—ভাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়।

রীনা বলে—অধীর কতবড় মানী লোক! তাই বলি প্রবীরকে—বাবা কাকার নাম বজায় রাখবি বাবা। প্রবীরও তাই তো এসেই চলে গেল। বলে ন্যাস্টি পরিবেশ।

মায়াও নাক সেঁটকায়।

উমা নতুন বৌ হয়ে এসেছে। এর আগে সমীরের মুখেই তার নিজের পরিবারের কাহিনী সব শুনেছে। আজও শোনে ওদের আলোচনা। মনে হয় সমীর সত্যিই পরম দুর্ভাগা। তার জন্য সমবেদনাই বোধ করে উমা। সে সমীরকে ওদের ওই আঘাত অপমান থেকে আড়াল করেই রাখবে।

তাই উমাও পারতপক্ষে ওদের ওখানে যায় না। অবশ্য সময়ও পায় নি। একটার পর একটা ঝড়ই এসেছে। দুজনে সেই ঝড়ে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

এবার পায়ের তলে কিছুটা মাটি পেয়েছে। কারখানা ঠিক মতই চলছে। সমীর কাজিকোড থেকে চিঠি দিয়েছে, সেখানে কোম্পানীর অবস্থা ভালোই। সেখানে তারা নিজের কারখানা করছে তাই ব্যস্ত।

সেদিন উমা কি কাজে বালিগঞ্জে গেছে, ওই পথে সে গেছে মায়াদের বাড়িতে।

অধীরও সেদিন ভাইয়ের কারখানা দেখেছে। সে ভেবেছিল অমনি একটা কারখানার মালিক হবে সে, কিন্তু পারে নি।

হঠাৎ সমীরের কারখানা বিক্রী হয়ে যাবার খবরটা তার চ্যালারাই অধীরকে শোনায়। সমীরের পার্টনার নাকি সমীরকে পথেই বসিয়েছে। কারখানা আর নাই।

অধীর মায়াকে সেই খবর দিতে মায়া বলে—তখনই বলেছিলাম ওসব ফুটানি দুদিনের, দেখবে সব ফাঁক হয়ে যাবে। আরে গোমুখ্যু চালাবে

কারখানা ? তা ওটা দ্যাখোনা যদি কিনতে পারো। কালোটাকাগুলোকে কাজে লাগাও। বেনামীতেই কেনো ওটা।

অধীর বলে—কে নাকি কিনেছে।

—তাহলে তোমার ভাই বৌটাকে পথেই বসালো। বেচারা!

অধীর বলে—যেতে দাও ওদের কথা! দ্যাখো আবার ঘাড়ে যেন না চাপে এসে।

মায়াও এ বিষয়ে খুবই সজাগ। সে বলে—ক্ষেপেছো ? ভাই ভাইয়ের বৌ ওসব দূরেই থাকুক।

তাই হঠাৎ সেদিন উমাকে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়। মনে পড়ে স্বামীর কথাটা। কে জানে কি মতলবে এসেছে মেয়েটা ?

মায়াও তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। বলে—এসো উমা! সব খবর ভালো ?

উমা বলে—ভালোই।

—সমীর এলো না ?

—সে তো এখানে নেই। এদিকে এসেছিলাম ভাবলাম দেখা করে যাই।

মায়া ড্রেসিং টেবিলের সামনে ঠোঁটে পালিশ লাগাতে লাগাতে বলে—খবর না দিয়ে এলে ? তোমাদের তো ফোনটোনও নাই, আমার স্কুলের ফ্যাংশন—বেরুতে হবে। দুদণ্ড বসে কথা কইব তার সময়ও নাই।

উমাও বুঝেছে ওর অভ্যর্থনার বহর। বলে—চলি।

মায়া বলে—শুনলাম কারখানা বিক্রী হয়ে গেছে। এখন সমীর কি করছে ? বুঝলে শুনে খুবই দুঃখ পেলাম ভাই। এত কষ্ট করে করা কারখানা চলে গেল ? এসো একদিন—

উমা বলে—কারখানাটা আমরাই কিনেছি দিদি। ও কাজিকোডেও আর একটা কারখানা করছে।

—এ্যাঁ। তাই নাকি।

এবার প্রকৃত দুঃখী দেখায় মায়াকে।

উমা খবরটা দিয়ে বের হয়ে এসে বাইরে একটা ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ে। মায়া বের হবার ভাণই করছিল উমাকে এড়াবার জন্য। এবার ওই খবর পেয়ে বসে পড়ে। দুনিয়াটাই যেন কেমন বদলে গেছে। ক্লাশ এইট অবধি বিদ্যে নিয়ে মানুষ এখন একটার পর একটা কারখানা গড়ছে আর এত লেখাপড়া শিখে অধীর এখনও দলের দাদাদের তাঁবেদারীই করে চলেছে, ভোটে দাঁড়াবার টিকিটও পায়নি এত চেষ্টা করেও। মায়ার যেন দেওয়ালে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছা করে।

উমা ফিরছে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই! কারখানা হয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। এখন বাবাই বসছেন কারখানায়। সমীর লিখেছে কেরল থেকেই একটি ছেলেকে পাঠাবে। এখানের কারখানার কাজ সেই দেখবে। ছেলেটি এসে পড়বে এবার।

বাসুদেববাবু বলেন—এলে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

উমা বলে—সে কাজ করবে, তখনও তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে বাবা। আমি তো আসতে পারবো না।

উমা মা হতে চলেছে। বাসুদেববাবু বলেন—সে যা হয় হবে। তুই বেশী বেরুসনে মা। বাড়ি যা। কোথায় গেছলি ?

উমা বলে—একটু কাজে। এবার বাড়ি ফিরবো।

রঞ্জনা এবাড়ির যেন গোত্র ছাড়া। মেয়েটা শিয়ালদহের কাছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়তে এসে এদিকে মাঝে মাঝে চলে আসে।

উমা বলে—বাড়িতে বলে এসেছিস রঞ্জু ?

রঞ্জনা বলে—কাকে বলবো ? বাবা তো দোকানে, দাদা কোথায় যায় কে জানে। শুনি ইয়ার বন্ধু নে ময়দানে, রেসের মাঠে যায়। মাকে বললে মা বলবে—যাস্ নে। ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি কাকীমা। ওরা নিজেদের-টাই বোঝে আর নিজেদের হিসাব মেলাতে গিয়ে ফাঁকিতেই পড়ে বার বার। কাকুর চিঠি পেয়েছো ?

—হ্যাঁরে। ভালো আছে।

রঞ্জনা বলে—কাকীমা, পরীক্ষা হয়ে যাক—তোমাদের কারখানায় একটা চাকরিই দিও। টাইপও জানি—

—চাকরি !

হাসে রঞ্জু—জানো কাকীমা, এখন থেকেই নিজের কথা ভাবতে হবে। ও বাড়িতে আমার কথা কেউ ভাবে না। আর যা বুঝেছি তাতে ওই সুবীর-বাবুর বিজনেসের অবস্থাও ভালো নয়। ওর সুপুত্রই ওর বারোটা বাজিয়েছে। সুতরাং আমাকেও নিজের পথই দেখতে হবে কাকীমা। মা-ই এ সর্বনাশের মূলে। নিজের হিসাব মেলাতে গিয়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়েছে—শেষে সেই ফাঁকি বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে ওর উপরই।

উমা এর মধ্যে কচুরি বানায়। রঞ্জু বলে—কচুরি ! যুগ যুগ জিও কাকীমা। কচুরি আমার হট ফেভারিট। বানিয়েছোও দারুণ।

উমা বলে—মেজদির বাড়ি গেছলাম।

—এ্যাঁ ! ওখানে গেছলে ? দেখা করলো ?

উমা বলে—কোনমতে দুটো কথা হলো, কারখানা কিনেছি শুনে কেমন ঘাবড়ে গেল। ও নাকি বের হচ্ছিল—তাই চলে এলাম।

রঞ্জনা বলে—একটু পরে ফিরে গেলে দেখতে উনি বাড়িতেই রয়েছেন।

—মানে ? উমা অবাক হয়।

রঞ্জনা বলে—ও আদৌ বের হবে না। পাছে চা মিষ্টি খাওয়াতে হয় তাই ওই কৌশলে করে। আমার সঙ্গেও একদিন করেছিল। আমি দশ পনেরো মিনিট পরে গিয়ে দেখি বাড়িতেই শুয়ে আছে মেজকাকীমা। ওটা ওর একটা কৌশল। আমি ধরে ফেলেছি কাকীমা।

উমা অবাক হয়। এবার বুঝতে পারে মায়াদি তাকে এড়াবার জন্যই ওসব করেছিল।

রঞ্জনা বলে—ওরা কেউ গেলেই ভাবে কিছু চাইতে এসেছে, ওদের কিছু দিতে হবে। তাই এইভাবে সকলকেই এড়াতে চায় ওরা।

উমাকে অবশ্য সমীরও বলেছিল দাদাদের ওখানে পারতপক্ষে না যেতে। তবু উমা নিজে থেকেই গিয়েছিল। এবার বুঝেছে কেন সমীর নিষেধ করেছিল তাদের কাছে না যেতে।

সমীর এখন কেরলে খুবই ব্যস্ত। এখন ওখানের ওই টায়ার ফ্যাক্টরীগুলো সমীরের কাজে খুশী। তাদের স্ক্রাপ ক্লিয়ার করা সমস্যা আর নেই। উল্‌টে এখন সমীরের কোম্পানী ওই কোম্পানীদের একটা রয়্যালটি দিয়েই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করেছে তাদের স্ক্রাপ পরিষ্কার করে নেবার।

এখন মাদ্রাজ-কর্ণাটক-কেরলেও ছোট ছোট বেশ কিছু কারখানা গজিয়েছে, তারাও রাবার সিট তৈরী করছে। তাদের কাঁচামালও লাগে প্রচুর।

সমীরের ফার্ম তাদের ভালো দামে মাল যোগায়, ফলে সমীরের এখন ওদেশেই বিরাট ব্যবসা চালু হয়েছে। এখন সেখানে বড় অফিস—পরিবহন ব্যবস্থা ছাড়াও নিজেদের শ্রমিকও রাখতে হয়েছে প্রচুর। এছাড়া কলকাতার কারখানাতেও মাল পাঠাতে হচ্ছে।

ক'বছরেই করুণাময়ী রাবার ওয়ার্কস্ এখন খুব নামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এবার সমীরের সংসারও বেড়েছে। এসেছে দুটি সন্তান। কিন্তু সমীর কলকাতায় বেশীদিন থাকতে পারে না।

উমাকেই সংসার দেখতে হয়। উমা দুটি ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে নিজে কারখানায় যায়। সমীর থাকলে বেশীক্ষণ সেইই থাকে। উমা রিক্সা নিয়ে চলে স্কুল থেকে বাচ্চাদের আনতে।

উমা সংসার কারখানা নিয়ে ব্যস্ত।

সমীর বলে—তোমার খাটুনিই দেখি ডবল। আমি শুধু কারখানা ব্যবসার কথাই ভাবি, তোমাকে তো দুদিক সামলাতে হয়।

উমা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এখন বাড়িতে কাজের একটি মেয়েকে রেখেছে। লক্ষ্মীই ঘরসংসারের কাজ দেখে। তবে সেই বাড়িতেই এখনও রয়েছে তারা।

এখন সমীর কিছুটা সামলে নিয়েছে। তাদের কেরালার কারখানাও চালু হয়েছে, তবে ওটাকে আরও বড় করতে হবে। সেখানে ফ্রেস রবারের কাজই হবে। তার জন্য সমীর ওদিকের পাহাড় বনে কোন রবার বাগান লীজ নিতে চেষ্টা করছে। যাতে নিজেরাই কিছু ভালো মানের রাবার তৈরী করতে পারে।

এসব কাজের জন্যই সমীরকে বেশীর ভাগ সময় বাইরেই থাকতে হয়। উমাই ওই বাড়িতেই থাকে। সেই ইটের গাঁথনি দেওয়া পাঁচিল, টিনের ছাউনির ঘর। দুপুরে গরমের দিনে টেকা যায় না। ছেলেরাও হাঁপিয়ে ওঠে অসহ্য গরমে। শীতের দিনে তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা।

সমীর বলে—অন্য একটা ভালো বাড়ি দেখি উমা। ছেলেরা বড় হচ্ছে; এখন একটু ভালো ঘরেই থাকতে পারো।

উমা বলে—এখানে বেশ তো আছি। ন্যাপাদাও দেখাশোনা করতে পারে। কারখানাও কাছে। আর বাড়ি যদি ছাড়তেই হয়, এখান থেকে নিজেদের বাড়িতেই যাবো। ভাড়া বাড়িতে কেন?

সমীর চাইল উমার দিকে। নিজে সে উদযাস্ত কেন রাতেও দীপু-নীপুকে পড়ায়। ছেলেদের উপর নজর রাখে। কঠিন পরিশ্রম করে। কিন্তু কোন দাবীই তার নেই।

যেদিন অভাব ছিল খুবই, কারখানারও টালমাটাল অবস্থা, দেনায় ডুবে আসে সমীর।

উমা মুখ বুজে নিজেই সব কাজ করেছে। ভালো শাড়িও নাই, সাধারণ তাঁতের শাড়িতেই সে খুশী। বলে—দেনা শোধ করো। ছেলেদের মানুষ করতে হবে। তারপর ওরা দাঁড়ালে নাহয় ভালো শাড়ি গহনা তখন জোটে পরবো। এখন ওসবের দরকার নাই।

পয়সা নাই। ছেলেদের দুধও জোটেনি। উমা তবু বাবার কাছে হাত পাতে নি। ন্যাপাদাকেও জানতে দেয়নি তার অভাবের কথা। সমীর তখন বাইরে।

এসবই জেনেছে সমীর। দীপু-নীপু এখন স্কুলে পড়ছে। পড়াশোনায় ওরা ভালোই। সমীর এসেছে কয়েকদিনের জন্য। কেরালায় সে বাগানের সন্ধান পেয়েছে, এখানে তাদের হেড অফিস। তাই এসেছে এখানে কথা বলে সবকিছু ফাইন্যাল করতে।

উমা সমীর এলে খুশিতে ভরে ওঠে। তার জীবনে স্বামী সাহচর্য পাওয়া যেন একটা স্বপ্নই। বলে উমা—কতদিন এই উত্তর দক্ষিণে পাড়ি চলবে?

সমীর বলে—একটু থিতু হতে দাও। ছেলেরা বড় হলে দুজন দুদিকের ব্যবসা দেখবে, তখন গেড়ে বসবো কলকাতায়। চলো না কেরালা ঘুরে আসবে। সেখানে কি করি দেখবে।

উমা স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয় নি। সে বলে—তাই চলো।

সমীর বলে—এবার গিয়ে বাগানটার দখল নিই, ওখানে থাকার আস্তানাও করতে হবে। এসেই নিয়ে যাবো তোমাদের, তখন দীপু-নীপুরও স্কুলের ছুটি থাকবে সামারে।

উমা স্বপ্ন দেখছে এবার কোন দূর দেশে যাবার!

সমীর চলে গেছে। উমার দৈনন্দিন জীবনের কাজগুলোও চলেছে।

হঠাৎ ক'দিন মেঘ মেঘ করছিল। বর্ষার শেষ দিক। বর্ষার সময় এদিকে এখনও ডোবা পুকুর ভেসে যায়, নীচু এলাকায় জল জমে।

ওরই মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। ক'দিন হঠাৎ আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামে। সঙ্গে ঝড়। দিনরাত্রি সমানে বৃষ্টি চলেছে। ক্রমশঃ ডোবা-পুকুর রাস্তা সব একাকার হয়ে স্রোত চলতে থাকে।

বৃষ্টিরও বিরাম নাই। টিনের চালে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলেছে। উমা ছেলেদের স্কুলেও পাঠায়নি। চারিদিকে জল। বাড়িগুলো ওর মধ্যে কোন-মতে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে চাল ডাল আলু আর পেঁয়াজ মাত্র সম্বল। সকালের দিকে ন্যাপাদা ওই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে কাকভেজা হয়ে ভিজতে ভিজতে আসে। জিপ-মটরবাইক অচল। হাতে ডজন দেড়েক ডিম—দুতিনটে পাঁউরুটি।

উমা বলে—এইভাবে আসে দাদা।

ন্যাপা বলে—বাজারও বসেনি। ভাবলাম খবর নে যাই তোদের।

উমা বলে—ভালোই আছি।

ন্যাপা বলে—চারিদিকে জল বাড়ছে, সারা কলকাতার জল আসছে এদিকে। এভাবে দিনরাত বৃষ্টি চললে বিপদই হবে। মনে হয় চল তোরা আমার কারখানায়—তোদের কারখানাটাও উঁচুতে। সবটা ডুববে না। ওদিকেই চল।

উমা হাসে—যত তোমার বাজে ভাবনা। বৃষ্টি থেমে যাবে। বাড়িঘর জিনিসপত্র ফেলে পালাবো? ওসব কিছুই হবে না। এত উঁচুতে জল উঠবে না।

ন্যাপা বৃষ্টির মধ্যেই চারিদিকের জলের দিকে চায়।

উমা যাবে না! বলে—তুমি বসে পড়ো, খিচুড়ি বানাই।

দীপু নীপুও জেদ করে—বসো না মামা।

ন্যাপার অনেক কাজ। এর মধ্যে এদিকের নিচু এলাকা সব ডুবে গেছে! সেখান থেকে লোকজনদের উদ্ধার করে আনছে তার দলবল। ওদিকের স্কুল বাড়িতে অনেকে এসে উঠেছে। তাদের খাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ন্যাপা বলে—এখন সময় নেই উমা! ওদিকের বহু বস্তি ডুবেছে, সেখানে ছেলেরা গেছে। আমার বসার সময় নাই। সাবধানে থাকিস। পরে খবর নেব।

ন্যাপাদা চলে যায়। উমা ছেলেদের নিয়ে একাই রয়েছে বাড়িটায়। অবিরল বৃষ্টির শব্দ চলেছে, থামার নাম নাই। কাজের মেয়েও আসেনি। কে জানে তার ঘর আছে না ডুবেছে।

সমীরও বাইরে। উমা দীপু নীপুকে নিয়ে এবার ভাবনায় পড়ে। সন্ধ্যা নামছে। বিজলি বাতিগুলোও নিভে যায়। কোথায় লাইন গেছে। সারা এলাকা ডুবে যায় অতল অন্ধকারে। স্তব্ধতার মাঝে মেঘের গর্জন আর বৃষ্টির শব্দ উমার সারা মনে এবার অজানা ভয়ই আনে।

টর্চের আলোয় দেখে উঠানেও জল ঢুকেছে। নীপু বলে—মা, জল দাওয়ায় উঠবে।

রাত্রি বাড়ছে। জল এখন ঘরের মধ্যে। খাটের উপর ছেলেদের নিয়ে বসে আছে উমা। বৃষ্টি চলেছে সমানে। যেন এক ধ্বংসের রাত্রি। মৃত্যুর হুঙ্কার জাগে মেঘগর্জনে, উমা দুটো ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

জল খাটে উঠেছে—মেজেতে প্রায় এক কোমর জল। ওই জলে কিলবিল করে একটা ভয়ার্ত সাপ মানুষের কাছ থেকে প্রাণভয়ে দূরে পালায়।

চীৎকার করে ওঠে দীপু—মা। সাপ।

হাঁড়িকুড়ি সংসার ভাসছে, দুটো ছেলেকে নিয়ে এবার উমা নিশ্চিত মৃত্যুর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে।

সমীরের মুখখানা মনে পড়ে। ঘরের মেজেতে এক কোমর জল। স্রোতে খোলা দরজা দিয়ে চালের হাঁড়িটাও ভেসে গেল। এবার ঘরের জীর্ণ গাঁথুনি ভেঙ্গে পড়বে। তারাও চাপা পড়বে—শেষ হয়ে যাবে।

হঠাৎ বাইরে টর্চের আলোর ঝলক—উমা—দীপু—

কে ডাকছে। চমকে ওঠে উমা। না স্বপ্ন নয়—ডাকছে কে। ডাকটা এগিয়ে আসে।

—ন্যাপাদা।

বৃষ্টিতে ভিজে ওরা বের হয়েছে এদিকে। ঘরের মেজেতে কোমর ছাপানো জল—দাওয়ার নিচে উমার একগলা জল। তেমনি ঠাণ্ডা কনকনে—ওরা মেছো ভেড়ির গোটা দুই ছোট নৌকা বেয়ে এসেছে এদিকে। দীপু নীপুকে তুলে নেয়, উমাকেও।

ন্যাপা বলে—বলিনি। বৃষ্টি বাড়লে বিপদ হবে।

উমা কাঁপছে হিমে। বলে—তুমি না এলে ওদেরও বাঁচাতে পারতাম না দাদা, নিজেও মরতাম।

ওই অন্ধকারে কোনমতে নৌকা ঠেলে তারা বড় রাস্তায় এসে উঠলো। ওদিকে তাদের ফ্যাক্টরীর নিচু দিকটায় জল জমলেও উপরের দিকে অফিস ঘর, ফার্নেস্ শেড তখনও জেগে আছে। ওরই মধ্যে কোনরকমে সর্বহারা অবস্থায় এসে আশ্রয় নেয় উমা।

ন্যাপাই কোথা থেকে শুকনো ধুতি শাড়ি কিছু এনে বলে—ওসব ছাড় উমা। ছেলেদেরও ওসব ছেড়ে ফেলতে বল।

উমা বলে—সব তো গেল।

ন্যাপা বলে—কাল মধ্যমগ্রামে যাবার ব্যবস্থা করে দিই।

—তাদের কি অবস্থা জানি না।

ন্যাপা বলে—তাহলে এখানেই থাকো। লাপসি খাও দিন কতক। তারপর জল নামলে দেখা যাবে। কোথায় কি হয়েছে কে জানে।

কারখানার অনেক শ্রমিকের ঘরই ডুবেছে। তারাও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে পাশের স্কুল বাড়িতে। এখানেও কিছু ঢুকেছে।

ন্যাপার দলবলই খিচুড়ির ব্যবস্থা করেছে। উমাও ভিড়ে যায় ওই সেবার কাজে। মানুষের আনন্দের দিনগুলো দেখেছে। সেখানে সাহায্যের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিপদের দিনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষের কর্তব্য। উমা নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে ওই সেবার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

ন্যাপা বলে—নাহ! তুই সত্যিই অনেক কিছুই করতে পারিস।

চারিদিকে বিপন্ন মানুষের ভিড়। এবার কর্তাদের, দেশের মাতব্বরদের টনক নড়ে। অধীরবাবুও নিভাঁজ আদ্দির পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি পরে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে এসেছে আরও দুচারজন দরদী জনসেবককে নিয়ে।

—কি অসুবিধা আপনাদের?

তিনদিন তিনরাত্রি অসংখ্য মানুষ দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে রয়েছে। ছেলেদের খাবার দুধ একফোঁটাও নাই। উমাও বের হয়ে আসে।

দেখে অধীরবাবু উমাকেও, বাচ্চাদের নিয়ে ওই শেডের ওখানে রয়েছে। জনতা গর্জে ওঠে।

—তিনদিন পর ন্যাকামি করতে এসেছেন? আমরা এদের দয়ায় দুবেলা খিচুড়ি পাচ্ছি, দুধ এক ফোঁটা নাই বাচ্চাদের। পরনের বস্ত্র নাই। দেখেও বলেন—কি অসুবিধা হচ্ছে? ন্যাকামি।

কে গর্জে ওঠে—বাচ্চাদের খাবার আমাদের দানাপানি নিয়ে এলে আসবেন, নাহলে মুখে ঢং দেখাতে এলে কাদায় চুবিয়ে বাহারের পোশাক বন্যার্ত করে তুলবো।

সকলেই গর্জে ওঠে—তাই হবে।

অধীররা অবশ্য সরকার থেকে বন্যাত্রাণের টাকা অনেক তুলেছে, এদিক ওদিকে কিঞ্চিৎ দিয়ে বাকীটা এর মধ্যে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। তাই জনতার গর্জনে পিছু হঠে।

উমাকে ও দেখেছে, তার বাচ্চাদেও। অধীর এখন ওদের চেনে না।

সমীর খবর পেয়েই প্লেনেই চলে এসেছে। উমা আর ছেলেদের ওই অবস্থা দেখে তার চোখে জল আসে। অবশ্য ন্যাপা যথেষ্ট করেছে। উমা বলে—ওই রাতে দাদা গিয়ে না পড়লে আমাদের আর ফিরে এসে দেখতেই পেতে না। বানের তোড়ে কোথায় যে ভেসে যেতাম কে জানে।

সমীর বলে—আমারই দোষ।

সমীর কদিনের মধ্যেই দেখাশোনা করে জায়গাটা পছন্দ করে। এবার সে নিজের জন্য নয়, স্ত্রী ছেলেদের কথা ভেবেই কিছু করতে চায়। অনেক কষ্ট সয়েছে সে, নিজে এখনও অনেক কষ্ট অভাব সহ্য করতে পারে।

কিন্তু তার স্ত্রী ছেলেদের সুখী করবেই। তাই কদিনের মধ্যেই দেখে-শুনে জায়গাটা পছন্দ করে। প্রায় পাঁচ কাঠা জায়গা—পিছনে দুতিনটে

নারকেল গাছও আছে। পাড়াটা বেশ ভদ্র আর উঁচুতে। কলকাতা ডুবলেও এখানে জল পৌঁছবে না। কর্পোরেশন থেকে এদিকে বড় বড় রাস্তা তৈরী হয়েছে, কাছেই সাজানো লেক, গাছগাছালিতে সবুজ।

এর মধ্যে এদিকে সুন্দর সুন্দর আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি উঠছে। ভদ্র উচ্চবিত্ত লোকদেরই পাড়া হতে চলেছে।

সমীর জেদের বশেই জায়গাটা কিনে ফেলে। এখন তার এটুকু প্রয়োজন মেটানোর মত অবস্থা হয়েছে।

জল নামতে ওরা আবার সেই পুরোনো বাড়িতেই ফিরে গেছে। বরাতজোর —বাড়িটা ভেঙ্গে পড়েনি। আশপাশের বস্তির অধিকাংশই সাফ হয়ে গেছে, পথঘাটের অবস্থাও জরাজীর্ণ। সেদিন রাতে উমা ঘুমুচ্ছে।

কোনরকমে গোছ করে সংসার আবার পেতেছে এখানে। সমীরও রয়েছে ক'দিন। রাতে হঠাৎ সেদিন ধড়মড় করে জেগে ওঠে উমা। এদিক ওদিকে উদভ্রান্তের মত চাইছে আবছা অন্ধকারে।

সমীরের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে শুধোয়—কি হলো ?

উমা তখনও চারিদিকে কি যেন সন্ধান করছে। বলে সে—কে যেন এসেছিল।

হাসে সমীর—স্বপ্ন দেখছিলে। কে আবার আসবে ?

উমা বলে—তোমার মাকে দেখলাম।

—মা। সমীর চমকে ওঠে—আমার মা !

সমীর তো মাকে মৃত বলেই মেনে নিয়েছে। তবু কেমন চমকে ওঠে।

উমা বলে—মা স্পষ্ট বললেন—আমি তোর ঘরেই ফিরে আসবো রে।

সমীর দেখছে উমাকে। বলে সমীর—কে জানে। নাও, শুয়ে পড়ো। রাত হয়েছে।

উমা শোয়। তবু বার বার তার মনে ওই কথাটাই জেগে ওঠে। মা তার ঘরে আসতে চায়। সমীরের মা বহু কষ্টই পেয়েছে। এবার কি উমা তাকে যোগ্য স্বীকৃতি দিতে পারবে।

সেদিন বৈকালে সমীর বের হয় উমা আর দীপু, নীপুকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে।

দীপু বলে—আজ আইসক্রীম খাওয়াবে তো ?

—হ্যাঁ।

উমাও শুধোয়—কোথায় যাচ্ছি ?

সমীর বলে—চলোতো। গেলেই বুঝবে।

উমা বলে—তোমার হেঁয়ালি কিছু বুঝতে পারছি না বাপু।

ট্যাক্সিটা এসে ওই পাড়ার কাছে ফাঁকা জায়গায় থামতে সমীর নামে। ছেলেরাও উমার পিছু পিছু নামে।

উমা বলে—এখানে কি হবে ?

সমীর বলে—জায়গাটা কেমন ? পাড়াটা।

উমা বলে—বেশ সুন্দর। ফাঁকা—চওড়া রাস্তা, ওদিকেই লেকের বাগান, পাড়াটাও ভালো।

সমীর নতুন পিলার দেওয়া জায়গাটা দেখায়। ন্যাপাই লোকজন দিয়ে এখানে এর মধ্যে পিলারও গেঁথে দিয়েছে।

সমীর বলে—এই তোমার জায়গা। এখানেই আমাদের বাড়ি হবে।

উমা চমকে ওঠে—কি বলছো ?

সমীর বলে—হ্যাঁ গো। পছন্দ হয়েছে জায়গাটা ?

শহরের নামীদামী এলাকায় নিজের মাটি কিনেছে, উমা ওই মাটিতে গড় হয়ে প্রণাম করে ভূমিদেবতাকে।

সমীর বলে--বড় কষ্টে রেখেছি তোমায়। বন্যাতেই শেষে হয়ে যেত সব উমা। এবার তাই নিজের একটু আশ্রয় গড়বো। এতদিন পথের মানুষ পথে পথেই ঘুরেছি। এবার তাই একটা ঠিকানা খুঁজতে চাই।

নিঃস্ব-পথের মানুষ। জীবনে যার সর্বস্ব বার বার হারিয়ে গেছে আজ উমা এসেছে তার জীবনে ঘরের বাঁধন—নতুন ঠিকানা নিয়ে।

দীপু-নীপুও খুব খুশি। শুধোয় তারা—ওই নারকেল গাছ—আমগাছ এসবও আমাদের বাবা।

—হ্যাঁ।

উমা বলে—একদিন বাড়িতে সত্যনারাণ পুজো দেব কিন্তু, তুমি চলে যাবার আগে। আবার তো বেরুবে।

সমীর বলে—তা দিও।

উমার মনে আজ পূর্ণতার স্পর্শ।

নদীর একদিক ভাঙ্গে—অন্যদিকে পলিচর গড়ে ওঠে। নদীর এই খেলার সঙ্গে জীবনের খেলারও কিছু নীতিগত মিল রয়ে গেছে।

জীবনেও একদিকে পূর্ণতার জোয়ার আসে আর ভাঙ্গনের পালাও দেখা যায়।

সুবীর এবার সেই সর্বনাশা ভাঙ্গনকেই দেখেছে। তার একটা দোকান আগেই বিক্রী হয়ে গেছে দেনার দায়ে। একদিন সে বেশ কিছু রোজগার করেছিল।

বাড়িঘর করেছে, দোকান বাড়িয়েছে। ভেবেছিল তার ছেলে প্রবীর ওই দোকান সামলাবে। কিন্তু তা হয় নি। প্রবীরের বন্ধুবান্ধবও বেশ কিছু জুটে গেছে। তাদের সঙ্গে পার্টি—রেস্তোরাঁ যায় বারে, রেসের মাঠেও যায় প্রবীর আর দোকান থেকেই সেই টাকা নিয়ে যায়।

একটা দোকান গেছে, এবার বড়বাজারের দোকানেই টান পড়েছে। সুবীরের শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। সুগার—প্রেসারও বাড়ছে নানা দুশ্চিন্তায়।

এদিকে রঞ্জনাও বড় হচ্ছে। মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতো কিছুটা। কিন্তু দু'একটা পাত্র দেখেছে। তাদের দাবী-দাওয়ার বহর শুনে চমকে ওঠে সুবীর। কয়েক লাখ টাকার ব্যাপারই।

ওদিকে দোকানেও বেরুতে পারে না। প্রবীরকেই দোকানে পাঠাতে হয়।

সেদিন সরকার মশায় এসে বলে—এক্সসাইজ ডিউটিও বাকী পড়েছে, না দিলে কেস করে দেবে। দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।

চমকে ওঠে সুবীর। এতকাল সে না খেয়েও ট্যাক্স ঠিকমত দিয়ে এসেছে। বলে সে—প্রবীরকে বললাম আগে ওটা জমা দিক।

—উনি দেননি।

—সে টাকা গেল কোথায়? তাকে দশ হাজার টাকা আলাদা দিয়েছি।

—তা তো জানি না।

সরকারমশাইকে সেও কিছু জানায় নি।

সেদিন প্রবীরের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে সুবীর। এমনিতেই তার শরীর খারাপ। রাত্রি জাগরণ—কোন উত্তেজনা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই রাত্রি দশটার মধ্যে খেয়েদেয়েই শুয়ে পড়ে সুবীর।

প্রবীর ফেরে অনেক রাতে। এ নিয়ে সুবীর বলেছে রীনাকে—এত রাত অবধি কি করে? এখন তো দোকানবাজার বন্ধ।

রীনা প্রবীরের সম্বন্ধে কোনদিনই কোন বিরূপ মন্তব্য শুনতে রাজী নয়। স্বামীর কথায় বলে সে—দিনভোর দোকানে কাজ করে দোকান বন্ধ করে বাছা একটু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগাছা করে ফেলে, তাতেও তোমার আপত্তি?

সুবীর অনুমান করে প্রবীর কোন অন্ধকারে নামছে। তাই বলে সে—তাহলে তো খুশিই হতাম। কিন্তু তোমার ছেলে যে কি করে তা তুমি জানো না। দোকান থেকে মুঠো মুঠো টাকা নে গিয়ে ফুর্তি করে।

রীনা বলে—ছেলেকে কোন দিন দেখতে পারলে না।

—ছেলেকে সামলাও।

এই নিয়েই বচসা শুরু হয়। রীনাও ছাড়ার পাত্রী নয়। সেও বেশ কড়া কড়া কথাই শোনায়। বলে—তোমার হাতে পড়ে জীবনে কোন শখ-সাধই মিটল না। চিরকাল তোমার মা-ভাইদের ঝিগিরই করে এলাম, এখন তোমার করছি।

সুবীর বলে—আমার মা তাই চলে গেছে চিরকালের জন্য, ভাইও চলে গেছে। তারা তো ক্ষতি করে নি।

—ক্ষতি করছে তোমার ছেলে? একথা বলতে পারলে?

রীনার কণ্ঠস্বরও সপ্তমে ওঠে। রঞ্জনাই এসে থামায়।

—কি দিনরাত শুরু করলে মা। পড়াশোনাও করতে দেবে না? পাড়ার লোক কি বলবে?

এই নাটকই চলে। কিন্তু রীনা প্রবীরকে একবারও নিষেধ করে না।

প্রবীর এমন উপযুক্ত মায়ের সমর্থন পেয়ে বেড়েই চলেছে।

সেইরাতে সুবীরবাবু ছেলের পথ চেয়ে বসে আছে।

রীনা বলে—শোও।

সুবীর বলে—ঘুম আসছে না। এত টাকা ট্যাক্স বাকী রেখেছে। কি সর্বনাশ যে হতে পারে তা জানো না। দোকান তো বন্ধ করে দেবে, আমাকেও জেলে পুরতে পারে। তাই এর মীমাংসা করতেই হবে।

প্রবীর ফেরে তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। পাড়া নিশুতি। রিক্সার ঘণ্টি শুনে সুবীর চাইল জানলা দিয়ে। প্রবীরকে রিক্সাওয়ালা ধরে নামায়। পা টলছে তার। ভাড়া দিয়ে প্রবীর কড়া নাড়ছে। হাঁক পাড়ে জড়িত কণ্ঠে

—দরজা খোলো। এ্যাই—

রঞ্জনা নীচে থাকে। দরজা খুলে দেখছে প্রবীরকে। প্রবীর সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়।

সামনে বাবাকে দেখে চাইল। আজ সুবীরও দেখেছে প্রবীরের ব্যাপারটা। রীনাও এসে পড়ে।

সুবীর বলে—দ্যাখো তোমার ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন গল্পগাছা করে ফিরছে দ্যাখো। তখনই বলেছিলাম—ও জাহান্নামে চলেছে। নিজেও ডুববে, আমাদেরও ডোবাবে। কথা কানে নাও নি। দ্যাখো এখন।

জড়িতকণ্ঠে প্রবীর বলে—রাত দুপুরে এত চেলাচ্ছ কেন? হোয়াই?

সুবীর দেখছে তার ছেলেকে। বলে—অন্যায় হয়ে গেছে।

নিজের ঘরে চলে যায় সে। আজ সুবীরের মনে হয় এবার সর্বনাশই না হয় তার। এযাত্রা কি করে বাঁচবে, কিভাবে সরকারী ট্যাক্স জমা দেবে তাই ভাবছে।

অধীর এতকাল এই এলাকার নেতাগিরি করে এসেছে। এবার সে ভোটে দাঁড়িয়েছে, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে টিকিট পেয়েছিল।

মায়াও স্বামীর এই ইলেকশনে দারুণ পরিশ্রম করেছে। জানে অধীর জিততে পারলে মন্ত্রী হবেই। আর একবার ঠাণ্ডা ঘরে বসতে পারলে পরবর্তী কালের জন্য মায়াদের ভাবতে হবে না। বেশ গুছিয়েই নেবে অধীর। মায়াও তার ইস্কুলের এ্যাফিলিয়েশন পেয়ে যাবে। ভোটের জন্য যা খরচা করবে তার বেশ কয়েকগুণই যে ভাবে হোক ঘরে তুলবে। তাই অধীর মায়া ভোটে খরচা করতে দ্বিধা করে নি।

আর এই সময় নবুমামা সমীরের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে ঘুরছে। প্রথমে তার আশা ছিল হরিবাবুই তাকে কোন চাকরি দেবে। কারণ হরিবাবুর হয়েই নবুমামাই ওই লুটপাট করেছিল আর লুটের বেশীর ভাগ গেছল হরিবাবুর পকেটে। নবু পেয়েছিল যৎকিঞ্চিৎ মাত্র।

নবুমামা হরিবাবুর কাছে আসে সমীরের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে। বলে—আমাকে কাজকর্ম কিছু দ্যান হরিবাবু, আপনার জন্য এত কইরা

সমীরের বারোটা বাজাইছি। আমারও চাকরির বারোটা বাজাইছি, এহন আপনে না দেখলি তো বিপদেই পড়ুম।

হরিবাবু এখন বেশ কিছু টাকা পেয়ে চুপচাপই থাকতে চায়। তার অন্য ব্যবসা—কলকাতা শহরে বেশ কিছু বাড়ি ভাড়াও আছে। সে গুলোই দেখবে এখন। নবুকে তার মধ্যে ঢোকাতে চায় না। তাই নবুর কথায় বলে হরিবাবু —তোমাকে চাকরি দিতে হবে?

—হ্যাঁ। খাইমু কি? নিজের চাকরির তো বারোটা বাজাইছি।

হরিবাবু চিনেছে নবুমামাকে। টাকার লোভে ওই লোকটা সব কিছুই করতে পারে।

বলি হরিবাবু—তোমাকে চাকরি দিলে এবার যে আমারই বারোটা বাজাবে নবুবাবু।

নবু চমকে ওঠে—কন্ কি? অন্নদাতা আপ্নে—

হাসে হরিবাবু—সমীরও তো তোমার অন্নদাতাই ছিল। টাকার লোভে যে একবার বেইমানী করতে পারে সে সবসময়ই টাকা পেলেই আবার বেইমানী করবে। সমীরকে যেমন করে পথে বসিয়েছ, আমাকেই বা তেমনি করে পথে বসাবে না তাই কে জানে।

—কি কইছেন হরিবাবু? আপনার জন্য এত করলাম—

হরিবাবু বলে—নিজেও কম মারোনি। তাই বলছি—তোমাকে চাকরি দেবার সাধ আমার নাই।

নবু হতাশ হয়। বলে—জানতাম আমিই বেইমান—তার ওপরে বেইমান আছে সেটা আজই জানলাম। তয় অনেক দেরীতে।

হাসে হরিবাবু—তাহলে চিনেছ এতদিনে। বাঃ।

নবু দত্ত হতাশ হয়েই ঘুরছে। শুনেছে সমীরই কারখানাটা কিনে চালাচ্ছে। আজ বেইমানি না করলে তার চাকরিটা তবু থাকতো।

এমনি দিনে নবু খবর পায় অধীর ভোটে দাঁড়াচ্ছে। ভোটে দাঁড়ানো মানেই কাঁচা টাকার খেলা। নবুমামা ওই ব্যাপারটার যেন গন্ধ পায়।

সে এর আগেও খবর নিয়েছে। সুবীরের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, তার বড় ছেলে প্রবীর এখন গদিতে বসছে, সুবীর অসুস্থ। নবুমামা একদিন ও বাড়িতে গিয়ে বুঝেছে এখানে আর জোয়ারের আবর্ত নেই, এখানে এসেছে ভাটার টান। এখানে আমদানীর আশাও নাই।

সুবীর বলে—এখন শুনি সমীর ভালো ব্যবসা করছে।

নবুমামা জানায় সমীর এখন বদলে গেছে। বলে—ওর কারখানা আমিই গড়লাম বুকের রক্ত দিই, এখন কয় আমিই নাকি ওর টাকা মারছি। আরে মারলি ওর কারখানা হইত? কথায় আছে—

জন জামাই ভাগ্না
তিন নয় আপ্না।

ভাগ্না মামারে চিনল না। তাই অমন বেইমানের চাকরি করুম না। ছাইড়াই

দিছি ওর চাকরি। আমার মানসম্মান নাই ? বদ্যিপুরের দত্ত বংশের সন্তান আমি।

সুবীর বলে—আমার অবস্থাও এখন ভালো নয় মামা। শুনছি অধীর ভোটে দাঁড়িয়েছে, জিতলে মন্ত্রী হবে।

নবুমামা এখন বড় গাছেই ভেলা বাঁধতে চায়। এখন নেতা, মন্ত্রীদেরই দিন। লাখ লাখ টাকা এদিক ওদিক করে তারা। নবুমামা স্বপ্ন দেখে একবার মন্ত্রীর কাছাকাছি আসতে পারলে সে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে পারবে।

নবু সব ভেবেচিন্তেই এবার অধীরের ওখানে এসেছে। অধীর খুবই ব্যস্ত। সারা এলাকায় ঘুরতে হচ্ছে। তার ছেলেদের টাকা দিয়ে লোক আনার ব্যবস্থা করাতে হচ্ছে। তারাই ভিড় করছে বিভিন্ন এলাকায় আর অধীর তাদের সামনে হাত পা নেড়ে হিটলারী ঢংয়ে নেচেকুঁদে ভাষণ দিয়ে দেশ থেকে বেকারী, গরিবী সব হঠিয়ে দিয়ে আসছে !

পোস্টার-ব্যানারও তৈরী হচ্ছে। দলের ছেলেদের টিফিনও যোগাতে হচ্ছে। এ হেন সময় নবুমামাকে আসতে দেখে চাইল।

নবুমামা একেবারে জলের জাত। যখন যে পাত্রে থাকে তার আকারই নিতে পারে। নবুমামা বলে—অধীর বাবাজী, দেখলাম সারা এলাকার মানুষের মুখে তোমারই নাম। একেবারে জয়জয়কার। আমি তো সেদিন কারখানায় সমীরকে বললাম—এবার অধীর বাবাজীই জিতছে, আর মন্ত্রীও হচ্ছে। তা শুনে সমীর জ্বলে উঠলো।

অধীর জানে সমীর ন্যাপার বন্ধু। ন্যাপা তার বিরুদ্ধদলের মাতব্বর। তার ছেলেবাই অধীরকে বাধা দিচ্ছে ওখানে মিটিং করতে।

নবুর কথায় অধীর বলে—সমীর আজকাল একটা কারখানা চালিয়ে ধরাকে সরা দেখছে।

নবুও ফোড়ন কাটে—একেবারে তাই। পয়সার গরম হইছে। নাহলি দাদা মন্ত্রী হইব শুইনা ওর মাথা গরম হই যায় ? হিংসা—আমিও কইছি অধীরকে ভোটেই জিতাইমু। রইল তর তিন টাকার চাকরি। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে অধীর। জিতাইমু ওরে।

অধীর বলে—পারবে মামা ?

নবুমামা এবার পায়ের তলে মাটি পায়। বলে সে—পারুম না ক্যান ? নবু দত্ত সবই পারে—খেল দেখাই দিমু অধীর।

মায়াও এসে পড়ে। নবুমামাকে তাদের জেতাবার জন্য এত আগ্রহী দেখে বলে অধীর—ক'দিন একটু পাশে থাকো মামা। তুমি পাশে থাকলে জোর পাই।

—থাকুম। জিতাইয়া তয় যামু।

নবুমামা এবার অধীরের ক্যাম্পেই রয়ে যায়। ছেলেদের চা-টিফিন-লাঞ্চ বাবদ, পোস্টার হ্যাণ্ডবিল—গাড়িতে করে প্রচারের খরচা বাবদও বেশ,

কিছু টাকা হাতে আসে। নবুমামা তার থেকেই বেশ টু পাইস ম্যানেজ করে।

আর বড় বড় কথা বলে আসর গরম করে। অধীর এ হেন বলিয়ে কহিয়ে মামাকে পাশে পেয়ে জেতার স্বপ্নই দেখে। মামাও বেশ মোচড় দিয়ে ভাগ্নের পকেট খালি করে চলেছে আর স্বপ্ন দেখায় ভোটে সে সুইপ করে বেরুবে। মন্ত্রীত্ব তার বাঁধা।

ভোটের ক'দিন নবুমামাও নানা খরচা বাবদ টাকা টানে। বলে—নামো বস্তির হাজার ভোটারকে পকেটে এনেছি! ওদের ইয়েটিয়ে খাওয়ানোর লাগবো। হাজার দশেক টাকা চাই—

অধীরের এখন এটা যেন জীবনমরণ সমস্যা। প্রতিপক্ষও ভোটের জন্য লড়ছে। ন্যাপার দলকে হারাতেই হবে। অধীরও মরীয়া হয়ে খরচ করছে।

টাকাও বের হচ্ছে জলের স্রোতের মত। নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এখন তলানিতে ঠেকেছে। মায়ার কিছু গহনাও বাঁধা দিয়ে ক্যামপেন করছে। আরও টাকার কথা শুনে বলে অধীর—কাজ হবে তো মামা?

নবু বলে—হবে না মানে? তলে তলে আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ওরা অনেক চাইছিল। ও দল নাকি বিশ হাজার দিতে চায়, আমি ওদের ধরে করে দশ হাজারে রফা করেছি। সলিড দশ হাজার ভোট এসে যাবে।

অধীর এবার বাড়ি বন্ধক রেখেই টাকার যোগাড় করছে। তাকে যেন নেশায় পেয়েছে। জিতবেই সে। আর জিতলে এ টাকা তার উঠে আসবে সুদ সমেত।

পোস্টারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। দুকালারের পোস্টারই ছাপিয়েছে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার, আর ভোটের দুদিন আগে তিন কালার পোস্টার ছাড়বে।

নবুমামা দেখছে তার কমিশনটা আগামই আসছে, কারণ ভোটের কাজে সব পার্টিই ক্যাশ পেমেন্ট নিতে অভ্যস্ত।

ভোটের দিন বুথ তৈরী—ভলেনটিয়ারদের যাতায়াত, খাই-খরচা ইত্যাদি নিয়েই হাজার পঞ্চাশ ক্যাশ গেছে।

নবুমামা তার থেকে আগাম সরিয়ে এবার থেমে যায়।

ভোটের ফল বেরুতে দেখা যায় অধীর হেরেছে প্রায় বিশ বাইশ হাজার ভোটের ব্যবধানে।

নবুমামাও বুক চাপড়াচ্ছে আর অধীর বুক চেপে ধরে শুয়ে পড়ে। ডাক্তার বলেন—হার্ট এ্যাটাক।

ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হলো। নবুমামা কদিনেই বেশ কিছু ম্যানেজ করে এই ভাগ্নেকে পিছনে ফেলে আবার অন্য ধান্দায় বের হয়।

অধীর এখন হাসপাতালে। মায়াও বিপদে পড়ে। টাকার দরকার। ভোটের নেশায় সেও তার বেশ কিছু গহনা বন্ধক দিয়েছে, ওদিকে পরে জানতে পারে মায়া অধীর এই বাড়িও বন্ধক রেখেছে। তারপর অসুখের খরচা আছে।

মায়ার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এতদিন কারোও কথাই ভাবেনি তারা। নিজেদের রোজগার বাড়াতে নিজেরা চলে এসেছে সংসার ছেড়ে নিজেদের সংসারে। তাদের স্বার্থপরতা, লোভ এত বেশী যে অন্যের কথা একবারও ভাবেনি।

ভেবেছে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই। মা-ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরেও চায়নি। নিজেদের লোভের বশেই তারা রাজা উজীর হবার স্বপ্নই দেখেছিল। আজ তাই ফকীর হতে চলেছে। পাশে এমন কেউই নাই যে তাদের সাহায্য করে।

অধীর-সুবীর আজ নিজেদের দোষেই এমনি এক বিপদের অন্ধকারে এসে ছিটকে পড়েছে। এই অতল অন্ধকারে আলোর সন্ধান পায় না তারা।

সুবীরকে সরকার থেকে নোটিশ ধরিয়েছে। এক্সসাইজ ট্যাক্স দশদিনের মধ্যে জমা না দিলে তার দোকান সিল করে দেওয়া হবে।

অধীরের এখন জীবনমরণ সমস্যা।

সমীর মাদ্রাজ—এর্নাকুলম-কাজিকোড এই অঞ্চলে এখন বিরাট ব্যবসা শুরু করেছে। নিজের অফিস, কারখানা করে এখন দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কারখানায় মাল সাপ্লাই করছে।

ওর ইচ্ছা এবার বোম্বাই শহরেও একটা অফিস তৈরী করবে।

সেখানেও কাজ তার অনেক। তাই ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছে। এখানের কারখানায় কাজগুলো সারতে হবে। বেশ কিছু মাল আসছে মাদ্রাজ থেকে, সেগুলো সাপ্লাই দিয়ে ফিরে যাবে।

সেদিন কারখানায় কাজ করছে, ছোটবৌদি মায়াকে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হয়।

মায়া দেখছে কর্মব্যস্ত ফ্যাক্টরীটা। ও ভাবতেই পারেনি সমীর সত্যিই এমনি একটা কারখানার মালিক হতে পারবে। ওদিকে মোল্ডিং চলছে, ঘূর্ণায়মান ডাইসে তরল রাবার পড়ছে, কুলিং প্ল্যাণ্ট থেকে রবার সিটগুলো বের হচ্ছে।

লোকজন কাজ করছে। ট্রাক বোঝাই মাল যাতায়াত করে। মায়া এগিয়ে যায়। একজনকে শুধোয়—অফিসঘর কোন দিকে?

লোকটা হ্যাণ্ডকার্ট ঠেলে কি মাল নিয়ে যাচ্ছে, মায়াকে সেইই দেখিয়ে দেয় অফিস ঘরটা।

কেরলের তরুণ রামানুজম বিশ্বাম্পার পরিচিতি নিয়ে এখানে এসেছিল মালিকের কাছে চাকরির আশায়। রবার সম্বন্ধে তার কিছু কেতাবী জ্ঞান আর হাতে কলমে অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

সে একটা নামী টায়ার কোম্পানীতে কাজ করতো। ছেলেটা সৎ, কর্মঠ। আর ওই বড় কোম্পানীতে ঢুকে সে ভেবেছিল নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে তার

পদোন্নতি হবে, সম্মানও পাবে। তাই সে সৎভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে শেখার আগ্রহ নিয়েই ওই কোম্পানীতে কাজ করতো।

দেখেছে সেখানে চুরির পথগুলোও খোলা। এনজিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট পাশ না করলে কোন মেসিনারি পার্টস কেনা হবে না, বা স্ক্রাপ হিসাবে বাতিল করে কোন যন্ত্রাংশ বিক্রীও হবে না।

কিন্তু এই বিভাগেই বিরাট এক চক্র গড়ে উঠেছে। তারা ভালো দামী যন্ত্রাংশকে বাতিল করে স্ক্রাপ হিসাবে তাদেরই পেটোয়া লোকদের বিক্রী করে দেয় আবার সেই মালই চারগুণ দামে সেই কোম্পানীর কাছ থেকেই কিনে নেয়। এইভাবে বিরাট টাকার হেরফের করে। কখনও যন্ত্রাংশ মাত্র কাগজে কলমেই বাতিল হলো, আবার কেনাও হলো। এইভাবেও হাজার হাজার টাকা এদিক ওদিক হয়ে যায়।

রামানুজম বড়কর্তাদের নজরে এটা আনতে চেয়েছিল। তাতে প্রথমে অচেনা লোকরা তাকে হুমকি দেয়, তাতেও ভয় পায় না সে। কর্তাদের নজরে আনতে কয়েকদিনের মধ্যে তাকে চুরির কেসে ফেলে স্যাক করে দিল। বেশ বুঝেছে রামানুজম ওই জাল সর্বত্র বিছানো। ছোট একটা কারখানাতেই কাজ নেয়।

তারপর বিশ্বাম্পার কথামত সে এখানেই আসে চাকরির সন্ধানে।

সমীরকে দেখে তার ভালো লাগে। নিজেই কাজ করে যে মালিক সে কাজের লোককে সম্মান দিতে জানে। রামানুজম রয়ে গেল তখন থেকেই।

আর সমীরও দেখে ছেলেটি দায়িত্ববান, সৎ, কাজ জানে, নিজেও কাজ করে। ফলে শ্রমিকদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কারখানার প্রোডাকশনও বাড়ছে।

রামানুজমই বলে—বস্ নিজেরাও কিছু প্রোডাকশন বাড়াতে চাই। সাইকেল টায়ার, টিউব করার শেডও বানাও, মেসিনারীও এদেশেই পাওয়া যাবে।

এর জন্য রামানুজম দিনরাত খেটে প্ল্যান, বাজেট এসবও করে। সমীর জানে কয়েক লাখ টাকা এখন সে ব্যাংক থেকেই পাবে অনায়াসে। আর এই প্ল্যান্ট বসাতে পারলে তার বিক্রীও বহু বেড়ে যাবে।

ওই টায়ার টিউবের ফেরিওয়ালা হয়েই সে রবার লাইনে এসেছিল, এবার সেইই ওই মাল তৈরী করবে।

রামানুজমকে বলে সমীর—ব্যাংকে কাগজপত্র জমা করে দেব দু'একদিনের মধ্যেই। কিছুদিনের জন্য কেরলে যেতে হবে। ফিরে এসে তোমার ওই সেকসনের জন্য কাজ শুরু করবো।

রামানুজমও খুশী হয়। ফ্যাক্টরীর চেহারাই বদলে যাবে তাহলে। সমীর স্বপ্ন দেখে নিজের বাগানের রবারও তৈরী হবে। ওই রবার এই মালের সঙ্গে পরিমাণ মত মিশিয়ে সে উন্নত মানের রবারই ছাড়বে বাজারে।

রামানুজম কারখানাকে বেশ ঝকঝকে করে তুলেছে। অফিস ঘরের চারি-

পাশে কিছু গাছগাছালি লাগিয়েছে, ওদিকে ওয়েটিং রুম। ওপাশে তার ও সমীরের চেম্বার, লম্বা হলে একাউণ্টস অফিস।

মায়া এসে খবর পাঠায়। সমীর ঠিক ভাবতেও পারে নি যে মায়া অর্থাৎ তার সেই দাম্ভিকা বৌদি নিজে এখানে আসবে। উমা এখন অফিসে বসছে না। তার শরীর ভালো যাচ্ছে না। মা হতে চলেছে সে।

সমীর এবার তাই রয়ে গেছে তার কাছে। উমা বলে—এ নিয়ে ভাবছো কেন? কাজ ফেলে এখানে থাকবে?

সমীর বলে—না। ক'দিন থাকতেই হবে।

উমা বাড়িতেই রয়েছে। সমীর অফিসে ওই স্লিপটা দেখে ভাবে কেউ বোধহয় কাজের জন্যই এসেছে। এখন মেয়েরাও বাধ্য হয়ে কাজ খুঁজতে বের হয়।

বেকারত্ব অভাবের জ্বালাটা বোঝে সমীর। তাই চাকরি দিতে পারুক না পারুক দেখা সে সকলের সঙ্গেই করে। ওকেও পাঠিয়ে দিতে বলে।

মায়া তার ঘরে ঢুকতে ওকে দেখে চমকে ওঠে সমীর। চেয়ার ছেড়ে ওঠে —বৌদি। তুমি?

মায়া দেখছে সমীরকে। তার অফিসটাও বেশ সাজানো। ফোনও রয়েছে। কারখানা অফিস এসব সেই ছেলেটাই করেছে যে স্কুলেও পড়তে পারে নি টাকার অভাবে। সিঁড়ির তলের অন্ধকারে পড়ে থাকতো। সংসার যাকে কিছুই দেয় নি। আজ সেই সংসারের কাছ থেকে নিজের যোগ্যতায় অনেক কিছু অর্জন করেছে।

—বসো।

মায়া আজ ওর সামনে নিজেকে ছোট বলেই মনে করে। তার বড়াই ছিল সে, তার স্বামী শিক্ষিত, সমাজের মাথাদের একজন। সারা এলাকার লোক তাদের চেনে, মানে।

কিন্তু সমীরকে দেখে মনে হয় তাদের সব হিসাবই গোলমাল হয়ে গেছে। আজ তাই তারা নিঃস্ব প্রায়। নিজেদের কামনা, দুরাশা আর লোভের জন্যই সারা এলাকার মানুষকে ঠকিয়ে নিজেদের আখের গোছাতে চেয়েছিল।

তাই সাধারণ মানুষ তাদের ধাপ্পাটাকে বুঝে ফেলে তাদের মুখের মত জবাবই দিয়েছে। একেবারে নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু সমীর যা করেছে তাতে ফাঁকি নাই। বহু দুঃখকষ্ট সয়ে জীবনে লড়াই করে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেকে গড়েছে তিলে তিলে। তার সাধনায় ফাঁকি নাই, লোভ নাই। তাই একাই নয়—এতগুলো পরিবারের অন্নও যোগাচ্ছে সে।

তার পায়ের নিচে মাটি আছে—অধীর মায়া হাওয়ায় প্রাসাদ তৈরী করার স্বপ্নই দেখেছিল। তাই এক ফুৎকারে সব তাসের ঘরের মত ডেঙ্গে পড়েছে।

সমীর শুধোয়—কি ব্যাপার বৌদি!

বেল টিপতে একজন আসে। সমীর বলে—ঠাণ্ডা কিছু আনো।

মায়ার গলা শুকিয়ে গেছল। ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে—তোমার ছোড়দা এখন হসপিটালে।

—কি হয়েছে? ভোটে দাঁড়িয়েছিল।

মায়া বলে—ওইটাই কাল হয়েছিল। নবুমামাও গিয়ে জুটে ওকে মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখিয়ে সর্বনাশ ঘটালো।

সমীর নবুমামাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তারও সর্বনাশ করেছিল ওই লোকটাই। বলে সমীর—ওখানে গিয়ে জুটলো ওই শকুনি মামা।

মায়া জানায় তাদের সর্বনাশের খবর। লোকটাকে সুস্থ করতে হবে। আজ টাকা সব গেছে ওই ভোটের পিছনে। কি করবে জানে না।

সমীর ভাবছে কথাটা। একদিন যখন অনাহারে খিদের দুঃসহ জ্বালা নিয়ে সমীর পথে পথে ঘুরেছে সেদিন ওরা তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

আজ এসেছে তারই কাছে সাহায্যের আশায়। সমীরের মনে পড়ে মায়ের কথা।—হাজার হোক তোর দাদা, যা বলে চুপচাপ শুনবি। দেখবি একদিন ওরা ভুল বুঝতে পারবেই। তুই বড় হলে তোর দরজাতেই ওদের আসতে হবে। সেদিন ওদের মত তুই ভুল করিস না সমী। তোর দরজা যেন সকলের জন্যই খোলা থাকে। ভগবান তোকে সেই সামর্থ্য দেবেন। ওদের মাথা হেঁট করে তোর কাছেই আসতে হবে।

আজ মা নেই। মায়ের সেই কথাগুলো বর্ণে বর্ণে সত্যি হতে চলেছে। আজ সমীর ওদের ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

মায়ার চোখে জল। সমীর দেখছে মানুষের দর্প-অহঙ্কার কত তুচ্ছ। সমীর বলে—এখন দশ হাজার টাকা নিয়ে যাও বৌদি। আমি আজ সন্ধ্যায় দাদাকে দেখতে যাবো তখন কথা হবে।

মায়া অবাক হয়।

—তুমি আসবে ওকে দেখতে? সত্যি!

সমীর হাসপাতালের নাম, বেডনাম্বার এসব লিখে নিয়ে বলে—হ্যাঁ বৌদি। নিশ্চয়ই যাবো। তুমি ভেব না—দাদার চিকিৎসার কোন ত্রুটিই হবে না।

মায়া বের হয়ে যায়। সমীর কি ভাবছে। ন্যাপাকে ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে দেখে চাইল। ন্যাপা বাইরে থেকে সব ব্যাপারটাই দেখেছে, শুনেছেও। ন্যাপা বলে—তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা খুবই ইজি গুরু। যারা তোমাকে উপোস আর মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে কেটে পড়েছিল তাদের জন্যও দরদ।

সমীর বলে—সংসারের দায় যে অনেক ন্যাপা।

ন্যাপা বলে—গুলি মারো এমন সংসারে। ব্যাটা ভগবান আমাকে জোর বাঁচিয়েছে, এমন সংসারের মজা পোয়াতে দেয় নি। তা কেরলে যাবে কবে? উমাকে ছেড়ে ক'দিন যেও না।

সমীর বলে—তাই থাকছি।

—গুড। ন্যাপা আজকাল ইংরাজীও বলে মাঝে মাঝে।

অধীর হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। তবু কোনমতে সুস্থ হয়ে উঠলে এবার কলেজের কাজ আর বাড়িতে টুইশানি করেই দেনা শুধবে। কিন্তু ভালো হয়ে ওঠাই এখন সমস্যা। টাকা নাই।

এমন সময় মায়াকে সমীরের সঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক হয়। সমীরের চেহারাও বদলে গেছে। এসেছে ব্যক্তিত্বের ছাপ। সেই অসহায় ক্ষুধার্ত আশ্রয়হীন ছেলেটা যাকে সেদিন দরজা থেকে বিদায় করেছিল, পরে যার কারখানা গড়তে বাধা দিয়েছিল অধীরের দল সেই সমীর আজ এসেছে তাকে দেখতে। শুধু তাইই নয়। তার চিকিৎসার সব খরচও দিচ্ছে।

—সমীর!

সমীর এসে পাশে বসে। শুধোয়—কেমন আছো ছোড়দা?

অধীর দেখেছে ওকে। আজ বলে সে—ওরে তোকে কত না কষ্ট দিয়েছি, অপমান করেছি। আজ যেদিন আমার পাশে কেউ নাই, চরম বিপদের দিনে তুই এলি আমার পাশে।

সমীর বলে—ওসব কথা থাক। সেরে ওঠো—তারপর কথা হবে। বৌদিকে বলেছি—তোমাকে চিকিৎসার ব্যাপারে ভাবতে হবে না। সেরে ওঠো।

অধীরের মনে হয় এতদিন এত লেখাপড়া শিখে জীবনের আসল পড়াটাই পড়তে ভুলে গেছল। সমীর সেই পড়াটা পড়েছে জীবনের পাঠশালায়।

সমীর বাড়ি ফিরেই দেখে উমার শরীর ভালো নাই। ছোড়দার কথাও বলা হলো না। উমাকে নিয়ে নার্সিংহোমে যেতে হয়।

খবর পেয়ে ন্যাপাও তার অযান্ত্রিক জিপ নিয়ে ছুটে আসে। বাসুদেব-বাবু, শ্যামলীও এসে পড়েন। সেই রাতেই উমার একটি মেয়ে হলো।

আর টেলিগ্রাম আসে কেরালা থেকে। বিশ্বাম্পা টেলিগ্রাম করেছে এতোদিন যে রবার বাগান নিয়ে কথা চালাচালি হচ্ছিল সেই বাগান আজই কেনা হয়েছে। প্রায় দুহাজার একরের রবার বাগানের মালিক হয়েছে সমীরের কোম্পানী।

সকাল হয়। যেন সমীরের জীবনে এক অমারাত্রির ভোরই হয়েছে। উমা ভালো আছে। ওদিকে বেবী কটে ঘুমুচ্ছে বাচ্চাটা। ফুটফুটে, একমাথা চুল—চোখ মেলে দেখছে সমীরকে।

চমকে ওঠে সমীর। ওই চোখ, ওই চাহনি যেন খুবই চেনা। বার বার মনে পড়ে মায়ের কথা।

উমাও বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে—ওকে চেনো? আমাকে ও বলেছিল—আমার ঘরেই আসবে।

সমীর দেখছে তার নতুন মাকে! আজ তার মনে হয় মা তার হারায় নি। রূপ থেকে রূপান্তরে পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। মনে হয় তার সব চেষ্টা—সব সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে।

সমীর বলে—জানো উমা, আমাদের নিজেদের রবার বাগিচা হয়েছে। এবার তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবো।

সুবীরের সামনে আর কোন পথই নাই। দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। রীনাও বুঝেছে এবার ব্যাপারটা। এই বাড়ি তার নামে—সঞ্চিত গহনাও কিছু আছে। সে বুঝে নিয়েছে এই তার শেষ সম্বল। এসব কিছুতেই সে হাতছাড়া করবে না।

সুবীর স্ত্রীকেই জানায়—তোমার গহনাই কিছু দাও, সরকারের টাকাটা জমা দিই। তারপর দোকান চললে যেভাবে হোক ওসব ফিরিয়ে আনবো।

রীনা ভেবেছিল এমনি কিছুই বলবে তার স্বামী। সেও তাই জবাবটা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। বলে রীনা—ওই আমার পুঁজি, মেয়েটার বিয়ে-থা দিতে হবে! ওসব আমি দেব না। দোকান রাখার জন্য অন্য কোথাও টাকার চেষ্টা করো।

সুবীরের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। প্রবীর ক'দিন ভোরেই বের হয়ে যায়—কখন ফেরে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

রঞ্জনা দেখেছে সব। সে বলে মাকে—বাবা কোথায় টাকা পাবে মা? ও টাকা না দিলে বাবার সর্বনাশ হবে।

রীনা বলে—তাই বলে নিজের সর্বনাশ করতে তো পারি না?

অর্থাৎ এরা নিজের কথা ছাড়া অন্যের কথা আদৌ ভাবে না। বাবারও শরীর খারাপ।

সুবীর ওই শরীর নিয়েও রিক্সায় করে দু'একজন বন্ধু, চেনাজানা লোকের বাড়ি যায় টাকার আশায়।

কিন্তু সুবীর দেখে এরা তার সম্বন্ধে, তার ছেলের সম্বন্ধে সব খবরই নিয়ে রেখেছে। সর্বনাশ যখন আসে তখন একা আসে না। চারিদিক থেকেই হতাশা, বিপদ সব ঘিরে ধরে।

টাকাও কেউ দেয় না। অনেকে এড়িয়ে যায়, কেউ দেখাও করে না। হতাশ হয়েই ফিরে আসে সুবীর।

রঞ্জনাও দেখছে ব্যাপারটা। মাকেও সে বলে পারে নি। বড়দা বলে—আমি কি করবো?

অর্থাৎ ওর কোন দায়িত্বই নাই। রঞ্জনা বলে—এতদিনের দোকান, বাবার নিজের করা দোকান চলে যাবে তুই কিছু করবি না?

প্রবীর বলে—আমি একটা চাকরির ব্যবস্থাই করছি, চাকরি পেলে চলে যাবো। বাবার ব্যাপার—বাবাই বুঝুক।

রঞ্জনা দেখে এই নির্মম মানুষগুলোকে। এরা কারোও জন্য ভাবে না। নিজের মা-ভাইকে অগ্রাহ্য অবহেলা করেছে যেদিন, সেদিনও ওই প্রবীর দেখেছিল বাবা মায়ের স্বরূপ। ঠাকুমা হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য, কাকাও পথে বের হয়ে গেল ওদের নিষ্ঠুর অবজ্ঞায়।

সেদিন মা-দাদা দেখেছে অবজ্ঞা অবহেলা করাটাই সহজ আর স্বাভাবিক ব্যাপার। আজ সেই অবজ্ঞা অবহেলাটাই ফিরে এসেছে বাবার উপরই—যার সূচনা করেছিল ওই সুবীরই।

আজ সুবীরও বোঝে সেটা। এই সংসারেই পাপপুণ্য সবকিছুরই দাম ষোল আনা মিটিয়ে দিতে হয়। তাই তার পাপের ফলই ভোগ করছে সে।

রঞ্জনাও দেখেছে বাবার অসহায় অবস্থা। সে যদি কিছু করতে পারতো খুশী হতো, কিন্তু সরকারী দেনা প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা—এত টাকা কোথায় পাবে সে।

ছোটকাকীমার শরীর ভালো নেই। রঞ্জনা সেদিন শোনে কাকীমা নার্সিংহোমে, ছুটে আসে রঞ্জনা। কাকীমা ভালোই আছে। সুন্দর একটি বোনও হয়েছে। রঞ্জনা এগিয়ে আসে।

উমা বলে—আয়।

রঞ্জনা শুধোয়—ভালো আছো তো কাকীমা?

—হ্যাঁরে।

রঞ্জনা দেখছে বোনটিকে। উমা শুধোয়—কদিন আসিসনি?

রঞ্জনা এবার বলে—বাড়িতে খুব অশান্তি চলেছে কাকীমা।

—কেন?

উমার প্রশ্নে এবার রঞ্জনা ছলছলে চোখে বলে বাবার বিপদের কথা। দাদাই এসবের মূলে আর তাকে মদত দিয়েছে মা।

ওরা বাবার বিপদে কিছুই করবে না। বাবারও শরীর ভেঙ্গে গেছে। অবশ্য বাবারও দোষ কাকীমা। বাবাই ওই সংসারে ওদের চোখের সামনে ঠাকুমা-কাকুর উপর যে অবজ্ঞা অবহেলা করেছিল তার ফলই পাচ্ছে। কষ্ট হয় কাকীমা।

হঠাৎ সামনে সমীরকে দেখে থামলো রঞ্জনা।

সমীর এসে পড়েছিল। সে রঞ্জনার মুখে তার বাবার সম্বন্ধে ওই কথাগুলো শুনেছে।

সমীরের মনে হয় সংসারটা যেন চাকার মতই গড়িয়ে চলে, থেমে থাকে না। এর একদিকে সুখ-প্রাচুর্য, অন্যদিকে দুঃখ, অভাব, শূন্যতা। কোনটাই স্থায়ী নয়।

তার ছোটদার জীবনে—আজ বড়দার জীবনেই সেটা দেখেছে, তারই প্রকাশ দেখেছে নিজের জীবনেও।

সমীরকে এবার যেতে হবে কেরালায়। অনেক কাজ বাকী। দাদার খবর শুনে বলে সমীর—কত টাকার নোটিশ এসেছে?

—পঁচিশ হাজার, বাবা বলছিল। পরশুই শেষ দিন।

সমীর বলে—তোর কাকীমা আজ বাড়ি ফিরছে। বাবাকে বলিস আমি কাল দেখা করবো।

সুবীর ভাবতে পারেনি যে সমীর আসবে তার কাছে।

সমীর এ বাড়িতে বেশ অনেকগুলো বছর পর এল। সিঁড়ির তলে এখন পাম্প বসানো। ওখানেই তাদের কেটেছে কতদিন। মায়ের কথা মনে পড়ে। চাট্টি মুড়ি চিবিয়ে মা আর সে ওখানে কাটিয়েছে কত নিদ্রাহীন রাত। মা ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাতো। ভাবতো কি করে এই ছেলেটাকে দুমুঠো অন্ন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে।

তাকে বাঁচাবার জন্যই মা এ সংসার ছেড়ে চলে গেছে।

রীনা একেবারে গদগদ। আপন করা সুরে বলে—ওমা! ঠাকুরপো। কি ভাগ্যি—এসো, এসো।

রঞ্জনাও বের হয়ে আসে। বলে—কাকু!

রীনা শুধোয় দরদভরা কণ্ঠে—উমা ভালো আছে তো? দীপু, নীপু? বাচ্চা মেয়েটাকে একদিন দেখতে যাবো।

সমীর বলে—এসো।

ওই বৌদির আন্তরিকতা—ওর কথাগুলো যে কত মেকি তা অনুভব করতে আজ কষ্ট হয় না সমীরের।

সমীর বুঝেছে ওরা প্রয়োজনে অনেক কিছুই করতে পারে।

রীনা বলে—তোমার দাদার শরীর ভালো নাই। উপরে নিয়ে যা রঞ্জু কাকুকে। আমি যাচ্ছি।

সুবীর দেখছে সমীরকে। ওই ভাইকে সে এতদিন আমলই দেয়নি। নিচে পড়ে থাকতো—খাটতো চাকরের মত। পেটভরে খেতেও দেয়নি, তবু কোনদিন কোন অনুযোগ করে নি। হাতও পাতে নি তার কাছে। সুবীর তাকে পথেই বের করে দিয়েছিল। আজ তার চরম বিপদের দিনে এসেছে ওই সমীরই।

সমীর বলে—দোকানের টাকাটা মিটিয়ে দিও। সমীরই খামটা এগিয়ে দেয়—পঁচিশ হাজার টাকা আছে।

রীনা এর মধ্যে একটা প্লেটে চারটে রাজভোগ, সন্দেশ, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল এনেছে।

যে একমুঠো আতপ চালের ভাত না দিয়ে তার মাকে চিরকালের জন্য তাড়িয়েছে তার হাতের ওই রাজভোগ দেখে সমীরের চোখের চাহনি কঠিন হয়ে ওঠে।

কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—ওসব থাক বৌদি। এক গ্লাশ এই ঠাণ্ডা নয়—কলসীর জলই দাও। ওসব ধাতে সইবে না।

রীনা জল আনে। বলে—একদিন যাবো ভাই। দেখছই তো দোকানের

আস্থা। প্রবীর দোকানে বসতে চায় না, ওকে যদি তোমার কারখানায় চাকরি দাও—

সুবীর বলে—দোকানেই বসতে হবে ওকে। কারখানায় চাকরি করতে গেলে খাটতে হবে, ওসব তো শেখাও নি। আজ সমীরকে দেখেছ না? জীবনে কিছুই দিইনি ওকে—দিয়েছি কষ্ট—অবহেলা। তবু ওইই আজ আমাকে বাঁচিয়েছে। তোমার ছেলে ওর নখের যুগ্যিও নয়—আমি অপাত্রেই সব অপব্যয় করেছি। তার চেয়ে সমীরকে পড়ালে হয়তো আজ আমিই বেশী সুখী হতাম।

সমীর দেখছে দাদাকে। আজ দাদার সারা মনে তীব্র অনুশোচনার দুঃসহ গ্লানি।

সুবীর বলে—আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতেই হবে সমীর। জীবনে তুই বড় হবি রে। তোর দয়ামায়া আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে। ওগুলো বিসর্জন দিয়ে তখন নিজের কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু নিজেকে নিয়েই সমাজে বাঁচা যায় না আজ বুঝেছি তোকে দেখে।

উমাকে সব কথাই বলে সমীর। উমা চুপ করে শোনে। ছোটদা-বড়দার বৌদিদের সকলের হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা জানে উমা। আজ তাদের কথা শুনেও বলে উমা—ঠিকই করেছো।

অবাক হয় সমীর। সে ভেবেছিল উমা হয়তো খুশী হবে না তার দাদাদের সাহায্য করার কাজে। কিন্তু উমার মন্তব্য শুনে বলে—কি বলছ উমা।

উমা বলে—ঠিকই বলছি। এটুকু না করলেই আমি অখুশী হতাম। অন্যায় করতে।

সমীর দেখছে উমাকে। বলে সমীর—তোমাকে বোধহয় এখনও চিনতে পারি নি উমা।

—কেন?

সমীর বলে—সত্যিই আমার মত হতভাগার জীবনে তুমি এসেছিলে তাই আজ জীবনে বাঁচার আলো দেখেছি।

উমা বলে—শুধু নিজেই নয়, সেই আলো দেখাবে আরও অনেককে। একা নয়—সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেবে অন্নমুষ্ঠি—দেখবে সে অন্নই যেন অমৃত বলে মনে হবে।

এতদিন পর সমীর উমাকে নিয়ে বের হয়েছে এবার কলকাতা ছেড়ে। উমা আজ খুশী। ন্যাপা এসেছে ওদের ট্রেনে তুলে দিতে।

মাদ্রাজ মেলের ফার্স্টক্লাশের ক্যুপে উমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুদিনের জন্য সংসার পেতেছে। দীপু-নীপুও খুশি। স্কুলের ছুটিতে তারা চলেছে দক্ষিণ ভারতে।

ট্রেন ছুটে চলেছে অজানা দেশের দিকে রাতের অন্ধকারে। ভোরবেলায় এসে পড়ে অন্য এক জগতে, পাহাড়—নীল জল—নারকেল গাছ, ওরা চিল্কা লেক ছাড়িয়ে চলেছে।

দিন ভোর চলেছে ট্রেন। পরদিন সকালে মাদ্রাজ, সেখান থেকে ট্রেন বদলে চলেছে ওরা কেরালার দিকে।

উমা দেখছে নতুন দেশকে। বালিয়াড়ি—নীলসমুদ্র—নারকেলবীথি, ধানক্ষেত, কলাগাছে ঘেরা গ্রাম যেন বাংলাদেশের মতই। শুধু লোকজনের পোশাক ভাষাটাই আলাদা।

বিশ্বাম্পা স্টেশনে ছিল। ওদের নামতে দেখে এগিয়ে আসে। উমাকে সে চেনে, উমাও চেনে তাকে। বিশ্বাম্পা বলে—নমস্কারম্ ভাবী।

উমাও নমস্কার করে। দীপু-নীপুও আংকেলকে পেয়ে খুশী।

—হাতি দেখাতে হবে। ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট। দীপু বলে।

হাসে বিশ্বাম্পা।

দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে। স্টেশনেই গাড়ি এনেছে বিশ্বাম্পা। উমা দেখে নতুন স্টেশন ওয়াগন—তাতে তাদের কোম্পানীর নাম লেখা।

স্টেশনেই বিশ্বাম্পা কিছু প্যাকেট লাঞ্চ, কলা আপেল লেবু কিনে নেয়। ছায়ানামা সুন্দর সাজানো স্টেশন—দূরে পাহাড় দেখা যায়। ওদিকে কয়েকটা দোকান পশার। ওরা বের হলো।

কিছুটা আসতেই লোকালয় পার হয়ে এবার শুরু হলো পাহাড় আর জঙ্গল। উপত্যকাগুলো সবুজ, পাহাড়ের গড়ানি জলে ধান হয় প্রচুর। মাঝে মাঝে ছোট বসতি, তাও জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়।

পথ চলেছে পাহাড়ে গা বেয়ে। দুদিকে ঘন অরণ্য। শাল সেগুন—নানা গাছ, বেতলতার ঘন বন। পাখিদের কলরব ওঠে—একদল হরিণ ছুটে গেল।

দীপু নীপু চীৎকার করে—হরিণ। কতো হরিণ।

উমা দেখছে ওই অরণ্য।

এবার দেখা যায় অরণ্যের গায়ে, কিছু অধিত্যকায় শুরু হয় রবার গাছ। সোজা কাণ্ডগুলো উঠে গেছে, তার মাঝ দিয়ে সুরকির মত লাল মোরামের পথ।

একটা বোর্ড দেখা যায় করুণাময়ী রাবার প্ল্যানটেশন। উমা চাইল। সমীর বলে—আমাদের রাবার বাগিচা। প্রায় দুহাজার একর জুড়ে এই বাগান।

বেশ কিছুটা এসে একটা টিলার উপর রাস্তাটা উঠেছে। দু'একটা ময়ূরও দেখা যায়।

ওরা বেপরোয়া হয়ে হাঁটছে। সামনেই সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। কাঠের বাংলো—জানলাগুলো কাঠের, সামনে সাজানো বাগান।

গাড়িটা এসে থামলো। ওরা নেমেছে। দেখছে উমা, জায়গাটা সুন্দর। পিছনে একটা পাহাড়ি ঝোরা কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। কাঠের মজবুত

ব্রিজ। ওদিকে কারখানার শেড, আরও কিছু ঘর। কর্মচারীদের কোয়ার্টারও রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। ছবির মত সাজানো। চারিদিকে চোখ জুড়োনো সবুজ।

বাংলোর বাগানে কলাগাছ, আম, কাঁঠাল মায় কমলালেবুর গাছও রয়েছে। কমলালেবুর সিজন শুরু হচ্ছে—সবুজ ফলগুলোয় হলুদ আভা আসছে।

দীপু নীপুও খুব খুশি। ছোট্ট নীপা মায়ের কোলে, সেও চোখ মেলে যেন নতুন এক জগৎকে দেখছে।

কাজের লোক মায় রান্নার লোকও রেখেছে বিশ্বাম্পা। উমা বাংলোয় গিয়ে দেখে কোন আয়োজনের ত্রুটি নাই।

ওদিকে দীপু-নীপুর আলাদা একটা ঘর—এদিকে তাদের বেডরুম, আসবাবপত্র সবই নতুন। মাঝে একটা হল ঘর। ওদিকে ড্রইংরুম ছাড়াও পুবদিকে বসার সুন্দর জায়গা।

উমা বলে—এতসব কখন করলে।

সমীর বলে—হয়ে গেল। রবার বাগিচাটার ওদিকেই ফ্যাক্টরী। পরে নিয়ে যাবো।

উমা স্নান করে ছেলেদের, মেয়েকেও স্নান করিয়ে খাইয়ে দেয়। নিজেরা খেয়েদেয়ে বলে—একটু রেস্ট নাও। ট্রেনে যা ধকল গেছে। তারপর তোমার কাজ শুরু করবে।

সমীরও একটু বিশ্রাম নিতে চায়। তাই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

উমা যেন স্বপ্ন দেখছে। কলকাতার জীবনের সঙ্গে এখানের জীবনযাত্রার কোন মিলই নাই।

সমীরের সেই চরম দুঃখকষ্টের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে উমার। অভাব-অনটন উপবাসকে সহ্য করে ও জীবন শুরু করে, পোস্তায় দুটাকা রোজের আলু-রাঙানো মজুর, লোকের গাড়ি ধুয়েছে টাকার জন্য। মাকে হারিয়েছে—তবু চেষ্টা করেছে ব্যবসা করার।

ঠকেছে বার বার, তবু থামেনি। আজ সে এই অবস্থায় এসেও বদলায় নি। একা নিজের কথাই ভাবেনি। আজ সকলের অন্নমুষ্টি ভাগ করে নিয়েছে।

তাড়াতাড়ি বৈকাল নামে এখানে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য চলে গেলেই আলো ম্লান হতে থাকে। সারা বাগান যেন মনে হয় পটে আঁকা ছবি।

সমীর এখন এখানে দুজন স্পেশালিস্ট রেখে রবার তৈরী করাচ্ছে। বাগানের রবারের সঙ্গে তার তৈরী রবার মাপমত মিশিয়ে এখন তার রবারের মান উন্নত করেছে। আর ক্রমশঃ দেশের বড় বড় রাবার ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী, মায় টায়ার কোম্পানীগুলো তার মাল ভালো দামে নিচ্ছে। ফলে সমীরের কারখানার নামও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

কদিন কোনদিকে কেটে যায় বুঝতে পারে না উমা। ছেলেরাও এক নতুন জগতে এসে যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সমীরের মুক্তি নাই। সে ব্যস্ত তার কাজ, প্রোডাকশন নিয়ে।

এবার কলকাতার কারখানাতেও নিজেরা টায়ার টিউব তৈরী করতে শুরু করেছে। আর তার বাজার ধরবার জন্য সমীর নিজেই বের হয় দিল্লী—বোম্বাই—মাদ্রাজে। ভারতের বিভিন্ন শহরেও তার এজেণ্ট রেখেছে।

সমীরের লক্ষ্য বাইরের বাজার। দেশের মধ্যেই নয় সে বিদেশের বাজারে তার পণ্য ছড়াতে চায়। সেও কঠিন প্রতিযোগিতাতেই নামতে চায়। তাই ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিচ্ছে আরও।

কাগজেও তার নতুন ফ্যাক্টরীর কথা লিখেছে। তার তৈরী টায়ার টিউব নাকি আন্তর্জাতিক মানেই তৈরী।

সমীর দিল্লীতে এসেছে—বিদেশের বাজারে মাল পাঠাবার ছাড়পত্র তার দরকার।

দিল্লী বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে সব কিছু করাতে গেলে একটা বিশেষ পথে যেতে হবে। বড় হোটেলে পার্টি দিতে হবে, নেতা-মাতব্বরদের নজরে আসতে হবে, তাদের আমচা চামচাকেও খুশী করতে হবে।

সমীর নিজে কাজ বোঝে, সামান্য অবস্থা থেকে কঠিন পরিশ্রম করে আজ নিজের চেষ্টাতে এই কারখানা, ব্যবসাপত্র গড়েছে।

কিন্তু অন্ধকারের পথগুলো চেনে না। দিল্লীতেই হঠাৎ সেদিন গান্ধী-ঘাটে এসেছে। জায়গাটা বেশ শান্ত, শহরের কোলাহল নেই। সবুজ গাছ-গাছালি ঘেরা পরিবেশ। হঠাৎ এখানে কাকে দেখে দাঁড়াল সমীর।

হঠাৎ মনে পড়ে হারানো অতীতের কথা। সেদিন তাকে নিষ্ঠুরভাবে অপমানিতই হতে হয়েছিল। তবু সেই বীণাকে আজও ভোলেনি সে।

এত কাজের মাঝেও জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে। উমা তার জীবনে এনেছে পূর্ণতার স্পর্শ। তার সংসারে আজ শান্তি এসেছে।

একাই নয় সকলকে নিয়েই সমীর আজ বাঁচতে চায়।

রঞ্জনা আজ তার অফিসে ভালো কাজ করছে। কারখানাকে নতুন করে গড়েছে। বড়দা আজ মেয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত।

মেজদাও সেরে উঠেছে সমীরের চেষ্টাতেই। আজ সমীর সকলের কাছেই অতি প্রয়োজনীয় জন। কিন্তু তবু সে কোথায় নিঃসঙ্গ।

জীবনের লড়াই, সে লড়েই চলেছে একাকী এক নিঃসঙ্গ সৈনিকের মতই।

বীণাও চিনেছে সমীরকে। অবশ্য এখন সমীরের চেহারায় এসেছে ব্যক্তিত্ব, চোখে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা। বীণা বলে—তুমি! এখন তো কাগজে দেখি তোমার নাম। রবার শিল্পে কি সব বিরাট কাজ করছো।

পরিচয় করিয়ে দেয় তার স্বামীর সঙ্গে—আমার স্বামী, স্বরূপ ঘোষ। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে এখন এখানেই রয়েছে।

সমীর নমস্কার করে।

স্বরূপবাবু বলে—আপনার নাম অনেক শুনেছি। রবার ইনডাস্ট্রিতে তো অনেক কিছুই করেছেন।

সমীর বলে—চেষ্টা করছি মাত্র। তবে দেশের নয় বিদেশের বাজারেও আমাদের মাল ছাড়তে চাই। আমরাও তাদের চেয়ে কম কিছু নই, সুযোগ পেলে বাইরের বাজারেও আমরা নাম করতে পারি।

বীণা বলে—ব্যবসার কথা বাড়িতে হবে। চলো। এখন বলো কেমন আছো? দিদির চিঠি পাই না, তবে রঞ্জনা লেখে, সে তো তোমার ওখানে রিসার্চ করছে।

সমীর বলে—সবাই মিলে কিছু করার চেষ্টা করছি।

বীণা বলে ওর স্বামীকে—জানো, এই মানুষটিকে আমি চিনি, একে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে। আজ সেই লড়াই-এর পথে এইখানে এসেছে।

স্বরূপবাবু বলে—আমি আপনার সব খবরই জানি সমীরবাবু। চলুন, বাড়িতে কথা হবে।

ভালোবাসার একটা ক্ষীণ রেশ মনে থেকে যায় চিরকালই। মানুষ সবকিছু পেলেও জীবনের প্রথম প্রেমের স্পর্শকে ভোলে না।

তাই বীণাও যেন আজ সমীরকে চায় আরও বড় দেখতে। ওই মানুষটিকে সে শ্রদ্ধা করে।

স্বরূপবাবুরা ওদের চিত্তরঞ্জন পার্কের সাজানো ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে সমীরকে। স্বরূপবাবু সেক্রেটারিয়েটে বেশ ভালো পোস্টেই আছেন। তার যোগাযোগও বেশ ভালো।

স্বরপবাবু বলেন—কাল অফিসে আসুন। এক্সপোর্ট বিভাগের সেক্রেটারী আমার বন্ধু। তিনি নিশ্চয়ই কিছু করবেন।

কাজটা এত সহজে হয়ে যাবে তা ভাবেনি সমীর। তার মালের রিপোর্ট-মান—সবকিছুর কাগজপত্র তার সঙ্গেই ছিল। সমীর সেই সেক্রেটারীর সাহায্যে বেশ কয়েকটা বাইরের দেশে মাল পাঠাবার পারমিটও পায়।

সমীর আজ নতুন উদ্যমে ফিরে আসে কলকাতায়। বাইরের যা অর্ডার পেয়েছে তা কম নয়। দিনরাত দুটো কারখানায় কাজ চলছে।

সমীরের সময় নেই। কয়েকদিন কলকাতায়—আবার প্লেনে দৌড়চ্ছে কাজকোডে।

উমা বলে—তোমার ছুটি কোনদিন মিলবে না?

হাসে সমীর। বলে—দশ বছর বয়স থেকেই লড়াই শুরু করেছি। জানিনা এ লড়াই কবে থামবে উমা।

—সংসারে কত লাগে যে লড়বে দিনরাত?

বলে সমীর—জীবনে দুঃখকষ্টকেই বড় করে দেখেছি উমা। কষ্টকে

ভয় করি না। লোকের—তোমাদের কোন কষ্ট হোক সেটা চাই না—তাই থামলে চলবে না।

তার ব্যবসায় কারখানায় আজ হাজার কয়েক লোকের অন্ন জোটে—সেটাকে তাই চালু রাখতেই হবে।

বিদেশে এবার মাল যাচ্ছে তার। সুনামও হয়েছে সমীরের কোম্পানীর।

সিঁড়িতলে গরমে দুজনে কষ্ট পেত। মা আর সে। আজ একজন চলে গেছে, কে জানে সে ফিরে এসেছে কিনা। সমীর ওই মেয়েকে দেখে একান্তে। সেই মুখ, চোখ, সেই হাসি।

সমীর যেন কাজে আরও ভরসা পায়। লড়তে সাহস পায়।

নতুন বাড়ি করেছে। আজ গৃহপ্রবেশ। দাদা বৌদিরাও এসেছে। সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি করেছে।

আজ মায়ের কথা মনে পড়ে সমীরের। মা এসব দেখে যায় নি। রীনা-মায়াও এসেছে। এসেছে সুবীর-অধীরও।

তারাও খুশী। দেখছে সমীর আজ নিজের ভাগ্যকে গড়েছে।

এসেছে ন্যাপা। সমীরের সেই বাল্যবন্ধু।

ন্যাপা বলে— কামাল করলে গুরু। ঝুপড়ি থেকে বাংলোতে।

এমনি দিনে খবর আসে বিদেশে রবারের এক্সপোর্ট—আর এখানে রবারের সম্ভাবনা এসব খতিয়ে দেখতে সরকার বিদেশে একটা টিম পাঠাচ্ছেন, তাতে সমীরকেও যেতে হবে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিই পেয়েছে আজ সমীর। সেই পথ থেকে উঠে আসা মানুষটা আজ এই সম্মান স্বীকৃতি পেতে চলেছে।

ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে।

সমীর হাতে কলমে কাজ করেছে। অভাবের জন্যই ভালো মাল কেনার সামর্থ্য তার ছিল না। বাতিল স্ক্রাপ থেকে সে নিজে চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার সঙ্গে পরিমাণ মত ভালো মানের রবারের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে এখন সেরা মাল তৈরী করার নিজস্ব কৌশল উদ্ভাবন করে অনেক কম দামে ভারতের সেই সব জিনিস আন্তর্জাতিক বাজারে যোগান দিয়ে সাড়া এনেছে।

বড় বড় বিদেশী কোম্পানীরাও তার এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। তাই সমীরের কোম্পানীর সঙ্গে তাদের দেশে যৌথভাবে এই ধরনের রবার কারখানা করতে চায়। দেশের সব সংবাদপত্রে এই খবর বের হবার পর সমীরের কাজও বেড়ে যায়। বিদেশে মাল যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে তার প্রতিষ্ঠান।

এবার সেই পথের ছেলেটা চলেছে বিদেশ জয় করতে।

সমীরের এই জয়ে আজ উমাও আনন্দিত। সমীরকে বেশ কিছুদিন বিদেশে থাকতে হবে, সম্ভব হলে সেখানে কারখানা তৈরী করার কাজেও হাত

দেবে। এদেশেই নয় বিদেশেও করুণাময়ী রবার ওয়ার্কস তার সেই হতদরিদ্র মা যে ছেলেব মুখে দুমুঠো অন্ন যোগাবার জন্যে নিজেই বাঁচার দাবী ত্যাগ করে হারিয়ে গেছল সেই মায়ের নামও জানবে অনেকে।

এখানের কারখানার কাজ রামানুজম আর কেরালায় বিশ্বাপ্পার হাতে তুলে দিয়ে, উমা রঞ্জনাদের সব কাজ বুঝিয়ে এবার তার যাত্রা শুরু হবে দেশ থেকে দেশান্তরে।

উমার চোখে জল।

সমীর বলে—একি!

উমা বলে—আজ আমার আশা স্বপ্ন সফল হয়েছে। জানতাম তোমাকে কেউ থামাতে পারবে না।

সমীর বলে—মাও বলতো জীবনের লড়াইয়ে থামবি না খোকা—থামা মানেই মৃত্যু, ফুরিয়ে যাওয়া। তাই এই সংগ্রাম আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে উমা। তার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

চাইল উমা—ওসব কথা কেন বলছ?

সমীর বলে—যেদিন আমার কিছুই ছিল না। পথে পথে ফেরিওয়ালার মত ঘুরেছি, সেদিন তুমিই এসেছিলে আমার জীবনে, তোমার অনুপ্রেরণাই আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল, আজ সংসারে এসে তুমি নিজে কষ্ট করে সংসারের সব দায় মাথায় তুলে নিয়েছো। আমাকে এর মধ্যে জড়াও নি, নিজের কাজেব জগতেই এগিয়ে দিয়েছ। আমার এই কৃতিত্বে তোমার দানই বেশী—

উমা বলে—এ তো স্ত্রীর কাজ।

ছোট্ট মেয়ে দীপা এগিয়ে আসে। ডাগর দুচোখে তার মিষ্টি চাহনি। সমীরের মনে হয় এ যেন মায়ের চাহনিই, সেই মমতা নিয়েই ওরা ফিরে ফিরে আসে মানুষের শূন্য রিক্ত নিঃস্ব জীবনে। সংসারের সব যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দেয়।

জীবন এমনি দুঃখে সুখে বর্ণময়, বৈচিত্র্যময়। মানুষ তাই বাঁচার জন্য লড়াই করে, জীবনকে ভালোবাসে, অপরকে ভালোবাসতে পারে।

রাত্রির ফ্লাইট।

বিরাট সম্বর্ধনা সভা থেকে ফিরেছে সমীর। কলকাতার শিক্ষিত উচ্চ-কোটির সমাজ, সংবাদপত্র আজ পথ থেকে উঠে আসা একটি মানুষের কৃতিত্বে গৌরব বোধ করে।

এয়ারপোর্টে এসেছে সমীর।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ব্যস্ততা নেমেছে। উমা-দীপু-নীপু-উমার ছোট মেয়েও এসেছে। এসেছে কারখানার কর্মীরা, বড়দা, মেজদা—রঞ্জনা আরও অনেকে। ন্যাপাও এসেছে।

ন্যাপা বলে—গুরু, তাহলে বড়বাজারের আলুপোস্তায় আলু রং করা সার্থক হয়েছিল বলো, এখন হোমরাচোমরা হয়ে বিলেত যাচ্ছো, সেখানেও কারখানা খুলবে।

হাসে সমীর! বলে—সেদিনগুলোকে—সেদিনের খিদের জ্বালাকে ভুলিনি রে। তোকেও ভোলা যাবে না কোনদিন। ওরা রইল, দেখিস ন্যাপা।

সিকিউরিটি চেকের জন্য মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে। সমীর ভিতরে চলে যাবার আগে ছেলেমেয়েকে আদর করে চলে যায়।

রাতের গভীরে বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন প্লেনটা আকাশে চলেছে। তারাগুলো দেখা যায়—মাটির সন্ধান নেই। মাটি ছেড়ে দূর আকাশে উড়ে চলেছে প্লেনটা, অজানা জগতে পাড়ি দিচ্ছে—সমীরও মাটির কাছাকাছি থেকে এখন বহু উপরে উঠেছে।

তারাগুলো ঝিকঝিক করে—তার মাঝে যেন তার হারানো মায়ের চাহনিই মিশে আছে। ওই অজানা পথে আজ এগিয়ে চলেছে জীবনযুদ্ধের এক নিঃসঙ্গ সৈনিক।